১

বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)

মুহাম্মদ নুরল ইসলাম

বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)

প্রথম খণ্ড

[সমাজ বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান]

মুহাম্মদ নুরল ইসলাম, বি. এস-সি, বি. সি. এস,
(Engg-Telecom), এ. বি. কে. (টোকিও), ও. টি. এস. (জাপান)
প্রেসিডেন্ট পুরস্কারপ্রাপ্ত, বিজ্ঞান না কোরআন, পৃথিবী নয় সূর্য
ঘোরে, বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ সিরিজ (১ম-৪র্থ খণ্ড),
জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ), রহস্যে ভরা বিছমিল্লাহ,
মানবজাতির মুক্তির পথ, সর্ব ধর্মে বেহেশত
দোজখ' ঝংকার, পরী কথা বলে, জাপানে যা
দেখলাম প্রভৃতি আলোড়নকারী
গ্রন্থ প্রণেতা।

মম প্রকাশ

প্রথম মম প্রকাশ সংস্করণ ঃ জুন ২০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ মে ২০০৩
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ মার্চ ২০০৯

প্রচ্ছদ ঃ রফিক উল্যাহ

মম প্রকাশ ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে এ. জেড. এম. তৌহিদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সালমানী মুদ্রণ, নয়াবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। অক্ষরবিন্যাস জীবন কম্পিউটার, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ১৪০ টাকা

ISBN : 984-8418-42-3

www.pathagar.com

প্রার্থনা

হে আল্লাহ্ ! যে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমার এ মহাসৃষ্টির উদ্ভব, সেই পবিত্র সৃষ্টির নামেই দু এক কলম লিখতে বসলাম। জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক যাঁর ধ্যানে মত্ত, ওলি-গাউস, কুতুব-ফকির যাঁর নামে পাগল, জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, জ্বীন-এন্‌সান যাঁর বানীতে মুগ্ধ, আকাশ-বাতাস, চাঁদ-সুরজ যাঁর সেবায় ধন্য, সেই মহাবিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারা এবং তাঁর সর্বজনস্বীকৃত ফলাফল লিখবার সামান্য একটু ক্ষমতা আমার কলমে দিও। আমার ধ্যান, আমার জ্ঞান, আমার বিদ্যা, আমার বুদ্ধি এ একটিমাত্র কাজেই নিয়োজিত করবার শক্তি দিও। ভুল করে ডুবতে গেলে হাত ধরে তুলে দিও, পথ থেকে সরে গেলে আলোর পথ দেখিয়ে দিও।

হে রহমানুর রহিম ! মানুষ হিসাবে জন্ম দিয়েছ, মানুষ হিসাবে মরতে দিও, মানুষ হিসাবে তোমার প্রিয় রসুল হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে চিনতে দিও। আমিন।

নুরল ইসলাম (লেখক)

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

* রহস্যে ভরা বিছমিল্লাহ্
* সর্ব ধর্মে বেহেশ্ত দোজখ
* পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে
* মানবজাতির মুক্তির পথ
* বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) ১ম খণ্ড
* বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) ২য় খণ্ড
* বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) ৩য় খণ্ড
* বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) ৪র্থ খণ্ড
* জগৎগুরু মুহাম্মদ (দঃ)
* বিজ্ঞান না কোরআন

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূচনা	৯
আল্লাহই বৈজ্ঞানিক নবীবর	১৩
তওরাত ও ইঞ্জিল-এর সাক্ষ্য	১৫
এলো মরুর পাখি	১৬
সমাজবিজ্ঞান	১৭
আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ	১৮
অহঙ্কার	১৯
অত্যাচার	২০
লোভ-লালসা	২৩
নারীর লোভ	২৪
ধনের লোভ	২৮
ধনের উপকারিতা	৩০
জ্ঞানের লোভ	৩৩
চরিত্র	৩৮
প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা	৪০
আত্মবিশ্বাস	৪০
নিন্দা-হিংসা-বিদ্বেষ	৪২
অপরের দোষ খোঁজা	৪৫
ঐশ্বরিক প্রেম	৪৫
কর্তব্য	৪৭
শ্রম	৪৯
সত্যবাদিতা	৫৪
সহিষ্ণুতা	৫৬
আত্মনির্ভরতা	৫৮
নীরবতা	৬০
দানশীলতা	৬৩
বিনয়	৬৬
লজ্জা	৬৮
দুর্নীতি ও অনাচার	৭০
সুদ প্রথা	৭১
ক্রীতদাস প্রথা	৭২
ব্যভিচার	৭৪
নারী নির্যাতন	৭৭
চুরি ও অবৈধ রক্তপাত	৭৯
শরীরবিজ্ঞান	৮২
দেহ	৮২
মস্তিষ্ক	৮৪
মন	৮৬
আত্মা	৮৯
নামাজ	৯৬
ওজু	৯৯
নামাজের প্রয়োজনীয়তা	১০৭
রোজা	১০৮
খাদ্য ও পানীয়	১১২
পানীয়	১২৪
পোশাক-পরিচ্ছদ	১২৯
বিশ্রাম	১৩৮
রোগ ও তার প্রতিকার	১৪১
প্রতিকার	১৪৪
ঐশীশক্তি	১৫০
উপহার বাণী	১৫৬

www.pathagar.com

সালাম জানাই

প্রিয় রসুল (দঃ) ! তোমার গুণাগুণ লেখবার জ্ঞান এবং ভাষা আমার নেই। তোমাকে চিনবার এবং জানবার অন্তঃকরণ আমার নেই। তোমাকে বুঝবার এবং বিকশিত করবার শক্তি আমার নেই। তাই লিখতে গিয়ে ভুল করব, চিনতে গিয়ে দৃষ্টি হারাব, জানতে গিয়ে পিছপা হবো, এ কথা সত্য, তবু লিখতে কলম ধরলাম। আমার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করো এবং অন্তর নিংড়ানো ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সালাম নিও।

–লেখক

www.pathagar.com

"আমরা আল্লাহ্‌রই বর্ণে রঞ্জিত। আল্লাহ্‌
অপেক্ষা কে অধিক রঞ্জনকারী?"

[কোরআন–২ ঃ ১৩৮]

"এবং আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয়
অনুগ্রহে বিশেষত্ব প্রদান করেন ; এবং
আল্লাহ্‌ মহাকল্যাণের অধিকারী।"

[আল কোরআন–২ ঃ ১০৫]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচনা

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর জীবন চরিত্র নিয়ে যুগে যুগেই আলোচনা করেছেন অনেক কবি, লেখক ও সাহিত্যিক। কেউ তাঁর চরিত্রের উপর, কেউ সামাজিক ব্যবস্থার উপর, কেউ আধ্যাত্মিক শক্তির উপর আর কেউ বা অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষ হিসাবে মুহাম্মদ, ধর্মপ্রচারক মুহাম্মদ, রাজনীতিক মুহাম্মদ, সমাজ সংস্কারক মুহাম্মদ, মিষ্টভাষী মুহাম্মদ, বিচারক মুহাম্মদ, শান্তির বাহক মুহাম্মদ, আল্লাহর দোস্ত মুহাম্মদ প্রভৃতি গুণাবলীর উপর অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আলোচনা করেছেন। এসব অসাধারণ গুণাবলীর মাধ্যমে যদিও বিভিন্ন মনীষীরা বিভিন্ন যুগে আলোচনা করেছেন তবুও একথা বলতে হয় যে তাঁর জীবনের কিছুই বলা হয় নি। এ ত্রুটি কোন মনীষীর নয়, কোন পণ্ডিতের নয়, কোন লেখকেরই নয়। কেননা মহাসাগরের অভ্যন্তর ভাগ হ'তে যদি সামান্য কয়েক বিন্দু জল নিয়ে মহাসাগরের স্বরূপ নির্ধারণ করবার প্রচেষ্টা করা যায় তাহলে যেমন মহাসাগরের গুণাগুণের কিছুই বর্ণনা করা হয় না। তদ্রূপ এ মহামানব হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবন চরিত্রের উপর যদি বিশ্বের পণ্ডিতবর্গ একত্রিত হয়েও আলোচনায় রত হন তবুও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ করতে পারবেন না। তাঁর জীবনের উপর আলোচনার বিষয়বস্তু অনেক রয়েছে এবং থাকবেও। বেশ কিছুদিন থেকে আমার মনে একটা কথাই বারবার দোলা দিচ্ছিল যে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ আলোচনা করছেন না। অবশ্য এ অংশটা আলোচনা করার জন্য দরকার ধৈর্য, চিন্তাশক্তি ও অসাধারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। যদিও এরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি অনেক আছেন তবু তাঁরা এ বিষয়ে কিছু লিখছেন না বলেই আমি নিতান্ত মূর্খ হয়েও আজ এ বিষয়টার উপর দু-একটা কথা লিখতে বসলাম। বিষয়টা অত্যন্ত জটিল কেননা আমি লিখতে চাই, **"বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)"** অর্থাৎ এ কথাই বিশ্বাসীকে জানাতে চাই যে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বিভিন্ন উপযুক্ত গুণেই শুধু বিভূষিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বড় বৈজ্ঞানিক। যাঁর বৈজ্ঞানিক সূত্র যুগ যুগের বৈজ্ঞানিকদের বিশ্লেষণের বস্তু।

যে সব বৈজ্ঞানিক সূত্রে আজ জগৎ উদ্ভাসিত সে সব সূত্র তাঁর চিন্তাশক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল। অনেকেই আমার এ কথাকে অস্বীকার করতে পারেন, তাই আমি চেষ্টা করব তাঁর মহাসূত্রগুলি একটি একটি করে তুলে ধরতে ও দেখাতে যে তাঁর সূত্রকে অবলম্বন করেই জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, দার্শনিকগণ রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন ও মহা কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন।

সাধারণ জ্ঞানের ঊর্ধ্বে যে জ্ঞান তাকেই বিজ্ঞান বলা হয়। অবশ্য প্রকৃত অর্থে একথা বললেই ভাল হয় যে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যকে নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করে মানব সম্মুখে প্রকাশ করার অপরিসীম কৌশল ও জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা হয়। যে মানবকে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তাঁর ভিতর যে বিজ্ঞানের জ্ঞান ছিল না এ কথা বললে শুধু ভুলই হবে না–বিশেষ অন্যায়ও করা হবে। কেননা তিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করতেই বলেছেন–

"আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে একঘণ্টা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা সত্তর বৎসরের এবাদতের সমান।"[১]

"উত্তম কল্পনা উত্তম এবাদতের অন্তর্ভুক্ত।"[২]

---

১. ২ ও ৪. মুহাম্মদ আজাহারউদ্দিন এম. এ. কর্তৃক হাদিসের আলো।

www.pathagar.com

"তোমরা বিজ্ঞান শিক্ষা কর। যার কাছে পাও যেখান থেকেই পাও সেখান থেকেই সংগ্রহ কর। এতে তোমাদের কোন দোষ নেই।"[৩] তাঁর এ বাণী প্রমাণ করে যে তিনি গভীরভাবে আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতি দেখতেন ও পর্যালোচনা করে মানুষকে বোঝাতেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অত্যন্ত বেশি। এ দুশ্রেণীর মানুষকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন, নিম্নোক্ত বাণী এ কথা প্রমাণ করে।

"শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ব্যতীত কেহই আমার আপন নয়।"[৪]

নিজের পরিবারের কোন শিক্ষক বা নিজের পরিবারের কোন শিক্ষর্থীকে উদ্দেশ্য করে নিশ্চয়ই তিনি এ কথা বলেন নি। সমগ্র জগতের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীকেই আপন বলে বুকে স্থান দিয়েছেন। তিনি জানতেন যে জ্ঞানের চর্চা না করলে জ্ঞানী হওয়া যায় না, জ্ঞানী না হলে বিজ্ঞানী হওয়া যায় না, আর বিজ্ঞানী না হলে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যকে উদ্ঘাটন করা যায় না। তাই জ্ঞান আহরণের জন্য পশ্চিমের আরব থেকে পূর্বের সুদূর চীন দেশে যেতেও নির্দেশ দিয়েছেন। চীন দেশে যাবার নির্দেশ এ কথাই প্রমাণ করে যে, সে দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাই কেবল তিমিরাচ্ছন্ন আরববাসীর মুক্তির পথ। নইলে শুধু আরবী শিক্ষাকেই যদি কেবলমাত্র শিক্ষা বলে তিনি মনে করতেন তা হলে আরবের পণ্ডিতদের কাছেই হাতেখড়ি নিতে উপদেশ দিতেন। চীনাদের শিল্প নিপুণতা, চীনাদের বৈজ্ঞানিক কৌশল, চীনের দর্শনতত্ত্ব সে যুগে ছিল খ্যাতনামা। তাই চীন দেশীয় বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতবর্গের কাছে শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করতেও উপদেশ দিয়েছেন। এ উপদেশ তাঁর বিদ্যোৎসাহিতা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, তিনি নিজে চীন দেশে গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন নি। এমনকি ঘরে বসেও কোন শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভ করেন নি। তথাপি কেন আমি তাঁকে বৈজ্ঞানিক বলে আখ্যায়িত করতে চাই। কোন তর্কশাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে আমি একথা বলতে যাচ্ছি না যে ঘরে বসে বিদ্যাশিক্ষা না করেও, স্কুল, কলেজ ও ইউনিভারসিটির ডিগ্রি না নিয়েও সামরিক বিভাগের কোন নির্দেশনামা পালন না করেও যদি তাঁকে মহাজ্ঞানী, দার্শনিক, যোদ্ধা উপধি দেওয়া চলে তবে চীন দেশ থেকে বিদ্যাশিক্ষা না করলেই বা তাঁকে বিজ্ঞানী বলা হবে না কেন? তর্কশাস্ত্র ছাড়াই আমি প্রত্যক্ষ প্রমানে দেখাব যে তিনি হলেন সর্বযুগের একজন অমর বৈজ্ঞানিক। সমাজ বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, আকাশ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক।

একজন 'উম্মি' মানুষ, তাঁর মাথায় কিভাবে এমন চিন্তাশক্তি আসল, কে জোটাল সেটা একবার দেখে নিয়ে আমরা তাঁর মহাসূত্রগুলি আলোচনা করব।

বিশাল মরুর বুকে এক নিতান্ত দরিদ্র পরিবারেই তাঁর জীবন হলো শুরু। হালিমার পবিত্র দুধ পানে তিনি হলেন মানুষ। মাথার উপর উন্মুক্ত নীল আকাশ, লক্ষ তারকার ঝলমল, চন্দ্র সূর্যের আবর্তন, দিবারাত্রির পরিবর্তন, মরুর শুষ্ক বালি, পর্বতের গাম্ভীর্য আর পদতলের বিস্তীর্ণ প্রান্তর তাঁকে করে তুললো ভাবুক, এনে দিল তাঁর মাথায় চিন্তাশক্তি। তাঁর খেয়াল হলো এ সৃষ্টি অহেতুক নয়। এ সৃষ্টি অবাস্তব নয়। এ সৃষ্টি খেয়ালী নয়। এ সৃষ্টির যেমন আছে উদ্দেশ্য তেমনি আছে রহস্য। এর উদ্দেশ্য এবং রহস্য তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। কে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে এ মহাসৃষ্টিতে হাত দিয়েছেন? কার ইঙ্গিতে হয়েছে এ মহাসৃষ্টির উদ্ভব? কার বৈজ্ঞানিক সূত্রের উপর নির্ভর করে এ মহাবিশ্ব আজীবন কাল থেকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম বলে চলে আসছে? এ তত্ত্ব তাঁকে জানতেই হবে। জ্ঞানের পরিসীমা যেখানে

---

৩. আল-হাদিস সংগৃহীত 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী'—ফরিদ ওয়াজেদী আফিন্দি।

www.pathagar.com

স্তব্ধ হয়ে যায় সেখান থেকেই সূত্রপাত হয় তাঁর এ অভিযান। এ অভিযানের ছিল না কোন বিরাম, কোন বিশ্রাম। পুরানো সাধনা ও পুরানো চিন্তাধারায় টানলেন যবনিকা। নতুন ধ্যানে, নতুন জ্ঞানে, নতুন চিন্তায় ও নতুন সাধনায় মন হলো তাঁর ভরপুর। চিন্তা তাঁর আবিষ্কারে, সন্ধান তাঁর রহস্য উদ্ঘাটনে, মনোযোগ তাঁর কর্মে, আর নিয়োজিত হলেন সমাজ গঠনে। এমন কঁচি শিশুর মাথায় এমনি ধরণের চিন্তা কেউ কি কোনদিন দেখেছে? কেউ কি শুনেছে যে একজন মেষপালক রাখাল বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির উপর আধিপত্য বিস্তার করবে? কে অলক্ষ্যে থেকে তাঁর মাথায় এ চিন্তাশক্তি দিল? কে পিছন থেকে হাত ধরে তাঁকে রহস্য উদ্ঘাটনের পথ দেখাল? কে তাঁকে এমন গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে নেবার সাহস জোটাল আমাদের একবার ভেবে দেখা দরকার।

মহাবৈজ্ঞানিক হয়ে বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে দরকার– শক্তি, সাহস, বল, ভরসা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধি, চিন্তাধারা, ধৈর্য ও বিশ্বাস। এ সব গুণের অধিকারী করে দিতেই বোধহয় হয়েছিল রাখাল জীবনেই তাঁর বক্ষঃচ্ছেদ। কলুষ কালিমা, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, মোহ, রাগ, অভিমান হয়েছিল তাঁর শরীর থেকে অপসারণ। ইতিহাস এবং আল্লাহর কোরআন এর সাক্ষ্য বহন করে–

"আমি কি তোমার বক্ষ উন্মোচন করি নাই? আমি তোমা হইতে তোমার সেই ভার অপসারণ করিয়াছি যাহা তোমার পৃষ্ঠকে অবনমিত করিতেছিল এবং আমি তোমার জন্য আলোক মহিমান্বিত করিয়াছি।"[১]

উপর্যুক্ত মহাবাণী রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বৈজ্ঞানিক জীবনের পরিচয় বহন করে। এখান থেকে বোঝা যায় যে তাঁর বুকে এমন অদৃশ্য ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয় যার ফলে তাঁর অন্তর হয়েছিল জ্ঞানের আলোকে বিকশিত। ভয়, ভীতি, সঙ্কোচ, অস্থিরতা, কৃপণতা ও অজ্ঞানতা হয়েছিল দূরীভূত। আর চিন্তাধারা হয়েছিল ব্যাপক, সীমাহীন ও অসাধারণ। উপরে বর্ণিত কোরআনের শেষোক্ত বাণী তা প্রমাণ করে। এছাড়া রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেও বলেছেন–

"আল্লাহতায়ালা আমার অন্তরে তাঁর অনুগ্রহের জ্যোতিঃ নিক্ষেপ করিলেন। আমি স্বীয় অন্তরে উহার অনুপম স্নিগ্ধতা অনুভব করিলাম এবং নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান ও তত্ত্ব অবগত হইলাম।"[২]

অন্যত্র বলেছেন–

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রত্যেক বিষয় আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইল এবং আমি উহার সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলাম।"[৩]

"সমস্ত বিশ্বজগৎকে আমার সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে। তখন আমি উহার পূর্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"[৪]

"আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী তার প্রবেশ দ্বার।"[৫]

যে মহাপুরুষ আকাশ-পাতালের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলেন তিনি কি আমাদের মত বৈজ্ঞানিক? একটি বিষয়ের উপর চিন্তা করে আমরা একটি মাত্র রহস্যই উদ্ঘাটন করি আর বৈজ্ঞানিকরূপে খ্যাতিলাভ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। মার্কনী, ফ্যারাডে, জেমস্-ওয়াট, রাইট ব্রাদার্স, আইনস্টাইন, কোপারনিকাস, ক্রুন, গ্যালিলিও, ডালটন যাদের অনেককে আমরা মহাবৈজ্ঞানিক বলে আখ্যায়িত করি তাঁরা আকাশ-পাতালের অথবা শুধু আকাশ বা পাতালের

১. কোরআন ঃ সুরা এনশেরাহ। আয়াত ১-৪।

২. ,৩, ও ৫ মিশকাত (সংগৃহীত–মোহাম্মদ আলী হাসান সাহেবের কোরআনের তর্জমা)।

৪. মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী–কিমিয়ায়ে সায়াদত, ১ম খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

তত্ত্বজ্ঞান দিতে পেরেছেন? তাঁরা এ মহাবিশ্বের অজস্র রহস্যের মধ্য হতে মাত্র দু-একটা রহস্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন কিন্তু হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এ মহাবিশ্বের অজস্র সৃষ্টির রহস্যই জানতেন। আর জানতেন বলেই আকাশ-পাতাল, জীবন-মরণ, বেহশ্‌ত-দোজখ, আরশ-কুরসী সব কিছুরই সন্ধান দিয়েছেন ও তাদের রূপ বর্ণনা করেছেন। তাই বৈজ্ঞানিকের উপর তিনি মহাবৈজ্ঞানিক, পাণ্ডিত্যের শীর্ষে মহাপণ্ডিত, জ্ঞানীর শীর্ষে মহাজ্ঞানী।

বইটির পঞ্চম সংস্করণ চলছে। এর মধ্যে অনেক ভুল-ত্রুটি রয়েছে। এ জন্য ক্ষমা চাই। বইটি কয়েকটি খণ্ডে (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডে) বিভক্ত। চতুর্থ খণ্ড লেখা চলছে। সবারই দোয়া ও আশীর্বাদ কামনা করি। ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশ থেকে যে সব মহান ব্যক্তি–ওলি-গাউস, কবি, লেখক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বইটি পড়ে মুক্ত-প্রাণে আশীষবাণী পাঠিয়েছেন তাঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। সবাইকে জানাই সালাম ও গভীর শ্রদ্ধা।

বিশেষভাবে যার কাছে আমি কৃতজ্ঞ তিনি হলেন ভারতের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, অমূল্য গ্রন্থ প্রণেতা, জ্ঞান-তাপস মনীষী জনাব আবেদ আলী, বি.এ. (অনার্স), এম. এ.–যিনি তাঁর রচিত মহামূল্যবান পাঁচ খানা গ্রন্থ উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

আর, চিরঋণে আবদ্ধ চিন্তাশীল মনীষী, কবিরত্ন, গবেষক, আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক ও ধর্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিত জনাব আজিবুল হক, এম. এ. (বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ)–তাঁর কাছে। প্রেরণার উৎস এ মহান ব্যক্তি। তাঁর প্রতিটি চিঠির প্রতিটি শব্দ অমূল্য হীরকের আলোক স্বরূপ। তাঁর মহান প্রেরণা আমার হৃদয়ে উৎফুল্লের বন্যা বইয়ে দেয়। লেখবার উপকরণ জোগায় এবং ইসলামের শ্বাশত ও চিরসত্যের দ্বার উদ্ঘাটন করার অদম্য সাহস এনে দেয়।

'বুলবুল সংঘ'– লালবাজার বাঁকুড়ার (পশ্চিমঙ্গ) পক্ষ হতে যে সব মহান ব্যক্তি সম্বর্ধনার আয়োজন করে অমূল্য বাণীতে আমাকে ধন্য করেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই পরম শ্রদ্ধা, হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি ও ভালবাসা।

এতদসঙ্গে শ্রদ্ধা নিবেদন করি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক, গবেষক, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কবি জনাব রুস্তম আলী সাহেবকে। তিনি আমার বইগুলো পাঠ করে যে আবেগপূর্ণ ভাষায় সরকার ও সমাজকে সচেতন করেছেন এবং বইগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করে সঠিক মূল্যায়ন করার অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁর তুলনা বিরল। তাঁর নিকট আমি এবং আমার পরিবার-পরিজন সবাই কৃতজ্ঞ।

আর একজন অকৃত্রিম বন্ধুর নাম উল্লেখ না করে পারছি না। যিনি আমার লেখার প্রারম্ভ থেকেই বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করেছেন, রেডিও এবং সাহিত্য সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার সুযোগ দিয়েছেন এবং খবরের কাগজে বিশিষ্ট হেডিং দিয়ে আমার চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন সেই স্বনামধন্য কবিরত্ন ও সুলেখক জনাব মতিউর রহমান বসুনিয়া রংপুর-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)-এর উপর শ্রদ্ধা রেখে তাঁর বাণীতে মুগ্ধ হয়ে যাঁরাই আমার এ সামান্য লেখার মাঝে আনন্দরস খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের সবার জন্যই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই যেন ইহকাল ও পরকালে তাঁরা বৃহত্তর সম্মানের অধিকারী হয়ে চিরশান্তির আবাসে সেই মহাবৈজ্ঞানিকের সান্নিধ্যেই ধন্য জীবনযাপন করেন।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের গবেষণায় যদি এ বইটি সামান্যতম উপকারেও আসে তা হলে এ লেখার স্বার্থকতা অনুভব করে ধন্য হবো।

প্রিয়তম নবীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার সাক্ষ্য হিসাবে বইগুলো প্রচার করবেন, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য ঘরে রাখবেন, পাঠাগারকে সমৃদ্ধশালী করবেন, নব-দম্পতিদের উপহার দেবেন এটাই একান্তভাবে কামনা করি।

(আমিন)

—লেখক

www.pathagar.com

আল্লাহই বৈজ্ঞানিক নবীর শিক্ষক

(কোরআন-এর সাক্ষ্য)

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হইতে একদলকে তোমার অনুগত করিও; এবং আমাদিগকে প্রার্থনা প্রণালী প্রদর্শন কর ও আমাদিগের প্রতি প্রত্যাবৃত হও ; **আর তাহাদিগের হইতে তাহাদিগের মধ্যে একজন রসুল প্রেরণ করিও যিনি তাহাদিগের সম্মুখে তোমার নিদর্শনাবলী পাঠ করিবেন এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন**। নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।"[১] (২ ঃ ১২৮-১২৯)

হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইল (আঃ) যখন কাবা গৃহের ভিত দিচ্ছিলেন তখন তাঁরা একত্রে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বিনীত ভাবে উক্ত প্রার্থনা করেন। কাবার ভিত্তির সঙ্গে ইসলামেরও ভিত্তি ঐ সময় সংস্থাপন করা হলো। তাঁরা এই অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁদের বংশের মধ্য হতে একজন জ্ঞানী, গুণী ও বিজ্ঞানীর জন্ম হয়, যিনি তাঁর অসীম বৈজ্ঞানিক কৌশল ও ক্ষমতার বলে সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডীন করতে পারেন। তাঁদের এ প্রার্থনা যে পূর্ণ হয়েছিল এবং সত্যই যে একজন মহাবিজ্ঞানীর আবির্ভাবে ধরা আলোকিত হয়েছিল একথা সূরা বাকারাহ ১৫১ আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। এ মূল্যবান আয়াতটি নিম্নরূপ–

"আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই একজনকে রসুল করিয়া পাঠাইয়াছি। সে তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনায়, তোমাদিগকে পবিত্র করে ; **তোমাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়,** যাহা তোমরা পূর্বে জানিতে না। "[২] (২ ঃ ১৫১)

এ বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব সম্বন্ধে আল্লাহ তাঁর একটি দু'টি বাণীর মধ্যেই নয় অসংখ্য বাণীতেই ঘোষণা করেছেন। জ্ঞানের সাগর, বিশ্বের করুণা, ধর্মের প্রচারক এ মহান শিক্ষাগুরুর ফর্মুলা বিশ্বের প্রগতি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, প্রতিনিধিত্ব ও বিশ্ব পরিচয়ে অপরিহার্য। তাঁর মহাবিধান যুগ যুগ ধরে চলেছে এবং আবহমান কাল ধরেই চলবে। কোরআনের আরও কতকগুলি বাণীর উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

"আল্লাহ অবশ্য মুমেনের উপর যথেষ্ট দয়া করিয়াছেন যখন তাহাদের মধ্যে তাহাদের জন্য রসুল পাঠাইয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে আল্লাহর নিদর্শন সকল পড়িয়া শুনান, তাহাদিগকে পবিত্র করেন এবং **তাহাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেন আর নিশ্চয়ই তাহারা ইহার পূর্বে অবশ্য স্পষ্ট বিপথে ছিল।**"[৩] (৩ ঃ ১৬৪)

---

১. কোরআন ঃ সূরা বাকারাহ, আয়াত ১২৮–১২৯।

২. ,, সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৫১।

৩. ,, সূরা আল এমরান, আয়াত ১৬৪।

www.pathagar.com

"তিনিই তাঁর রসুলকে সত্য ধর্মসহ পাঠাইয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে তিনি **অপর সমস্ত ধর্মের উপর ইহার শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করিবেন** যদিও মোশরেকগণ ইহাকে না পছন্দ করে।"[৪]

"এবং যদি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হইত তবে তাহাদের একদল তোমাকে প্রথভ্রান্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল এবং তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত বিপদগামী করে নাই ও তাহারা তোমাকে কোন বিষয়ে ক্লেশ দিতে পারিবে না এবং আল্লাহ **তোমার প্রতি গ্রন্থ ও বিজ্ঞান অবতীর্ণ করিয়াছেন**– এবং তুমি যাহা জানিতে না তিনি তাহাই তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং তোমার প্রতি আল্লাহর অসীম করুণা।"[৫] (৫ ঃ ১১৩)

"এবং তোমাকে বিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানীর সন্নিধান হইতে কোরআন শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।"[৬] (২৭ ঃ ৬)

"তোমাদের বন্ধু (মুহাম্মদ) কখনও ভুল করেন না বা কখনও অকৃতকার্য হন না।"[৭] (৫৩ ঃ ২)

---

৪. ,, সূরা তওবা, আয়াত ৩৩।

৫. ,, সূরা নেসা, আয়াত ১১৩।

৬. ,, সূরা নমল, আয়াত ৬।

৭. ,, সূরা নজম, আয়াত ২।

www.pathagar.com

তওরাত ও ইঞ্জিল-এর সাক্ষ্য

(পুরাতন ও নতুন বাইবেল)

"তোমার বংশ শত্রুগণের পুরদ্বার অধিকার করিবে। আর **তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।** কারণ তুমি আমার বাক্য অবধান করিয়াছ ।"[১]

"তোমাদের নিকট থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু **সেই সহায়, পবিত্র আত্মা যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন** এবং আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।"[২]

"আর এমন ঘটিবার পূর্বে আমি তোমাদিগকে বলিলাম যেন ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর। আমি তোমাদের সহিত আর কথা বলিব না ; **কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছেন।"** [৩]

"তোমাদের কাছে এখনও আমার বহু কথাই বলিবার রহিয়াছে। কিন্তু এখন সেগুলিকে তোমরা সহ্য করিতে পারিবে না। যাহা হউক, যখন (সেই) সত্যের আত্মা আবির্ভূত হইবেন, তিনি তোমাদিগকে সত্যের পথে পরিচালিত করিবেন। কেননা, তিনি নিজ হইতে কোন কথা বলিবেন না (এবং) তিনি আমাকে কলঙ্কমুক্ত করিবেন।"[৪]

উপরে বর্ণিত বাণীসমূহ হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ নিজে শিক্ষক হয়ে সেই অমর বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করেছেন যুগে যুগে তাঁর মহাবাণীর মাধ্যমে। তাই **"বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)"** এই নতুন নামটি শুনে চমকে উঠবেন না। চলুন আমরা দেখি জগৎ হয়েছে ধন্য। জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, সাধক, গবেষক, সাহিত্যিক ও দার্শনিকরা তাঁর কোন্ তত্ত্ব খুঁজে পেয়ে জ্ঞানসাগরে ডুব দিয়েছেন। আর হীরা-মুক্তা আহরণ করে জ্ঞানালোকের পথ উজ্জ্বল করেছেন।

---

১. বাইবেল ঃ আদি পুস্তক ২২-৮।

২. ঐ যোহন ১৪-২৫, ২৬।

৩. ঐ যোহন ১৪-২৯.৩০।

৪. ঐ যোহন, ৬-১৪।

www.pathagar.com

এলো মরুর পাখি

এ কোন্ মধুর বাণী নিয়ে
এলো মরুর পাখি।
বিশ্ব-জাহান তাঁরই রূপে
মেলল আবার আঁখি ॥
কণ্ঠে তাহার তৌহিদ বাণী
ডাকল সবাই যারে শুনি
বল আল্লাহ্ ছাড়া নাইরে মাবুদ
চল্ তাঁকেই প্রাণে ডাকি ॥
এ কোন্ ... ... পাখি।
দেব দেবীর নাই ক্ষমতা
পূজা করা হয়রে বৃথা
আকাশ ভুবন যে সৃজিল
চল তার নাম জপি ॥
এ কোন্ ... ... পাখি।
নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত
গোলাম যত কর আজাদ
এতিম দুঃখীর করলে সেবা
আমি হব সাক্ষী ॥
উঁচু-নিচু নাই ভেদাভেদ
সব সমান, ভুলো প্রভেদ
আদম-হাওয়া হ'তে পয়দা
এই স্মরণ রাখি ॥
এ কোন্ ... ... পাখি।

—লেখক

www.pathagar.com

সমাজ বিজ্ঞান

মরুর দেশ আরব। মরুশ্মশানে তার বুক শূন্য। মরুর লু-হাওয়ায় তার আকাশ-বাতাস সমাচ্ছন্ন। যেখানে মেঘ নেই, যেখানে পানি নেই, যেখানে বাদলধারা নেই—সেখানে প্রেমের অশ্রু ঝরে না, সেখানে মায়া-মমতায় বুক ভেজে না, সেখানে পরের তরে সহানুভূতিতে হৃদয় গলে না। তাই দ্বন্দ্ব, কোলাহল, পাশবিকতা, নাস্তিকতা, অবাধ্যতা, হিংস্রতা, ব্যভিচার, অত্যাচার বল্গাহীন হরিণের ন্যায় সীমালঙ্ঘন করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষে মানুষে পর্বতসমান প্রভেদ, বংশে বংশে হানাহানি, রাজায় প্রজায় খুনোখুনি। অসার দেব-দেবী ছিল এ দেশের সম্বল। পূজা-অর্চনা ছিল এ দেশের পদ্ধতি। চুরি ডাকাতি ছিল এ দেশের প্রথা। নারী-শিশুকে জীবন্ত হত্যা করা ছিল এ দেশের রীতি। উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ছিল তাদের আনন্দ। মদ্যপান, জুয়াখেলা, কুৎসা গাওয়া, সুদ খাওয়া ছিল তাদের স্বাভাবিক স্বভাব।

এদেশের মাটিকে খাঁটি করবার পদ্ধতি, এ দেশের জানোয়ারকে মানুষরূপে গড়ে তুলবার জ্ঞান, এ দেশের এতিম-দুঃখি, কাঙাল ফকিরকে, রাজা, মহারাজা ও ধনাঢ্যের সাথে এক লাইনে মিশিয়ে দেবার বুদ্ধি দিয়ে যিনি নতুন থিওরী তুলে ধরলেন তিনিই হলেন অনাদিকালের জগৎবরেণ্য বিশ্বনেতা ও বৈজ্ঞানিক নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। এ মরুর পাখি মধুর কণ্ঠে গেয়ে চললেন—

"ল-ইলাহা ইল্লাল্লাহু—মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ।"

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁরই প্রেরিত রসুল।

এ বাণী সাগর-নদীর পানিকে মিশিয়ে দিল। এ মধুর ডাকে বিশ্ব-ভুবন হেসে উঠল। এ আহ্বানে কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলের কলি পাপড়ি মেলে দিল সরল সহজ পথ যুগ যুগান্তরের অন্ধকারকে দূরীভূত করল। কিন্তু বুলেট মারল পাষাণ হৃদয়ে—বুলেট মারল প্রতিমাপুঞ্জের গায়ে। আঘাত দিল স্বৈরাচারীর মনে। বোমা নিক্ষেপ করল অত্যাচারীর ধনে। আর মর্মবেদনা দিল ব্যভিচারীর কানে কানে।

এ বাণী শিখিয়ে দিল সবারই মা'বুদ এক। সবারই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ—যিনি চির জীবন্ত, চির জাগ্রত, চির বিস্ময়, চির অক্ষয়। যিনি আত্মনির্ভরশীল, করুণাশীল, দানশীল। যিনি জন্মদাতা, মৃত্যুদাতা, ত্রাণকর্তা, রক্ষাকর্তা, ধ্বংসকর্তা। যিনি শ্রবণকারী, দর্শনকারী, ক্ষমাকারী, গোপনকারী, সৃষ্টিকারী। যিনি মহামহিম, মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী, মহাসম্মানী, মহাবিচারক ও মহাশাসক। যিনি মহামহীয়ান,মহাগরিয়ান, মহাশক্তিমান ও মহাসামর্থ্যবান। যিনি মনের বনে, আকাশ ভূবনে, পাতাল-গহনে, সবার সনে।

মা'বুদের এ পরিচয় কেউ দিতে জানে নি। মা'বুদের এ পরিচয় কেউ দিতে পারে নি। মা'বুদের এ দয়া কেউ কোনদিন বোঝে নি। আল্লাহর জ্ঞান, আল্লাহর ধ্যান, আল্লাহর মান, আল্লাহর দান দেখালেন প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। বিশ্ব যখন ডুবুডুবু, ধরা যখন টল্‌টলায়মান, জ্বীন এনসান যখন আত্মকলহে লিপ্ত তখনি আবির্ভাব হলো এ মহাবৈজ্ঞানিকের। বুকে তাঁর অসীম বল, চোখে তাঁর আলোক দীপ্তি, হৃদয়ে তাঁর অফুরন্ত দয়া, আর প্রাণে তাঁর মহাসাগরের মায়া।

www.pathagar.com

"আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ"

উদাত্ত কণ্ঠে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ঘোষণা করলেন—"আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র। শুধু পার্থক্য এই যে আমার নিকট প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে আল্লাহই তোমাদের একমাত্র উপাস্য।"[১] আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মাধ্যমে এ ঘোষণা পাষাণ হৃদয় কাঁপিয়ে তুলল; জালিম অত্যাচারীর মাথায় কুঠারাঘাত হানল। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই; ধনী গরিবে পার্থক্য নেই, বাদশা-ফকিরে প্রভেদ নেই—এ কথাই ছিল এ বাণীর সারমর্ম। এ থিওরীই ছিল সমাজ বিজ্ঞানের মূল থিওরী। এ থিওরীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল সুন্দর ও সাবলীল সমাজব্যবস্থা। অহঙ্কার লোভ-লালসা, ধনের অভিমান ও কৌলিন্যের গৌরবকে এখানেই কবর দেওয়া হলো।

সবার সেরা মানুষ। সৃষ্টিজগতে তার উপরে আর কেউ নেই। যে মানুষ নিজের আত্মাকে চেনে—সে অন্যকেও চেনে। যে মানুষ নিজেকে ভালবাসে সে অন্যকেও ভালবাসতে জানে। যে মানুষ নিজের পরিচয় জানে সে অপরের পরিচয় নিতে আনন্দ পায়। মানুষকে জানা, মানুষকে চেনা ও মানুষকে ভালবাসাই আল্লাহর নৈকট্য এনে দেয়। এমন উচ্চ ধারণা কার মাথায় এসেছিল? মানুষ হয়ে মানুষকে প্রাণভরে ভালবাসার প্রেরণা কার অন্তরে দোলা দিয়েছিল? মাতা-পিতাকে ভক্তির চূড়ায় কে সমাসীন করেছিল? যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, যাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তঃকরণ, যাঁর তুলনাবিহীন পূত-চরিত্র, যাঁর সীমাহীন চিন্তাধারা, যাঁর প্রাণভরা মায়া আর অশ্রুভরা আঁখি তিনিই হলেন মানবকুল শিরোমণি বৈজ্ঞানিক নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)।

সমাজতন্ত্রের নেতারা কৃষক শ্রমিককে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত লেলিয়ে দিয়েছিল মালিক ও ধনী গোষ্ঠির পিছনে। যার ফলে প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার হাজার বিত্তবান লোককে তারা গাছের ডালে ঝুলিয়ে প্রাণ নিয়েছিল। বার্নাড শ' দুঃখ করে তাই কার্ল মার্কসের ক্রূর হাসির কথা লিখে গেছেন। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) অত্যাচারের প্লাটফর্মে নামেন নি—ধনী গোষ্ঠীকে ফাঁসির মঞ্চে ঝোলান নি, কৃষক মজুরকে তাদের পিছনে এমনভাবে লেলিয়ে দেন নি—তিনি দিয়েছিলেন প্রেমের বুলি, তিনি দিয়েছিলেন ধনীর হৃদয়ে পরকালের ভীতি, তিনি শিখিয়েছিলেন সাম্যের গীতি। তাই ওমর, ওসমান ও আবুবকরের মত ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও ধনের মায়া ছেড়ে প্রাণের মায়ায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। আর জাতির খেদমতে নিজেদের ঐশ্বর্যকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। গরিবের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের দুরবস্থা দেখে নিজের পিঠে বোঝা বহন করে খাদ্য পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। চাকরকে স্বীয় উটের পিঠে তুলে নিজ হস্তে রশি ধরে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন। কার থিওরীর মোহে, কার বিপ্লবী সমাজ বিজ্ঞানের পথ ধরে হাজার হাজার নরপতি পথের ধুলি সম্বল করে ছিলেন? কার মন্ত্রে বশীভূত হয়ে পুরানো কৃষ্টি, পুরোনো সভ্যতার মাথায় লাঠি মেরে কোটি মানুষ এক আত্মা, এক ধ্যান ও এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা দিয়েছিল? পারে নি, আর পারবে না বলেই এ মহাবৈজ্ঞানিকের দ্বারস্থ হয়েছে। সমগ্র দুনিয়াকে এক হাতে নিয়ে—এক শাসন, এক চিন্তা ও এক মন্ত্রে দীক্ষিত করবার ক্ষমতা হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ছাড়া আর কেউ করতে পারে নি। শান্তির পথে, সবার সাথে সবার হাত মিলিয়ে দেবার এমন কৌশল কেউ শেখে নি। তাই বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক জর্জ বার্নাড শ' দুঃখ করে বলেছেন—

---

১. সহীহ বুখারী, সংগৃহীত — মুহাম্মদ আজাহারউদ্দিন, এম. এ. কর্তৃক হাদিসের আলো, ১ম খণ্ড।

www.pathagar.com

"I believe if a man like Mohammad were to assume the dictatorship of modern world, he would succed in solving its problem in a way that would bring its much needed peace and happiness."

"আমি বিশ্বাস করি মুহাম্মদ (দঃ)-এর মত একজন লোক এই আধুনিক বিশ্বের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন তবে এই জটিল সমস্যার এমন সুন্দর সমাধান করতেন, যা এনে দিত আমাদের প্রয়োজনীয় সুখ ও শান্তি।"

কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করে তৃপ্তি পান। তাঁরা সেখান থেকে মধু সংগ্রহ করে নিজেদের মৌচাকে ভর্তি করেন। শুধু তাই নয়, বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে কেন্দ্রীভূত করে মানব সম্মুখে প্রকাশ করেন। এখান থেকেই পান জ্ঞানের আলোক, বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা। এই জ্ঞানের আলোকে যারা নিজেদের পথ পরিষ্কার করেন তারাই হন স্মরণীয় ও বরণীয়। বার্নাড শ' মুহাম্মদ (দঃ)-এর জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে ছিলেন। তাই প্রকৃত সত্য গোপন করেন নি। এজন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই ও অন্তর থেকেই শ্রদ্ধা নিবেদন করি। যাঁরা বার্নাড শ'র মন্তব্যে আজও স্বীকৃতি জানাতে কার্পণ্য করছেন তাঁরা গভীরভাবে রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর আরও দু-একটা তত্ত্বমূলক বাণী দেখুন এবং নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও থিওরীকে যাচাই করুন।

"মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট যাঁহার দ্বারা মানবের কল্যাণ সাধিত হয়।" (মিশকাত)

"খোদার নিকট সেই ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট যে তাহার বন্ধুগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট, খোদার নিকটও সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট।" (মিশকাত)

"সমস্ত সৃষ্ট জীবই আল্লাহর পরিজন এবং সেই ব্যক্তি তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে।" (বয়হাকী)

"সে আমাদের কেহ নয় যে কনিষ্ঠদের প্রতি সদয় হয় না, বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সম্মান করে না, সৎকার্যে আদেশ করে না এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে না।"[১]

"যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না আল্লাহও তাহাকে দয়া করেন না।"[২]

ধনী গোষ্ঠীকে ফাঁসীর মঞ্চে ঝুলিয়ে, অক্ষম, অকর্মন্য, ভিক্ষুক ফকিরকে বুলেট মেরে, স্বৈরাচারীর খড়্গ কৃপাণ হাতে নিয়ে, নারী সমাজকে পর্দার অন্তরাল থেকে টেনে রাস্তায় বের করে সমাজ বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করা যায় না। সমাজ বিজ্ঞানীর বিজয় মুকুট পরতে হলে বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)-এর থিওরী হাতে নিয়ে অন্ধকারে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে এবং বুভুক্ষু জনতার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে হবে। ব্যথিতের ব্যাথায়, দুঃখীর দুঃখে, শ্রমিকের ঘামে, এতিমের কষ্টে ও বিধবার অশ্রুতে সাথী হতে হবে। সাত তলার উপরে আরাম কেদারায় বসে পোলাও কোরমা ও বিরিয়ানী খেলে সমাজ বিজ্ঞানের যে থিওরী দেবেন সেটা হবে ন্যাকামী ও ভণ্ডামী।

অহঙ্কার

১. ও ২. তিরমিজ, সংগৃহীত হাদিসের আলো কৃত মুহাম্মদ আজাহারউদ্দিন, এম. এ.

www.pathagar.com

অহঙ্কারীর প্রতি কঠোর বাক্য উচ্চারণ করে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ঘোষণা করলেন—"যার হৃদয়ে একবিন্দু অহঙ্কার আছে সে কখনও বেহেশ্‌তে যাবে না।"[৩]

অহঙ্কার পতনের কারণ—এ বাক্য আজকের নয়। বহু মনীষীই এ কথা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। ধণের অহঙ্কার, মানের অহঙ্কার সম্ভ্রমের অহঙ্কার, দৈহিক বলের অহঙ্কার, সৌন্দর্যের অহঙ্কার, কৌলিন্যের অহঙ্কার কোনটিই স্থায়ী নয়। সবই ভঙ্গুর এবং প্রাতঃকালের শিশিরবিন্দুর মতই ক্ষণস্থায়ী। যে জাতি অহঙ্কারে লিপ্ত হয়েছে সে জাতিই ধ্বংস হয়েছে। ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে। স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও রোমান প্রভৃতি জাতির ভাগ্যেও ঠিক তাই ঘটেছে। নমরুদ, সমুদ, আদ, সাদ্দাত, কারুন, ফেরাউন, লাহাব, আবু জেহেল ও উমাইয়া এদের অহঙ্কার যখন চরম সীমায় পৌঁছায় এবং জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, ঠিক তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছে। কোন্‌ জাতি অহঙ্কার করে সমুন্নত হয়েছে? কোন্‌ ধনী অহঙ্কার করে তার ধন অক্ষুণ্ন রেখেছে? কোন্‌ বলবান তার শারীরিক বল যুগ যুগ ধরে টিকিয়ে রেখেছে? একটি অহঙ্কারীও তার অহঙ্কারের মর্যাদাকে ধরে রাখতে পারে নি। উপরন্তু এর ফলাফল হয়েছে বিষময়। নিজের জীবনের জন্য সর্বনাশ ডেকে এনেছে। আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের মুখে কলঙ্ক লেপন করেছে। জাতির জীবনে বিভীষিকা ডেকে এনেছে। উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করেছে। তাই তাদের ধ্বংস হয়ে উঠেছে অনিবার্য। এ ধ্বংস কেউ রোধ করতে পারে নি। মানুষের অন্তর থেকে অহঙ্কার মুছে দেবার সংকল্প নিয়েই বৈজ্ঞানিক নবী মুখে যেমন এ থিওরী প্রচার করলেন, নিজের জীবনের প্রতিটি কর্মে এবং আচরণেও তাই দেখালেন। কোরেশ বংশে জন্ম নিয়েও, অলৌকিক ক্ষমতা হাতে নিয়েও, ধন-দৌলতের অধিকারী হয়েও, আল্লাহর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েও তিনি জীবনে কোনদিন অহঙ্কার করেন নি এবং শিক্ষা কাউকে দেন নি। বরং কঠোর ভাষায় ঘোষণা করলেন ঃ

"অহঙ্কারী কুকুরের ও শূকরের স্বভাবপ্রাপ্ত হয়।"

আর তিনিই অহঙ্কারের মূলোৎপাটন করে সাম্যের গান গাইলেন—

"আরব, অ-আরব, সাদা আর কালোর কোন ভেদাভেদ নেই।"

অত্যাচার

অহঙ্কার যেমন মানুষকে নিকৃষ্ট স্তরে পৌঁছে দেয়, অত্যাচার এবং অন্যায় আচরণও তেমনি সমাজে বিভীষিকা ও ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং একটা জাতিকে পঙ্গু করে দেয়। যে অত্যাচারী, তার কাছে সমাজ কিছুই আশা করতে পারে না। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা তার থাকে না। তার কাছে মনের কথা প্রকাশ করতেও কেউ সাহস পায় না। তার মন যেমন হয় পাষাণ, হৃদয়ও হয় তেমনি শ্মশান। প্রেম দিয়ে যদি মানুষের মন জয় করা না যায়, স্নেহ ও প্রীতি দিয়ে যদি আকৃষ্ট করা সম্ভব না হয় তবে অত্যাচার করে, ভীতি আনয়ন করে সমাজকে সবল ও সুস্থ করা যায় না। অত্যাচারীর হৃদয় মায়াবিবর্জিত, কলুষ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন পাষাণ হতে পাষাণতর। তাই হজরত মুহাম্মদ (দঃ) অত্যাচারীকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

"অত্যাচার হতে সতর্ক থাক কারণ উহা অন্তরকে ধ্বংস করে।"[১]

---

৩. শায়খান, আবু দাউদ ও তিরমিজ।

১. সগির।

www.pathagar.com

কারও প্রতি অত্যাচার না করা, কাউকে ঘৃণা না করা, একে অপরকে সাহায্য করাই ইসলামের বিধান। বৈজ্ঞানিক নবী সমাজের আকাশচুম্বি পার্থক্যের অবসান করতেই ঘোষণা করলেন ঃ

"মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই; তারা পরস্পরের প্রতি **অত্যাচার করবে না এবং পরস্পরকে ঘৃণার চোখে দেখবে না**। অন্তঃকরণই পুণ্য কাজের বাসস্থান, অতএব সে ব্যক্তিই পুণ্যশীল যে অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করে না। **এক মুসলমানের জিনিস অন্য মুসলমানের জন্য হারাম**—তার রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান।"[২]

"সমস্ত মুসলমানের এক দেহ। যদি কোন ব্যক্তি মাথায় বেদনা অনুভব করে তবে তার সমস্ত শরীর বেদনাগ্রস্ত হয় এবং যদি তার চোখ বেদনাগ্রস্ত হয় তবে সে তার সমস্ত শরীরে বেদনা অনুভব করে।"[৩]

"সমস্ত মুসলমান একটি প্রাচীর সদৃশ। উহার কতক অংশ অপর অংশকে দৃঢ় করেছে। অতঃপর তিনি তাঁর অঙ্গুলিগুলির মধ্যে অন্য অঙ্গুলি চালনা করে দেখালেন যে এরূপে তারাও পরস্পর সাহায্য করে।"[১]

"মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। কারো প্রতি অত্যাচার করবে না। কাউকে বিপদের মাঝে ফেলে চলে যাবে না। যে ব্যক্তি তার ভ্রাতার অভাব দূর করে, খোদা তার অভাব দূর করবেন এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দুঃখ দূর করে, রোজ কিয়ামতে খোদা তার দুঃখ দূর করবেন এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন করে, রোজ কিয়ামতে খোদা তার দোষ গোপন করবেন।"[২] রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বাণী লিখতে গেলে অসংখ্য বই হয়ে যায়। প্রতিটি বাণীই রত্নস্বরূপ। একটা বাণীও অমূলক নয়, অহেতুক নয়, এবং অনর্থক নয়। সমাজ গঠনে বাণীগুলি অপরিহার্য। সমাজবিজ্ঞানের মূল থিওরীর জন্য এগুলি অমোঘ ও অপরিবর্তনীয়। এমন বিপ্লবী চিন্তাধারা ইতিপূর্বে কোন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা পণ্ডিত ব্যক্তিই দিতে পারেন নি।

যেখানে মানুষে-মানুষে পর্বতসমান পার্থক্য, যেখানে অন্তরে-অন্তরে হিংসানল প্রবাহিত, যেখানে ভেতরে-বাইরে কুরুক্ষেত্র বিরাজমান সেখানে কার সাধ্য স্তুতিবাক্য দিয়ে, সাম্যের গান গেয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে সমাজবিজ্ঞানের থিওরী একটা গোটা বিশ্বের বুকে বদ্ধমূল করে দেয়? কালমার্কস ও লেনিনের সমাজতন্ত্রবাদ সারা বিশ্ব মেনে নিতে পারে নি। একটা দেশের সামান্য গণ্ডীর মধ্যেই ছিল আবদ্ধ। শুধু তাই নয়, যারা সমাজতন্ত্রের এ বুলি আওড়ায় তারা নিজেদের জীবনেই তা প্রতিফলিত করতে পারে নি। সমাজবিজ্ঞানের কি তারা দিয়েছে? কি বিপ্লব এনেছে? যা দিয়েছে এবং যে বিপ্লব এনেছে তা শুধু তাজা রক্তের বিনিময়ে ও অবিশ্বাস এবং প্রতারণার জাল বিস্তার করে। অমুসলিমগণ আমার এ কথার প্রতিবাদ করবে জানি। তাই অমুসলিম বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের মুখের ভাষাই আমাকে বলতে হয় ও স্বীকার করতে হয় যে হজরত মুহাম্মাদ (দঃ) ছিলেন বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমাজবিজ্ঞানী।

"His creed is equally suited to the despotism of Russia and to the democracy of the United States. It necessarily connotes the existence of a universal empire."

---

২. ও ৩. মুসলিম।

১. সহি বুখারী।

২. হাদিসের আলো।

www.pathagar.com

অর্থাৎ "তাঁরই ধর্মনীতি রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রে ও আমেরিকার গণতন্ত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতপক্ষে ইহা একটি বিশ্বজনীন সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সমর্থক।"[১]

বিখ্যাত দার্শনিক আলফ্রেড মার্টিন তাঁর "The Great Religious Teacher of the East" পুস্তকে বলেছেন ঃ

"হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যে বিপ্লবী প্রচেষ্টায় আরবে সমাজ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল।"

পাদরী বসওয়ার্থ স্মিথ সাহেব বলেছেন,

"ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব সৌভাগ্য যে, মুহাম্মদ একাধারে তিনটির স্থাপয়িতা—একটি জাতি, সাম্রাজ্য ও একটি ধর্ম।"[২]

জগতের বহু মনীষীই যুগে যুগে এ ধরনের মন্তব্য করে হজরত মুহাম্মদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। 'জগৎগুরু' শীর্ষক পুস্তকে আমি এ ধরনের অনেক মূল্যবান মন্তব্য পেশ করেছি। আগ্রহশীল পাঠকগণ আশা করি বইটি পড়বেন এবং হজরত মুহাম্মদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব উপলব্দি করবেন।

অন্তরে-অন্তরে, ভেতরে-বাইরে, দেশ-দেশান্তরে, প্রেমের বাণী ছড়িয়ে দিতে পারে, প্রেমের ডোরে সারা বিশ্বের মানুষকে বেঁধে রাখতে পারে—এমন বিজ্ঞানী কে আছে? কোন্ সমাজবিজ্ঞানীর হাতে এমন সুদৃঢ় প্রেমের অসি শোভা পায়—যার ধারাল ক্ষমতাবলে নরনারী নির্বিশেষে আত্মসমর্পণ করে প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খায়? তিনিই সর্বযুগের থিওরীদাতা বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)—যাঁর কথা অমর, অক্ষয়। কেমন মধুর বাণীই তিনি দিলেন জগৎকে ঃ

"আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করার পর মানুষকে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের পরিচায়ক।" (সগির)

"যাহার মধ্যে তিনটি গুণ থাকিবে আল্লাহ্ তাহার মৃত্যু সহজ করিবেন এবং তাহাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাইবেন। (১) দুর্বলের প্রতি সদয় ব্যবহার, (২) মাতাপিতার প্রতি সদ্ভাব, (৩) ক্রীতদাসের প্রতি করুণা।" (তিরমিজি)

"যে ব্যক্তি নিজে পেট-পুরে আহার করে এবং তাহার নিকটতম প্রতিবেশীকে অভূক্ত রাখে সে কখনও মুসলমান নয়।" (মিশকাত)

"আমি কি তোমাদিগকে বলিব কে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম? যাহারা একাকি আহার করে, চাকরদিগকে প্রহার করে এবং কাহাকেও কিছু দিতে কুণ্ঠিত হয়।" (মিশকাত)

"যে ব্যক্তি কোন রুগীর সেবা করে সে যেন বেহেশ্তের বাগিচায় ফুল তুলতে থাকে।" (মুসলিম ও তিরমিজি)

এমন সুন্দর বাণী কার মুখে শোভা পেয়েছে? সমাজকে সুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে কে এর চাইতে মূল্যবান থিওরী দিয়েছে? কার আঁখিতে আপন পর সবাইকে একাকার করে নিয়েছে? কার কোলে স্নেহের পরশ পেয়ে অনাথ-এতিম, দুঃখী-ফকির স্নিগ্ধ হাসিতে দিক-দিগন্ত ছড়িয়ে দিয়েছে? কার সাহসে দুর্বলের অন্তর সবল হয়েছে, বুভুক্ষের উদর ভর্তি হয়েছে, ক্রীতদাসের হস্ত শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে এবং অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে?

টীকা ঃ ১. "Islam and European Civilization"—Philosopher Josef J. Numan.

টীকা ঃ ২. 'Mohammed and Mohammedanism'—Boswarth Smith. বঙ্গানুবাদ-ডক্টর শহীদুল্লাহ ইসলাম প্রসঙ্গ। পৃঃ ২১১।

www.pathagar.com

লোভ-লালসা

"আধিক্যের আকাঙ্ক্ষাই তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে পর্যন্ত না তোমারা কবরে পৌঁছিতেছ।"[১] (১০২ ঃ ১)

বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে একটা প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তা চলে। এই প্রবৃত্তি হল লোভ এবং লালসা। ধনের লোভ, সম্পত্তির লোভ, গাড়ি-বাড়ির লোভ, নারীর লোভ, বিদ্যার লোভ, বিলাসিতার লোভ, পুণ্যের লোভ, ভোগের লোভ ইত্যাদি। রসুলুল্লাহ (দঃ)-ও তাঁর এক বাণীতে একথা বলেছেন ঃ

"দুটি দ্রব্য বৃদ্ধের হৃদয়কে যৌবনত্ব দান করে। একটি পার্থিব দ্রব্যের প্রতি ভালবাসা, অপরটি সুদূরপ্রসারী আশা।" (সহি বুখারী)

লোভের বসে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। বিবেক বিবেচনা হারিয়ে ফেলে। আপন জনকে দূরে ঠেলে। অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার সমাজে বিভীষিকার ঢেউ তোলে। দয়া থাকে না, মায়া থাকে না, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, পরের তরে চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরে না। সমাজকে করে, পঙ্গু জাতিকে করে ধ্বংস এবং নিজের আত্মাকে করে কলুষিত। তাই বিজ্ঞানী নবী সাবধান করে দিলেন তাঁর বাণীতে ঃ

"লোভী কখনও বেহেশ্‌তে যাবে না।" (সগির)

যে লোভে মানুষ কঠোর হয়, যে লোভে হৃদয় পাষাণ হয়, যে লোভে উন্মাদনা আসে, সে লোভে মানুষ একান্ত আপনজনের মাথায় কুঠারাঘাত করে। সেই লোভীর প্রতি সতর্ক থাকতেই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন বাণীতে। কোরআনেও এরূপ উপদেশ যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন—

"শয়তান তোমাদিগকে অভাবের ভয় দেখাইবে এবং অসৎ উপায়ে উপার্জনের পথ দেখাইবে।"[১] (ঃ ২৬৮)

অন্যথায় সৎভাবে জীবিকা অর্জন ও ধনোপার্জনকে হজরত নিষেধ করেন নি বরং উৎসাহিত করেছেন। ধনীগোষ্ঠীকে নিজেদের ধনদৌলত নিঃশেষ করে গরিবের হাতে তুলে দিতে বলেন নি। তিনি বলেছেন ঃ

"অভাব মোচনের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ধন যে ব্যক্তি গ্রহণ করিতেছে, সে ব্যক্তি নিজের ধ্বংস ও বিনাশের বস্তু নিজ হাতে তুলিয়া লইতেছে অথচ সে বুঝিতে পারিতেছে না। আবার ইহাও জানিয়া রাখ যে নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ একেবারে বিতরণ করিয়া দেওয়া, যাহাতে পশ্চাতে অভাবের তাড়নায় অস্থির হইতে হয়, এমন দেউলিয়া হইয়া দান করাও মাকরূহ।" (হাদিস)

"তোমরা নিজেদের হস্তকে সম্পূর্ণরূপে প্রশস্ত করিয়া দিও না যাহাতে তিরস্কার ও অনুতপ্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়।"[১] (১৭ ঃ ২৯)

এমন মূল্যবান জীবনপদ্ধতি কে দিতে পেরেছেন? এমন সুন্দর ও সাবলীল ব্যবস্থা কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন? ধনীকে বুলেটে নিধন করতে বলেন নি, তিলে তিলে পিষে মারতে বলেন নি অথচ ধনের লোভ থেকে দূরে থাকতে কি সুন্দরই না উপদেশ দিয়েছেন। দাতা

টীকা ঃ ১. সুরা তাকাসোর। আয়াত ১।

১. সুরা বাকারাহ—রুকু ৩৭। আয়াত ২৬৮।

টীকা ঃ ১. সুরা বনি ইসরাইল—রুকু ৩। আয়াত ২৯।

www.pathagar.com

ধনীকে সম্মানের উচ্চতম শিখরে স্থান দিয়েছেন। আবার তার দানকে গ্রহণ করতেও দুঃখীদের বলেছেন ঃ

"দাতার খাদ্য প্রতিষেধক এবং কৃপণের খাদ্য ব্যাধিমূলক।" (সগির)

সমাজকে গড়ে তুলবার জন্য, সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, এমন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সূত্র অন্য কোন নবী, পরগম্বর বা কোন জ্ঞানী দিতে পেরেছেন কিনা আমি জানি না।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে দান করে সে দাতা। পুণ্যলাভের আশায় যে দান করে সে পুণ্যবান ও ভাগ্যবান। পরের দুঃখে দুঃখিত হয়ে যে তার ধন দান করে সে সমাজের আদর্শ। নিজের আত্মাকে প্রমুক্ত করতে যে তার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে সে পরকালের চন্দ্র।

তাই মুমেন দাতার দানে কোন ভেজাল থাকে না। এ দান গ্রহণ করলে কারও সর্বনাশ ঘটে না। এ দানের বস্তু থেকে কেউ মৃত্যু বরণ করে না। কেননা এ দানের পেছনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য থাকে না, কোন অসাধু পরিকল্পনা থাকে না। তাই দাতার দানের বস্তুকে গ্রহণ করতে প্রিয় রসুল উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য! একই দান কৃপণের হাত থেকে নিতে নিষেধ করেছেন কেন, এ তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে জ্ঞানী এবং বিজ্ঞানীরা কি বলবেন জানি না, তবে আমার সীমিত জ্ঞানের পরিসরে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে যা পেয়েছি তাই পেশ করছি।

কৃপণ অর্থে আমরা বুঝি—কঠিন পাষাণ, যার দানের হস্ত সঙ্কুচিত। যার ধন তার রক্তবিন্দু, যার মর্যাদা তার কাছে তুচ্ছ, যার চোখের বালি—আল্লাহর ভয়ে যে ভীত নয়, রসুলের বাণী যে মানে না, সৎকর্ম যে বোঝে না, ধন-সম্পত্তি যার ওপর প্রভাব বিস্তার করে, হিংসায় যার অন্তর পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, লোভ যার দেহকে পোকার মত খেয়ে নিঃশেষ করে, সে-ই প্রকৃত কৃপণ। এই কৃপণের কাছে যে দানের আশা করে সে আর এক কৃপণ। কৃপণ যখন দান করে তখন তার স্বতঃপ্রবৃত্তিকে অন্তরে সতেজ রেখেই দান করে। প্রতিদান ছাড়া দানের আশা সে করে না। তাই তার দানে থাকে অসৎ উদ্দেশ্য। মিশ্রিত থাকে বিষ। দানের প্রলোভনে মন কেড়ে নেয়। দানের অছিলায় সম্পত্তি হস্তগত করে। দানের নামে বিভীষিকা ও ত্রাসের সৃষ্টি করে। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। দানের বদলে এমন জালিয়াতি ও সর্বনাশের কথা অনেক শোনা গেছে। কৃপণ ব্যক্তি ছাড়া এমন কুকর্ম আর কাউকে করতে দেখা যায় নি। এ থিওরী কষ্টি-পাথরে যাচাই করা একটা জাতি, একটা দেশ ও একটা বিশ্বের জন্য এ মহাবাণী গুরুত্বপূর্ণ।

নারীর লোভ

নারী ভোগ-বিলাসের বস্তু। নারী মনের বাসনা, হৃদয়ের কামনা, আত্মার তৃষ্ণা, চক্ষুর তৃপ্তি, যৌবনের ক্ষুধা। তাই নারীর সঙ্গ ছাড়া পুরুষের জীবন ব্যর্থ। যৌবনে নারী যেমন বৃষ্টিধারার ন্যায় আনন্দ দান করে, বৃদ্ধ বয়সেও তেমনি তার পরিচর্যা ও সরস বাক্যালাপ প্রাণশক্তি দান করে। তাই নারীর নামে সবাই পাগল। নারীর হাসি, নারীর প্রেম, নারীর সেবা পুরুষকে উন্মাদ করে তোলে। নারীকে ভালবাসে না, নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় না এমন পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। সাধু, ভক্ত, নবী, পয়গম্বর, সবাই চায় এই নারীর সান্নিধ্য। সবাই কামনা করে তার প্রেম এবং বাহুর আবেষ্টনী। তাই পুরুষ তার বল-শক্তি, বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা সব হারিয়ে ফেলে আবদ্ধ হয় নারীর ঐন্দ্রজালিক মায়ায়। এ মায়ার পাশ কেটে, এ

www.pathagar.com

প্রেমের বাঁধন ছেড়ে পুরুষের দূরে থাকা কঠিন এবং অত্যন্ত কঠিন। কেননা নারী পুরুষেরই অর্ধাঙ্গিনী, পুরুষের শোভা, পুরুষের ভূষণ। আমাদের আদি মানব আদমকে (আঃ) আল্লাহ্ অত্যন্ত সুন্দর, সুগঠিত ও সুপরিমিত ভাবেই সৃষ্টি করলেন, কিন্তু তবু দেখলেন যে, তার কি যেন অভাব। তাই মনে তার পূর্ণ আনন্দ নেই। তখন আদমের বাম পার্শ্বের একখানা অস্থি নিয়ে আল্লাহ্ এক পরমা সুন্দরী নারী সৃষ্টি করলেন এবং তার নাম রাখলেন হাওয়া অর্থাৎ শান্তিদায়িনী। এই হাওয়াই আমাদের আদি মাতা। আমাদের কামনা ও বাসনার প্রিয়া, চির সঙ্গিনী, অপার আনন্দদায়িনী। তাদের প্রেমপরশ ও মধুমিলনের যুগসন্ধিক্ষণেই রূপ নিল পরবর্তী মানব সন্তান।

নারীর লোভ সংবরণ করা কঠিন। কারণ নারী পুরুষেরই অর্ধাঙ্গিনী—পুরুষের জোড়া। একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন পাশাপাশি রাখলে যেমন পৃথক হয়ে থাকতে পারে না, একজন নারী ও একজন পুরুষও তেমনি পৃথক হয়ে থাকতে পারে না। পরস্পরের আকর্ষণ বলেই একে অপারকে আকৃষ্ট করে। তাই নারীর লোভ দোষণীয় নয়, নিন্দনীয় নয়। বিপরীতধর্মী দ্বিজাতীয় সৃষ্টির সুসমন্বয়ে আল্লাহ্পাক নিজেই সৃষ্টি করেছেন। কোরআন এ কথা সাক্ষ্য দেয় ঃ

"এবং যেহেতু তিনিই পুরুষ ও নারীকে যুগলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।"[১] (৫৩ ঃ ৪৫)

"এবং তাহার অন্যতম নিদর্শন এই যে তিনি তোমাদিগ হইতেই তোমাদের জন্য সহধর্মিণীসকল সৃষ্টি করিয়াছেন—যেন তোমরা তাহাদিগ হইতে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদিগের মধ্যে **প্রেম ও সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়াছেন, নিশ্চয়ই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।**"[২] (৩০ ঃ ২১)

আমাদের তত্ত্বানুসন্ধানী নবীও বলেছেন ঃ

"আল্লাহ্ প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীবের সঙ্গে উহার বিজেতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তাহার দয়াকে সৃজন করিয়াছেন তাহার ক্রোধকে পরাজিত করিতে।"[১]

কত মূল্যবান তত্ত্ব এখানে মিলছে। 'নারীর লোভ' লিখতে গিয়ে নারী সৃষ্টি রহস্য দেখলাম। নারী সৃষ্টির রহস্য খুঁজতে বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য দেখছি। দেখছি যে জড় চেতন যা কিছু সৃষ্টি আছে কেউই নিঃসঙ্গ নয়। সবারই জোড়া আছে। জোড়া আছে বলেই তাদের মায়া আছে। আর মায়া আছে বলেই তাদের আভ্যন্তরীণ টান আছে। আর টান আছে বলেই এ বিশ্ব টিকে আছে। পদার্থবিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব এর মধ্যে নিহিত। পদার্থ বিজ্ঞান পরিচ্ছেদে ইনশাআল্লাহ এ নিয়ে আলোচনা করব।

দ্বিতীয় বাক্য হতে বোঝা যায় যে প্রতিটি জীবের প্রাণেই দয়া আছে, ক্রোধ ও অভিমান আছে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শুধু নর-নারীই কলঙ্কের সৃষ্টি করে না, জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীও ক্রোধের আগুনে জ্বলে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং প্রাণ বিসর্জন দেয়। এক জাতি শুধু অপর জাতির ওপর নয়—জাতিতে জাতিতেই মারামারি ও হানাহানি দেখা যায়। এক কুকুর অন্য কুকুরের খাওয়া দেখলে ক্রোধে জ্বলে যায়। এক বিড়াল অন্য বিড়ালের আগমনে হিংসায় গোমরাতে থাকে। এক বানর অন্য বানরের শিবিরে ঢুকলে কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এক সিংহ অন্য সিংহের রাজ্যে প্রবেশ করলে অভিমানের তাড়নায় যুদ্ধ ঘোষণা করে। কাক কোকিলের শত্রু, বেজী সাপের শত্রু, বাঘ হরিণের শত্রু, ভেক কেঁচোর শত্রু,

---

টীকা ঃ ১. সূরা নজম–আয়াত ৪৫।

২. সূরা রুম–আয়াত ২১।

টীকা ঃ ১. হাদিস–সংগৃহীত হাদিসের আলো।

www.pathagar.com

কীটপতঙ্গ পক্ষীর শত্রু। ক্রোধের বশেই এ শত্রুতার সৃষ্টি হয়। বিদ্যা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, ধন দিয়ে, মান দিয়ে, প্রেম দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে এ ক্রোধের আগুনকে দমন করা যায় না। অথচ এ ক্রোধকে নিস্তেজ করবার শক্তিও আল্লাহ্‌পাক সৃজন করেছেন সবার অন্তরে দয়া ও মায়ার বেষ্টনী দিয়ে। এই দয়া ও মায়াই ক্রোধকে বশীভূত করে। ক্রোধের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখে। এ থিওরী কোন চিন্তাশীল মনীষীর নয়, কোন কবির দান নয়, কোন জ্ঞানীর বাণী নয়। এ থিওরীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন বৈজ্ঞানিক নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। ক্রোধের ফল কী, কারণ কী এবং ঔষধ কী, এসব তত্ত্বও তিনি নির্ভুল ভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর অসংখ্য বাণীতে। দু'চারটা মাত্র এখানে তুলে ধরছি।

"রাগ করিও না কারণ উহা বিবাদের সৃষ্টি করে।" (হাদিস)

ক্রোধ বিবাদের সৃষ্টি করে। ক্রোধ হিতাহিত জ্ঞানকে নষ্ট করে। ক্রোধ শত্রুতা বৃদ্ধি করে। ক্রোধ বুদ্ধি-বিবেককে ধ্বংস করে। ক্রোধের সৃষ্টি হলেই শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপ শক্তির সৃষ্টি করে (Heat produces energy)। যখন কোন কল-কব্জার অভ্যন্তরে অতিরিক্ত শক্তির সৃষ্টি হয় তখন তা তীব্র গতিতে চলতে থাকে, ফলে অল্প সময়েই ভেঙে চুরমার হয়ে যায় অথবা অকেজো হয়ে পড়ে। ঠিক সে রূপেই মানুষ ও জীবজন্তুর অভ্যন্তরে যখন ক্রোধের সৃষ্টি হয় তখন তার শরীরে রক্ত প্রবল ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। ক্রোধের ফলে যে অতিরিক্ত শক্তি সৃষ্টি হয় তা কার্যে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় আসে না। তাই ক্রোধের সময় মানুষ বা জীবজন্তু লাফালাফি ও ছুটোছুটি করতে থাকে—চোখে আগুন ঝরতে থাকে। মুখের চেহারা বিকৃত হয়। হাত-পা-নাক স্ফীত হয়।

শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (রা) ক্রোধ সম্বন্ধে বলেছেন, "ক্রোধাগ্নি অন্তরে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইলে ইহার ধূম্ররাশি উর্ধ্বগামী হইয়া মস্তিষ্কের কৌটা পূর্ণ করিয়া তোলে। জ্ঞান ও চিন্তার স্থুল অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দেয়। ধূম্রজালে পরিবেষ্টিত হওয়ার ফলে জ্ঞান নিজের দর্শনশক্তি হারাইয়া ফেলে। সত্য ও সঠিক পন্থা দেখিতে পায় না।"[১]

ক্রোধের উৎপত্তি এবং অনিষ্টকারিতার কথা আমরা দেখলাম। এবার দেখব এই জাতশত্রুকে ধ্বংস করবার কি থিওরী রসুলুল্লাহ (দঃ) দিয়েছেন ঃ

'ক্রোধ প্রকাশ করা শয়তানের কাজ এবং শয়তান অগ্নি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, আগুনকে পানি দ্বারা নিভান যায়। অতএব তোমাদের মধ্যে কেহ রাগান্বিত হইলে সে যেন অজু করে।'[১]

সাপের শত্রু লাঠি। যত ভয়ঙ্কর সাপ হোক না কেন, যত ভয়ঙ্কর মূর্তিই ধরুক না কেন সাপের মাথায় লঠির আঘাত পড়লে তার ক্রোধের নিরসন হয়। বিস্তৃত ফণা লাঠির আঘাতে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয় আর অবসন্ন দেহে মাটির বুকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। টাইফয়েডের বিকারগ্রস্ত রোগী, ম্যালেরিয়ায় জরাজীর্ণ দেহ—ক্লোরোমাইসেটিন ও কুইনাইনে যেমন আরোগ্য লাভ করে তেমনি অনল শিখা পানির কাছে পরাজয় বরণ করে। তাই বৈজ্ঞানিক নবী ক্রোধান্ধ ব্যক্তিকে অজুর উপদেশ দিয়েছেন অজু করার অর্থ—যে সমস্ত স্থানে অগ্নিশিখা প্রবাহিত হয়, সে সকল স্থান পানিতে শীতল করা। ফলে অজু করলে এই পানিতে অগ্নিশিখা নির্বাপিত হয়। এ বিষয়ে রসুলের আর একটি বাণী নিম্নরূপ ঃ

"যখন তোমাদের মাধ্যে দাঁড়ান অবস্থায় কেউ ক্রোধ করে তখন সে বসুক। যদি তাতে ক্রোধের অবসান হয় ভাল, নতুবা সে স্থান ত্যাগ করুক।" (হাদিস)

টীকা ঃ ১. কিমিয়ায়ে সা'য়াদত. ১৩৩ পৃষ্ঠা। তর্জমা।

১. আবু দাউদ।

www.pathagar.com

এ বাণীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কি দেখতে পাই সেটা একবার বিশ্লেষণ করা উচিত।

বসে অথবা শুয়ে থাকা অবস্থায় ক্রোধের ফলে শরীরে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় দাঁড়ান বা চলন্ত অবস্থায় তার চাইতে বেশি হয়। কেননা এ অবস্থায় রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। তাই দাঁড়ান অথবা চলন্ত ব্যক্তির ক্রোধকে দমন করার বৈজ্ঞানিক আর একটি পন্থা তিনি নিরূপিত করলেন তাদের বসতে ও স্থান ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়ে।

স্থান ত্যাগ করলে কেন ক্রোধ দমন হয় এর একটা যুক্তি নিশ্চয়ই আছে—যা বৈজ্ঞানিক নবী জানেন। এ সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ দেব জানি না সেটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হবে। সাধারণ জ্ঞানের সীমায় তাই এ বিশ্লেষণ সীমিত করেই লিখছি।

প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ক্রিয়াশীল। রাগের চরম মুহূর্তে তাদের ক্রিয়া আরও বৃদ্ধি পায়। তাই দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি, শরীরিক শক্তি ক্রোধের বস্তুর ওপর কেন্দ্রীভূত হয়। যদি এই ক্রিয়াশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবিধিকে বিকেন্দ্রীভূত করা যায় তাহলে তাদের কার্যক্ষমতা আস্তে আস্তে কমে আসে, ফলে ক্রোধের মাত্রাও কমে যায়। যদি এর চাইতে গভীর তত্ত্বমূলক কোন কারণ জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ভাইরা জানেন তবে যোগ করে দেবেন।

বৈজ্ঞানিক নবী ক্রোধের কুফল শুধু বৈজ্ঞানিক প্রমাণেই দেখান নি, সমাজের স্তরে স্তরে এর প্রতিক্রিয়া কত ভয়ঙ্কর হতে পারে—সেকথাও তাঁর অসংখ্য বাণীতে ব্যক্ত করেছেন। যদি তাঁর বাণীগুলি সব জাতি, শ্রেণী ও দেশ মেনে চলতো তবে বেহশ্‌তের কিছুটা আস্বাদ এখানেই সবাই ভোগ করতে পারত। আর কয়েকটি অতি মূল্যবান তাঁর বাণী সংগ্রহ করে দেখি ক্রোধ দমনের সুফল কেমন।

"প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে পরলোকে আল্লাহ্ তাকে সকলের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে বলবেন—হুরদিগের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তুমি গ্রহণ করতে পার।" (তিরমিজি)

"যাহারা ক্রুদ্ধ হইলে ধৈর্যধারণ করে এবং অন্যায়ের পর ক্ষমা করে আল্লাহ্ তাহাদের দোষ গোপন করেন। তাহাদের শত্রুদিগকে দমন করেন এবং তাহাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হন।" (মিশকাত)

উপর্যুক্ত মহাবাণী কয়টি সমাজবিজ্ঞানের জন্য কেন অপরিহার্য এ কথাই আমরা আলোচনা করছি।

জ্ঞান, কৌশল, বুদ্ধি ও শারীরিক বল থাকলে শত্রুকে পরাজিত করা যায় কিন্তু এসব গুণের অধিকারী হলেও ক্রোধকে দমন করা যায় না। অথচ এ ক্রোধকে দমন করতে না পারলে সমাজকে সুস্থ ও সবল করা যায় না। কেননা ক্রোধের সময় বিচার চলে না, ক্রোধে মুখে হাসি ফোটান যায় না, ক্রোধে মিলনের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় না, ক্রোধে আর্থিক সঙ্কোচ দূর হয় না, ক্রোধে পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য হয় না। এক কথায় বলতে হয় ক্রোধই সর্বনাশের মূল। ক্রোধ সমাজকে যেমন ধ্বংস করে, পরকালের পথ তেমনি চিররুদ্ধ করে দেয়। ক্রোধকে সংবরণ করবার একমাত্র পথ আত্মসংযম, ধৈর্য ও ক্ষমা। নিজের সহায়সম্বল বল-ভরসা, বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-মান থাকা সত্ত্বেও যারা ধৈর্য ও ঈমানের বলে ক্রোধকে দমন করে তারাই উৎকৃষ্ট। তারাই সমাজের বন্ধু, জ্ঞানী ও মানী, বরণীয় ও আদরণীয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র এবং আল্লাহর মিত্র। রসুল (দঃ)-ও এ কথাই বলেছেনঃ

"ধৈর্যশীল ব্যক্তিই ইহকাল ও পরকালের নেতা।" (বুখারী)

"সহিষ্ণুতাই সন্তুষ্টির চাবি।" (সগির)

"যদি মানুষের ধৈর্য থাকে তবে অবশ্য সৌভাগ্যশীল হয়।" (সগির)

"শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংযম।" (সগির)

www.pathagar.com

ক্রোধের পরিণতি হতে যদি কোন মানুষকে মুক্ত করা যায়, ক্রোধের কলুষ-কালিমা ও অপবিত্র পরিবেশ থেকে যদি সমাজকে দূরে রাখা যায়, তাহলে সেখানে শান্তির নীড় গঠন করা সম্ভব। যে ক্রোধের ফলে মানুষ পাগল হয়, যে ক্রোধের ফলে সমাজ ধ্বংস হয়, যে ক্রোধে একটা জাতি নির্মূল হয়ে যায়, সেই ক্রোধের অমোঘ ওষুধ দিলেন হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-যে ওষুধ অমৃতের ন্যায় শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হয়ে স্ফীত হয়ে উঠল ধমনী। এনে দিলেন অনাবিল, প্রেমপ্রীতি ভালবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য, আনন্দ ও শান্তি। কোন্ অমৃতের সুরা তিনি পান করিয়ে দিলেন? কোন্ ফরমূলায় যোজন করালেন তাঁর Universal Theory? চলুন, আমরা দেখি ও আমাদের Laboratory—তে ঐ থিওরী ধরে শক্তিশালী ওষুধ তৈরি করতে মনোনিবেশ করি।

"আল্লাহ্‌তায়ালা সৃষ্টি সমাপণ করিয়া আরশের উপর তাহার নিকটবর্তী পুস্তকে লিখিলেন, **'আমার দয়া আমার ক্রোধকে পরাজিত করে।"**[১]

"সূর্য যেরূপ বরফকে বিগলিত করে, সদ্ব্যবহারও সেইরূপ পাপকে বিগলিত করে।"[২]

"আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহারই মুসলিমের প্রকৃত পরিচয়।"[৩]

ধনের লোভ

ধনের মায়া প্রাণের মায়ার চাইতেও বেশি। একথা হয়তো অনেকেই স্বীকার করবে না–কেননা সবাই জানে যে প্রাণের চাইতে মানুষ অন্য কিছুকেই বড় মনে করে না। আমি এ কথা স্বীকার করলেও বলব যে, প্রত্যক্ষ বিপ্লব ও রক্তারক্তি সংঘটিত হয় তার মূল কারণ এই ধন। ধনের লোভে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। প্রাণের মায়া থাকে না। তাই চুরি-ডাকাতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুন-জখম, অন্যায়-অত্যাচার করতে দ্বিধাবোধ করে না। ধনের লোভে চুরি-ডাকাতি করতে গিয়ে প্রাণ হারায়। যুদ্ধ করতে গিয়ে নৃশংসভাবে জীবন-লীলা সংবরণ করে। ছেলে বাবাকে হত্যা করে, স্ত্রী স্বামীকে চুপি চুপি বিষ পান করায়। প্রতিবেশী এই ধনের লোভেই একে অন্যের গলায় ছুরি দেয়। প্রেম-ভালবাসা, মোহ-মায়া সব এ ধনের কাছেই পরাজিত। ধনের লোভ পরিত্যাগ করতে না পারলে হৃদয়ে সহানুভূতি আসে না। ভালবাসার প্রবৃত্তি জন্মে না, আত্মা প্রসারিত হয় না, বুদ্ধি পরিপক্ক হয় না। তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি আসে না, পরের তরে জীবন উৎসর্গ করার কামনা জাগে না। তাই সমাজ হয়ে পড়ে দুর্বল, পরিবেশ হয় ঘোলাটে, আবহাওয়া হয় অস্বাস্থ্যকর। বৈজ্ঞানিক নবী মানুষের এ ভয়াবহ চরিত্রের কথা জানতেন বলেই বলেছেন ঃ

"ধন ও সম্মানের প্রতি লোভ মানুষের ধর্মীয় ব্যাপারে যেরূপ বিবাদের সৃষ্টি করে দুটি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রকে একটি ছাগলের পালের মধ্যে ছেড়ে দিলেও তদ্রূপ বিবাদের সৃষ্টি করে না।" (তিরমিজি)

টীকা ঃ ১. বুখারী, শায়খান।

২. সগির, হাদিসের আলো।

৩. মিশকাত।

www.pathagar.com

ধন-দৌলতের লোভ তিনি কিভাবে পরিহার করেছেন তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সমগ্র মানবজাতিকে শিক্ষা দিলেন তাঁর নিজ জীবনের পরিচয় দিয়ে, এই বলে–"আল্লাহ্ আমার জন্য মক্কার প্রস্তরগুলিকে স্বর্ণে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু আমি বলিলাম, না প্রভু, বরং আমি একদিন তৃপ্তি সহকারে আহার করিব, অন্যদিন ক্ষুধার্ত থাকিব; যখন ক্ষুধার্ত থাকিব তখন তোমার নিকট প্রার্থনা করিব এবং তোমার আরাধনা করিব এবং যখন আহার করিব তখন তোমার প্রশংসা ও শোকর করিব।" (তিরমিজি)

এছাড়া ধনের লোভ হতে পরিত্রাণ পাবার যে সব পন্থা তিনি নির্দেশ করলেন তার মধ্য হতে সামান্য কয়েকটি বাণী উল্লেখ করলাম।

'ধন সম্পত্তির প্রাচুর্যই মানুষকে ধনী করে না বরং হৃদয়ের প্রফুল্লতাই মানুষকে প্রকৃত ধনী করে।" (তিরমিজি)

"যখন তোমাদের মধ্যে কেহ অপরের সৌন্দর্য ও সম্পত্তি দেখিয়া দুঃখিত হয় তখন যে তাহার চেয়ে দরিদ্র ও অসুন্দর তাহার দিকে সে দৃষ্টিপাত করুক। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, নতুবা তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহগুলিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে।" (শায়খান)

"পার্থিব বিষয়ে সংযম আত্মা ও দেহের সৌরভ বিস্তার করে এবং পার্থিব বিষয়ে মোহ, দুঃখ ও বিপদ বৃদ্ধি করে।" (তিরমিজি)

"যাহারা অর্থের দাস তাহারা অভিশপ্ত।" (তিরমিজি)

ওপরের কয়েকটি বাণী অত্যন্ত মূল্যবান ও বিশ্লেষণযোগ্য। এ বাণী সাধারণ বাণী নয়। এর মধ্যে রয়েছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এর মধ্যে রয়েছে সমাজ তত্ত্ব। এর মধ্যে রয়েছে ধনতত্ত্বের মূল থিওরী। ধন থাকলেই মানুষ সুখী হয় না। সুখ সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। এ সুখ সবার ভাগ্যে জোটে না। যারা মনের সুখে সুখী নয় তারা ধন ঐশ্বর্যের মধ্যে ডুবে থাকলেও সুখ পায় না। ধনকে রক্ষা করতেই ধনীর সুখ চলে যায়। নিদ্রার হয় ব্যাঘাত। প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহ। আত্মীয়-স্বজন হয় বৈরী। চোর-ডাকাতের হয় শত্রু। আত্মা হয় দুর্বল। মন হয় কলুষিত। হৃদয় হয় সংকীর্ণ। তাই সর্বদাই তারা থাকে শংকিত ও সজাগ। ফলে তাদের স্নায়বিক দুর্বলতা আসে। অত্যধিক চিন্তায় মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হয়ে যায়। আস্তে আস্তে বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রক্তচাপ তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। দাম্পত্য জীবন হয় বিষাক্ত। তাই ধনীদের ছেলেমেয়েরা হয় উচ্ছৃঙ্খল ও দুশ্চরিত্রবান। ব্যভিচার হয় এদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অর্থই হয় তাদের যত অনর্থের মূল। অর্থের কারণেই তারা হয় অভিশপ্ত।

বৈজ্ঞানিক নবী এ ধরনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার সুন্দর পন্থাও এই কয়েকটি মাত্র বাণীর মধ্যেই নির্দেশ করেছেন। ধন নেই বলে যারা অনুতপ্ত ও দুঃখিত তাদের তাকাতে বলেছেন দরিদ্রের প্রতি। সৌন্দর্য নেই বলে যারা নিজেকে অভিশপ্ত বলে মনে করে তাদের লক্ষ্য করতে বলেছেন তাদের প্রতি যারা অসুন্দর। প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে এমন সুন্দর অমোঘ থিওরী কোন বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরীতে বসে প্রমান করতে পারবে? পায়ে জুতো নেই বলে যে ছেলে তার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় সে ছেলে যদি কোন খোঁড়া, ল্যাংড়া বা পা-বিহীন লোককে রাস্তায় বসে ভিক্ষা করতে দেখে তবে তার কি জুতো-মোজা পরবার সখ থাকবে? গোগলস্-এর অভাবে আভিজাত্য টিকিয়ে রাখা যায় না বলে যে ছেলে মায়ের গয়না চুরি করে সে ছেলে যদি কোন অন্ধকে নর্দমায় পড়তে দেখে তবে চোখে গোগলস্ পরার সখ কি আর তার থাকবে? আফ্রিকার নিগ্রোকে দেখে কোন বাঙালীর কি মনে ক্ষোভ থাকবে যে সে কাল? নাইলনের শাড়ি পরে যে স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে সে স্ত্রী যদি ছিন্নবস্ত্র পরিহিতা কোন প্রতিবেশীকে দেখে তবে তার কি টেরিলিনের সাধ থাকবে?

ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য ও পার্থিব বিষয়ের সম্পদকে পরাস্ত করতে পারে একমাত্র সংযম। যারা আত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করে এ সংযম অর্জন করে তারাই প্রকৃত ধনী। কেননা অপরের ঐশ্বর্যে তাদের মনে কোন হিংসা বা ক্ষোভ থাকে না। আত্মা হয় তাদের প্রশস্থ। দয়ায় হৃদয়

www.pathagar.com

হয় ভরপুর। এছাড়া ধন তাদের দাস করে প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার সুযোগ দেয় না। তাই ব্যভিচার, লুণ্ঠন, অত্যাচার, চুরি-ডাকাতি করবার সুযোগ পায় না। ফলে তারা হয় নির্ভীক, চরিত্রবান, বিশ্বাসী, ধর্মপরায়ণ। দেহকে অক্ষত রাখে, মনকে প্রফুল্ল রাখে, হৃদয়কে করে স্বচ্ছ এবং আত্মাকে করে নির্মল। তাই দুশ্চিনতায় স্নায়ুকে দুর্বল করে না, রক্তচাপে কষ্ট পায় না। চর্মরোগে আক্রান্ত হয় না, গণোরিয়া ও সিফিলিস তাদের দেখে পালায়। তাই তারা হয় বলিষ্ঠ, সুন্দর ও সবল দেহধারী। এ বাণীর মধ্যে কোন ভুল নেই। এ বাণী কষ্টি-পাথরে যাচাই করা–প্রমাণের ভিত্তিতে রচিত বৈজ্ঞানিক বাণী। এ জন্যই তিনি বলেছেন ঃ

'পার্থিব বিষয়ের সংযম আত্মা ও দেহের সৌরভ বিস্তার করে এবং পার্থিব বিষয়ের মোহ, দুঃখ ও বিপদ বৃদ্ধি করে।"[১]

শেষোক্ত লাইনের বিশ্লেষণ ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

ধনের উপকারিতা

ধন মানুষকে যেমন নিকৃষ্ট হতে নিকৃষ্ট স্তরে পৌঁছে দেয় তেমনি তা সম্মান ও মর্যাদার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করায়। ধন যেমন কুপ্রবৃত্তির সহায়তা করে তেমনি বৃষ্টিধারার ন্যায় সদগুণাবলীও বিকাশ করে। ধন ছাড়া মান বাড়ে না। ধন ছাড়া বিদ্যা উপার্জন হয় না।ধন ছাড়া পেটের অন্ন সংস্থান হয় না। নিঃশ্বাসে যেমন অক্সিজেন দরকার, জীবনের প্রতি পদে পদেই তেমনি টাকা-পয়সা দরকার। আলো, বাতাস, পানি যেমন অপরিহার্য, পরিমিত ধন-সম্পত্তিও তেমন বাঞ্ছনীয়। সৎকাজ করতে গেলে, ক্ষুধার কঠোর জ্বালা মেটাতে হলে, দাম্পত্য জীবনের আরাম আয়েস ভোগ করতে হলে, নিপীড়িত মজলুমের মুখে হাসি ফোটাতে হলে, সন্তানকে সুসন্তান রূপে গড়ে তুলবার ব্যবস্থা করতে গেলে দরকার এই ধন। ধনের অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, ধনের অভাবে মানুষ চোর-ডাকাত হয়, ধনের অভাবে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়, ধনের অভাবে আত্মীয়তা ভঙ্গ হয়, ধনের অভাবে স্ত্রী-পুত্র শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ধনের অভাবে বনে গিয়ে নিজের গলায় ফাঁসি লাগায়। ধনের বিষ সাপের তুল্য। এ বিষে যেমন থাকে জীবন নাশের ক্রিয়া, তেমনি থাকে জীবন দানের মহৌষধ। যারা এ মহৌষধ পান করে তারা হয় অমর, অক্ষয়। আর যারা এর বিষ পান করে তারা এ বিষের অসহ্য দহনে হয়ে যায় উন্মাদ, কুখ্যাত ও রক্ত পিপাসু।

কারুণের ধন, ফেরাউনের ধন ও নমরুদের ধন যেমন নাগিণীর ফণা তুলে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল, অত্যাচার অবিচার ও শোষণের সীমা লঙ্ঘন করেছিল–তেমনি ওসমান, আবুবকর ও ওমরের ধন দয়া ও মায়ার জাল বিস্তার করে মানবের অন্তরে এক সঞ্জীবনী শক্তি এনে দিয়েছিল।

ধন ইহকাল ও পরকালের সম্পদ। যার ধন নেই সে ইহকালেও যেমন গরিব, পরকালেও তেমনি গরিব। ইহকালের মান-মর্যাদা তার যেমন সীমাবদ্ধ, পরকালের মান-মর্যাদাও তেমনি নগণ্য। আমার এ কথাটার প্রতিবাদ হয়তো অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিই করবেন জানি, তাই রসুলুল্লাহর বাণী ধরেই কিছু আলোচনা করে কথাটার বিশ্লেষণ করতে চাই।

তিনি বলেছেন–"সমস্ত পার্থিব দ্রব্যের স্থায়িত্ব চারি ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। যথা ঃ (১) শিক্ষিত সংযমী। (২) ধনী দাতা। (৩) ধৈর্যশীল ফকির। (৪) ন্যায় বিচারক।" [১]

(হাদিসের আলো, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।)

"হালাল ধন উত্তম বস্তু।" [২] (কিমিয়ায়ে সা'য়াদত)।

"যে ব্যক্তি ভিক্ষা হইতে বাঁচিতে এবং আপন পরিজনকে ভরণ-পোষণ করিতে এবং প্রতিবেশীকে সাহায্য করিতে এই পৃথিবী ও ইহার সম্পদের প্রত্যাশা করে **সে নিশ্চয় চতুর্দশ রজনীর পূর্ণ চন্দ্রের মত উজ্জ্বল বদনসহ খোদার নিকট উপস্থিত হইবে।** যে ব্যক্তি শুধু

টীকা ঃ ১ . হাদিস – সংগৃহীত হাদিসের আলো–আজহারউদ্দিন, এম. এ।

www.pathagar.com

সঞ্চয় ও আড়ম্বর করিবার উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীর ধন-সম্পদের প্রত্যাশা করে সে এমন সময়ে খোদার নিকট উপস্থিত হইবে যখন তিনি ক্রোধান্বিত থাকিবেন।"৩ (হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)।

ওপরে উল্লিখিত কয়েকটি বাণী হতে দেখা যায় যে, পার্থিব জগতের সুখ-শান্তির জন্য যেমন ধন প্রয়োজন, পরকালের অনন্ত সুখের জন্যও ধন তেমনি প্রয়োজন। কেননা নিজের অভাব মোচনের জন্য, দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য, মানব সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এই পার্থিব জগতে ধনের প্রয়োজন অনেক বেশি। রাস্তা-ঘাট সংস্কার, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, বীমা, পানি সরবরাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা, যা দৈনন্দিন জীবনের জন্য অপরিহার্য তার একটাও ধন ছাড়া চলে না। অথচ এগুলির মাধ্যমেই হয় সৃষ্ট জীবের সেবা বৃহত্তর মানবসেবা ও অদৃশ্য পরমাত্মার সেবা। এই সেবাই আল্লাহর কাম্য। যারা এ সেবাতে নিয়োজিত তারাই ভাগ্যবান ও পুণ্যবান। ধন ছাড়া আর কোন বস্তুর মাধ্যমেই এ সেবা চলে না। তাই এদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় ধনী দাতারাই সর্বোৎকৃষ্ট। কেননা তারা ইহকাল ও পরকালের পাথেয় এ ধনের মাধ্যমেই অর্জন করে।

পেটে ক্ষিদে থাকলে সৎ চিন্তা আসে না। পকেটে পয়সা না থাকলে মাথায় বুদ্ধি আসে না। গোলা শূন্য থাকলে অতিথি সেবা হয় না। রাজকোষ ভর্তি না থাকলে পরিকল্পনা আসে না। সিন্দুকে টাকা না থাকলে মুখে হাসি ফোটে না। অভাবের তাড়নায় মানুষ নির্লজ্জ হয়। ভিক্ষুক হয়ে পথে বের হয়। রাতের অন্ধকারে পরের ঘরে সিঁদ দিয়ে আভিজাত্যকে নষ্ট করে। যাদের ধন আছে তারা ধনের বিনিময়েই নিজের ঐশ্বর্যকে বৃদ্ধি করেও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। রসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বাণীর মাধ্যমে তা পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠেছে। তাঁর দৈনন্দিন প্রার্থনার মাঝেও এ কথা দেখা যায়।

"হে আমার আল্লাহ্! যে বিদ্যা ভাল, যে কার্য তোমার প্রিয়, **যে ধন সৎভাবে অর্জন করা যায়,** যে স্বাস্থ্য ধার্মিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ও শিষ্টাচার যাহা আমাদের ভাগ্যে নির্ধারিত আছে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিবার শক্তি আমাদিগকে দান কর; **আমাদের আন্তরিক ভাবকে বাহ্যিক ভাবের চেয়ে সুন্দর কর** এবং বাহ্যিক ভাবকে নির্মল কর। আমাদের সাধ্বী স্ত্রী, নির্দোষ ধন এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হয় না বা পথভ্রষ্ট করে না এরূপ সুসন্তান দান কর।"

(তিরমিজি, হাদিসের আলো)

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর উপর্যুক্ত প্রার্থনা হতে বোঝা যায় যে তিনি কত বড় একজন সাধক ছিলেন। সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য এ বাণী বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। স্বাস্থ্য, ধন, ধার্মিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ও শিষ্টাচার এসব গুণগুলি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার জন্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটির অভাব থাকলেও কোন মানুষ তার পূর্ণাঙ্গ জীবন দাবী করতে পারে না। কেননা একজনের হয়তো অটুট স্বাস্থ্য ও অগাধ ধন ছিল। স্বাস্থ্য ও ধনের অহমিকায় তারা তাদের সৃষ্টিকর্তাকে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। ধর্ম ছিল তাদের কাছে অবাস্তব। ন্যায়পরায়ণতা ছিল অজানা আর শিষ্টাচার ছিল কটূক্তি ও অত্যাচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ তাদের শিকারে পরিণত হতো। নারীরা ভোগের সামগ্রী হতো। বৃদ্ধেরা জঞ্জাল ও চক্ষুশূল হতো। সমাজ, দেশ ও জাতি হতো বিভীষিকার লীলাক্ষেত্র।

"আন্তরিক ভাবকে বাহ্যিক ভাবের চাইতে সুন্দর কর"–

রসুলুল্লা (দঃ)-এর প্রার্থনা ছিল মানবজাতির বৃহত্তর মঙ্গলের নিমিত্ত এক অমৃত সুধা। অন্তরকে পবিত্র, স্বচ্ছ ও সুন্দর করার অর্থই হলো মানুষকে নির্মল ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী করবার একমাত্র পন্থা। যাদের অন্তর স্বচ্ছ নয় তারাই হয় বকধার্মিক। তাদের মধ্যে দেখা যায় কপটতা। মানুষকে প্রবঞ্চনা করার নিমিত্ত এই বক-ধার্মিক ব্যক্তিরা বাইরে অত্যন্ত সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আবরণ দেখায়। পোশাক-পরিচ্ছদে নিজেকে এমনভাবে সুসজ্জিত করে যেন মানুষ তার হীন প্রবৃত্তির কথা বুঝতে না পারে। অন্তরের দুরভিসন্ধি বাহ্যিক আবরণের কাছে

www.pathagar.com

চাপা পড়ে। এ শ্রেণীর লোক সমাজের জন্য বিপজ্জনক। চোখের ওপর আবরণ দিয়ে ম্যাজিসিয়ানরা যেমন দর্শকবৃন্দকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী তার খেলা দেখাতে থাকে এবং পকেট শূন্য করে নেয়, তেমনি এই বকধার্মিক ও কপট ব্যক্তিরা তাদের বিকৃত রুচি চরিতার্থ করে দুর্বল ব্যক্তির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এরূপ চরিত্রের ব্যক্তিরা নিজেদের আত্মার পরিচয় জানে না, সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করে না, সমাজকে সুস্থ ও সবল করে না, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের কোন উপকারে আসে না। বিষাক্ত সাপের চাইতেও এই কপট ব্যক্তিরা ভয়ঙ্কর। সাপ তার রাগের নিমিত্ত ছোবল দেয়। ছোবল দেবার পর কি সর্বনাশ ঘটবে একথা তারা বোঝে না এবং এ বিচার করবার বুদ্ধিও তাদের নেই। এছাড়া এ ছোবলের পেছনে তাদের কোন স্বার্থও নিহিত থাকে না। প্রবৃত্তি বশে এবং জাতস্বভাবের তাড়নাতেই তারা এ কুকর্ম করে থাকে। কিন্তু এই কপট ব্যক্তিরা জানে এবং বুঝতে পারে যে তাদের সর্বনাশা ছোবলে একটা নিরীহ মানুষ তার মান-সম্ভ্রম এবং ধন-দৌলত বিকিয়ে দিতে বাধ্য হবে। সত্যিকার হয়ও ঠিক তাই। সমাজে একটি দু'টি নয় অসংখ্য সাধু নামধারী ব্যক্তিকে তিলক কেটে অথবা আলখাল্লায় বিভূষিত হয়ে ভগবান ও আল্লাহ্ নামের ওপর তসবিহ টিপতে দেখা যায়। সাধারণ মানুষ যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত তারা স্বভাবতই এদের দেখে মহাপুরুষ মনে করে ভক্তি বিজড়িত কণ্ঠেই নিজেদের অভাবের কথা বলে থাকে। এই বকধার্মিক সাধু ব্যক্তিরা এ সুযোগেরই প্রত্যাশা করে। যখন তারা বুঝতে পারে যে শিকার হাতের মুঠোর মধ্যে তখন ম্যাজিসিয়ানদের মতই তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে রাতারাতি গায়েব হয়ে যায়। অনেক রাজনীতিবিদ সাধারণ মানুষের মন জয় করতে তাদের মনের কথা এমনিভাবে পেশ করতে থাকে যে তারাই যেন ত্রাণকর্তা। ব্যবহারিক পোশাক বাক্সে তালাবদ্ধ করে নেহায়েত কম দামের একটা পাঞ্জাবী অথবা ধুতি চাদর পরে বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করে। সবার কাছে এটাই প্রতীয়মান হয় যে এমন সরল ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আর কোনদিন মানুষের খেদমতে আসে নি। তার চাল-চলন, কথাবার্তার ভঙ্গি দেখলে স্বভাবতই মানুষের মনে সহানুভূতি ও ভক্তির উদ্রেক হয়। কার্যসিদ্ধি হবার পরে দেখা যায় যে তারা আর সে মানুষ নেই। হৃদয় এবার কঠোর। চোখে অশ্রুর পরিবর্তে আগুন ঝরে। মধুর বাক্যের পরিবর্তে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে। প্লাটফরমে সহানুভূতি কুড়োবার পরিবর্তে দশতলার ওপর বসে মানুষ মারার টাকা বাজেট করে। পায়ে হেঁটে পল্লীর অস্বাস্থ্যকর অলিতে-গলিতে ঘোরার অবমাননার চাইতে সুইজারল্যান্ডের স্বপ্নপুরীতে স্বাস্থ্যনিবাস করবার সরকারী অনুমোদন লাভ করে। কি করে না? ধর্মের নামে, জাতির নামে মিথ্যা রটনা দিয়ে সরলপ্রাণ মানুষের হৃদয় কেড়ে নেয়। কলুষিত অন্তঃকরণের এই বাহ্যিক আড়ম্বরের ভয়াবহতা দেখে প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর অন্তরের ভাবকে বাহ্যিক ভাবের চাইতে সুন্দর করতে। ওহঃ! কে আছে সমাজকে এমনিভাবে শিক্ষা দেয়? কার ভেতরের ও বাইরের মহান শিক্ষা একটা অধঃপতিত জাতিকে এই কপট শ্রেণীর হাত থেকে মুক্ত করে? কার অশ্রুর প্লাবনে সমাজের অভ্যন্তর হতে পচা দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা সাগরের অতল সলিলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়?

পাক কোরআনে বকধার্মিক, সাধুসন্ন্যাসী ও আলেমদের কথা অনেক স্থানে বলা হয়েছে। যেমন–"হে ঈমানদারগণ। আলেমদের ও সন্ন্যাসীদের অনেকে লোকের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং আল্লাহ্ পথ হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া রাখে।"[১] (৯ ঃ ৩৪)

সাধ্বী স্ত্রী মনের কি খোরাক জাগায়, সমাজের কি উপকারে আসে, কেন আমাদের নবী সাধ্বী স্ত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে হাত তুলে মোনাজাত করেছিলেন – এসব তত্ত্ব ইনশাআল্লাহ্ যৌনবিজ্ঞান পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। সুসন্তান নিজের জন্য, জাতির জন্য এবং আল্লাহর জন্য কেন প্রয়োজন? এ কথা প্রতিটি মানুষই জানে। নিজের ছেলে চোর হলে কি হবে,

---

টীকা ঃ ১. কোরআন ঃ সূরা তওবা। আয়াত ৩৪।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানী হলে কি হবে এবং ধর্মপ্রাণ মনীষী হয়ে দেশ, জাতি ও নিজ আত্মার ওপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এটা শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রতিটি মানুষই বুঝতে সক্ষম। তাই এর ওপর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এ ছাড়া 'জ্ঞানের লোভ' পরিচ্ছেদে জ্ঞানীর মাহাত্ম্য বোঝানোর চেষ্টা করে সামান্য কিছু লিখেছি।

সুসন্তান বংশের গৌরব, জাতির গৌরব, সমগ্র মানব জাতির গৌরব। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পারদর্শী, সুশিক্ষার আলোকে আলোকিত, ধর্মীয় শিক্ষায় সুপণ্ডিত, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিধি-নিষেধ মান্যকারী ব্যক্তিকেই সুসন্তান বলা হয়। রসুল সমগ্র মানবজাতিকেই নিজের সন্তান বলে মনে করতেন। এই মানব সন্তানকে সুসন্তানরূপে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর অদম্য কামনা। তাই প্রার্থনা করতেন একান্ত হৃদয় দিয়েই–আবেগ ও অশ্রুর বন্যায় বুক ভাসিয়েই।

জ্ঞানের লোভ

কে না জানে চোদ্দ শ' বছর পূর্বে আরবের কি অবস্থা ছিল। শুধু মরুর বালিই যে আরবকে মরুশ্মশানে পরিণত করেছিল তা নয়। আরব অধিবাসীদের মন ছিল শ্মশান আর হৃদয় ছিল পাষাণ। পিতা-পুত্রে গরমিল, ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি, স্বামী-স্ত্রীতে মন কষা-কষি, আত্মীয়ে আত্মীয়ে হানাহানি আর ভেতরে-বাইরে খুনো-খুনি। চুরি, ডাকাতি, অত্যাচার, অবিচার, ষণ্ডামী, গুণ্ডামী ও ভণ্ডামী ছিল তাদের পেশা। ছিল না তাদের নৈতিক চরিত্র, ছিল না গঠনমূলক চিন্তাধারা, ছিল না প্রেম, স্নেহ ও মায়া। হিংস্র পশুর চাইতেও ছিল তারা হিংস্র। এই অধঃপতিত জাতির কানে নতুন মন্ত্র দিয়ে, চিন্তাধারায় নতুন থিওরী দিয়ে যিনি সমাজকে মুক্তির পথ দেখালেন তিনিই হলেন উম্মি বৈজ্ঞানিক হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। চোখে তাঁর আলোকদীপ্তি, বক্ষে তাঁর নতুন আশা আর কণ্ঠে মধুর ভাষা। তিনি তাঁর অণু-পরমাণু দিয়ে উপলব্ধি করলেন এ হিংস্র, অবাধ্য ও মূঢ় মানবসমাজকে সুসন্তানরূপে গড়ে তুলতে হলে দরকার জ্ঞানের আলোক-মশাল।

জ্ঞানীর জ্ঞানসাধনার কথা চিন্তা করতেই মনে একটু হিংসার ভাব জাগল। কেননা জ্ঞানীরা আদরণীয়, বরণীয় ও অমর। জ্ঞানের আলোক পরশে তাঁদের হৃদয় হয় আলোকিত। আলোর স্বভাব দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়া। আলোকে বন্ধ করে রাখা যায় না। যারা বন্ধ করে রাখতে চায় তারাও এই আলোর প্রভাবে আলোকিত হয়। একটু ছিদ্র পেলে আলোকরশ্মি সোজা পথ ধরে এক সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে যায়। জ্ঞানীর হৃদয়-অভ্যন্তরে থাকে এক আলোকবর্তিকা। এই আলোকবর্তিকাই তার চোখে-মুখে, অস্ত্রে তন্ত্রে প্রবেশ করে তার রূপ বিকাশ করে। তাই তারা হয় উজ্জ্বল, স্বচ্ছ ও মনোরম তাদের এই অস্বাভাবিক আকর্ষণী ক্ষমতায় বিশ্ব-ভুবন হয় আকৃষ্ট।

আর ধনীরা? ধনের লালসায় তাদের হৃদয় হয় কলুষিত, পাষান ও অন্ধকার। শত জোনাকীর আলো এ গভীর অন্ধকারের কাছে হয় পরাজিত। এ অন্ধকার অতল সাগরের অন্ধকারের মতই ভীষণ। যারা এ অন্ধকারে পড়ে, তারা চোখ থেকেও হয় অন্ধ। তাই শত চেষ্টা করেও আর পথের সন্ধান পায় না।

এবার বৈজ্ঞানিক নবীর রচিত জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখে নিই। আল্লাহর পরিচয় দিতে, সরল সুপথ দেখাতে ও অন্ধকারের পথ আলোকিত করতেই এলেন আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। হাতে তাঁর আলোর মশাল, চোখে তাঁর আলোকদীপ্তি আর বক্ষে তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার। কার হাতে তুলে দেবেন এ আলোক মশাল? কার চোখে দেবেন অপরূপ দৃষ্টি? আর কার বুকে দেবেন জ্ঞানের ভাণ্ডার? ধনীর হাতে? মানীর হাতে না সম্ভ্রান্ত কৌলিন্যের হাতে? জ্ঞান-সাগরের মহান অধিপতি দেখলেন জ্ঞানীই কেবল এ জ্ঞানের ভূষণ পড়বার

www.pathagar.com

অধিকারী। তাই আহ্বান জানালেন প্রানের আবেগে ঃ

"শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ব্যতীত কেউই আমার আপন নয়।"[১] (সগির)

জ্ঞানীর মর্যাদা ও ওজন কতটুকু পরিমাপ করে তিনি বললেন, "নক্ষত্রগুলির উপর পূর্ণচন্দ্রের যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব, সমস্ত উপাসকমণ্ডলীর উপর জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্বও তদ্রূপ।"[২]

"জ্ঞানী যিনি জ্ঞানের চর্চা করেন তিনি ব্যতীত সমস্ত লোকই মৃত।"[৩]

"শহীদের রক্ত অপেক্ষা জ্ঞানীর মসি আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয়। কারণ জ্ঞানী খোদার নিকট হইতে পথপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা খোদার অনেক বান্দা পরিচালিত হইয়াছে কিন্তু শহীদ শুধু নিজের আত্মার মুক্তিলাভ করিয়াছে।"[৪]

"পৃথিবীতে জ্ঞানীদের তুলনা নক্ষত্রসদৃশ। তাঁহারা জল ও স্থলের অন্ধকারের মধ্যে পথ প্রদর্শন করে অনন্তর যখন তাঁহারা অদৃশ্য হন তখন সহজেই পথভ্রষ্টের আশঙ্কা হয়।"[৫]

"ন্যায়বিচারক ও জ্ঞানী সম্মানিত আসন পাইবার উপযুক্ত।"[৬] (সগির)

"জ্ঞানীদিগকে অনুসরণ কর কারণ তাঁহারা ইহকালের প্রদীপ ও পরকালের আলোক বর্তিকা।"[৭] (সগির)

"জ্ঞানী, ধর্মশাস্ত্রবিদ ও দার্শনিকগণ তত্ত্বাবধায়কতুল্য।"[৮] (সগির)

"মানুষের মধ্যে জ্ঞানীগণ ও ধর্মযোদ্ধাগণই নবীদের নিকটবর্তী পদমর্যাদাসম্পন্ন।"[৯] (মিশকাত)

"জ্ঞানীর নিদ্রা অশিক্ষিত ব্যক্তির ইবাদতের চেয়ে উত্তম। কারণ জ্ঞান ব্যতীত ইবাদত বিক্ষিপ্ত ধুলিরাশির মত এবং সংযম ব্যতীত জ্ঞান ঝড়ের দিনে ব্যাতাহত ভস্মের মত।"[১০] (হাদিসের আলো)

"যিনি মৃত্যুকালে কালি-কলম পরিত্যাগ করিয়া যান অর্থাৎ জ্ঞান আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করেন বেহেশ্‌তের দ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত।"[১১]

এরূপ অসংখ্য বাণীর মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (দঃ) জ্ঞানীর মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। দেশের জন্য অকাতরে যে প্রাণ বিসর্জন দেয়, ধর্মের নামে যারা হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, মানবতার শ্রেষ্ঠ মাপ-কাঠিতেই তাদের পরিমাপ করা হয় ও শীর্ষপ্রান্তে তাদের মর্যাদা দেওয়া হয়। তারাই শহীদ নামে আখ্যায়িত। নবীদের একধাপ নিচেই শহীদের স্থান বলে আমরা জানি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক নবী বললেন যে, এমন পুণ্যাত্মা শহীদের চাইতেও জ্ঞানীরা আল্লাহর নিকট প্রিয়। জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, পণ্ডিত-দার্শনিক ও কবি ব্যক্তিরাই আল্লাহর মহত্ত্ব প্রকাশ করে। তাদের জ্ঞানচর্চা শুধু নিজেদের জন্য নয়, সমগ্র সৃষ্টির জন্যই। সমগ্র সৃষ্টি যে জ্ঞানে উপকৃত হয়, সে জ্ঞান মূলত আল্লাহর জন্যই। শহীদ ব্যক্তিরা যে পুণ্য অর্জন করে সেটা তার ব্যক্তিগত। তাই জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা আল্লাহর কাছে এত প্রিয়।

জ্ঞানের চর্চা করতেন বলেই হজরত মুহাম্মদ (দঃ) মহাজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। তাই জানতেন যে, ধন সম্পদ ও যশ-মানের অনেক উর্ধ্বে জ্ঞানের স্থান। ধন সম্পদ ও যশ-মান টিকে থাকে না। জ্ঞান অনন্ত এবং অক্ষয়। জ্ঞানী ব্যক্তি অমর। তারা মরে না। সর্ব যুগের সর্বকাল তাদের ধরে রাখে। কিন্তু ধনাঢ্য ও মান্য ব্যক্তিরা তাদের যশখ্যাতি যুগ যুগ ধরে টিকিয়ে রাখতে পারে না। তাদের জীবনেই সেটার পরিসমাপ্তি হয়। শুধু তাই নয়, অনেক ধনী ব্যক্তিকে দেখা যায় যে ধনের বিনিময়ে যে মান-সম্ভ্রম তারা অর্জন করে তা অল্প দিনেই বিলীন হয়ে যায় এবং পথের ধুলি সম্বল করতে বাধ্য হয়। মান-সম্মান বিক্ষিপ্ত ধুলির মত শূন্য মার্গে চলে যায়। জ্ঞানী তার জ্ঞান বিকাশ করে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পথ নির্দেশ করে এবং সৃষ্টি জীবকে সুস্থ ও সবল করে তোলে। জ্ঞান কেউ কেড়ে নিতে পারে না, চুরি করতে পারে না, আগুনে পোড়ে না, পানিতে ডোবে না। ধনের মত জ্ঞান খরচ করলে কমে না বরং বহুগুণে বিস্তৃতি লাভ করে। জ্ঞানপরশে আত্মা আলোকিত হয়, মন সবল হয়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়, চিন্তাধারা ব্যাপক হয়, সত্যের পথ সুন্দর ও স্বচ্ছ হয়, মিথ্যার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-

www.pathagar.com

মন্দ, সুন্দর-অসুন্দরের মধ্যে পার্থক্য করবার ক্ষমতা আসে। জ্ঞানের নিজস্ব একটা শক্তি আছে, যে শক্তিবলে মানুষ দুর্গম পথ পাড়ি দেয়। অজানা-অচেনাকে নিকটে আনে, শক্রকে ভূপাতিত করে, আকাশে-বাতাসে, সাগরে-ভূতলে তার আধিপত্য বিস্তার করে। তাই বৈজ্ঞানিক নবী জ্ঞান অর্জনের জন্য কঠোর সাধনায় ব্রতী হতে উপদেশ দিয়েছেন এবং অনুপ্রাণিত করেছেন তার অসংখ্য বাণীতে। নিম্নে তাঁর মূল্যবান কয়েকটি বাণী উল্লেখ করছি।

"জ্ঞানার্জন কর কারণ যে ব্যক্তি খোদার পথে জ্ঞান আহরণ করে সে পুণ্য কাজ করে। যে সে বিষয়ে আলোচনা করে সে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং যে তাহা অন্বেষণ করে সে খোদার ইবাদত করে এবং যে তাহা শিক্ষা দেয় সে সাদকা দেয় এবং যে তাহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করে সে খোদার ইবাদত করে। জ্ঞান দ্বারা মানুষ কল্যাণ ও মহত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে এবং ইহজগতে নৃপতিগণের সাহচর্য এবং পরলোকে পরিপূর্ণতা লাভ করে। জ্ঞান অর্জন কর। ইহার অধিকারীকে ইহার অন্যায় হইতে ন্যায়কে পৃথক করিতে সামর্থ্য অর্জন করে। ইহা বেহেশ্তের পথ আলোকিত করে–মরুভূমিতে ইহা বন্ধুসদৃশ। নির্জনে ইহা আমাদের সঙ্গী, বন্ধুহীন অবস্থায় ইহা আমাদিগকে সুখের পথে পরিচালিত করে এবং দুঃখে ইহা আমাদিগকে জীবিত রাখে। বন্ধুদের মধ্যে আমাদের অলঙ্কার স্বরূপ এবং শক্রদের বিরুদ্ধে ইহা আমাদের বর্ম।"[১২] (হাদিসের আলো, ১ম খণ্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা)

জ্ঞানের পথে এমন সুন্দর উপদেশ, এমন আকর্ষণকারী বাণী, এমন মহাত্মাপূর্ণ থিওরী কোন্ সমাজবিজ্ঞানী দিয়েছে? জ্ঞান ছাড়া হৃদয় অন্ধকার। জ্ঞান ব্যতীত বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ। কবির কথামালা, দার্শনিকের তত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্রবিদদের উপদেশ ও বৈজ্ঞানিকের নব-আবিষ্কার মানব জীবনে এনে দেয় অপার আনন্দ, অনাবিল শান্তি ও অফুরন্ত প্রেরণা; রসুলুল্লাহ (দঃ) এ কথা জানতেন বলেই ঘোষণা করেছেণ–

"খোদার আরশের নিচে একটি রত্নাগার রহিয়াছে। কবিদের জিহ্বা তাহার চাবি।"[১৩] (হাদিসের আলো, ১ম খণ্ড ৩৮পৃষ্ঠা)

"পরবর্তী বংশধরদের জন্য জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করিয়া স্থায়ী কর।"[১৪] (হাদিসের আলো)

"যে ব্যক্তি চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন শিক্ষিত সমাজে উপবেশন করে না, তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে এবং সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কারণ জ্ঞান হৃদয়ের জীবন ও জ্যেতি। **মৃত্তিকার নিম্নে লৌহ থাকিলে তাহা যেরূপ মরিচা প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান ব্যতীত হৃদয়ও সেইরূপ মরিচা প্রাপ্ত হয়।** জিজ্ঞাসা করা হইল, কি করিলে হৃদয়ের মরিচা দূর হয়? তিনি বলিলেন – জ্ঞানীদের সমাজে উপবেশন।"[১৫] (হাদিসের আলো)

জ্ঞানীদের প্রতি রসুলুল্লাহর উপদেশ বাণী দেখতে গিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় দেখতে পাচ্ছি। কে বলে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) শুধু সমাজ সংস্কার ও ধর্ম সংস্কার করে গেছেন? আমি সূচনাতেই লিখেছি যে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ছিলেন জ্ঞানের শীর্ষে মহাজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিকের শীর্ষে মহাবৈজ্ঞানিক এবং পণ্ডিতের শীর্ষে মহাপণ্ডিত। লৌহ মাটিতে রাখলে কেন মরিচা ধরে এ কথা 'পদার্থ বিজ্ঞান' পরিচ্ছেদে আলোচনা করে দেখাব।

জ্ঞানী ব্যতীত সবাই মৃত। জ্ঞানান্বেষণের জন্য তিনি কত ভাবেই না অনুপ্রানিত করেছেন। জ্ঞান ব্যতীত আল্লাহর উপাসনা চলে না। জ্ঞান ব্যতীত বুদ্ধি-বিবেক বৃদ্ধি হয় না। জ্ঞান ছাড়া ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না। তাই শৈশবের প্রথম স্তর থেকেই তিনি জ্ঞান আহরণ করতে সর্বশ্রেণীর মানবকুলকে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"শৈশবে জ্ঞানার্জন প্রস্তরে খোদিত লিপির তুল্য এবং বার্ধক্যে জ্ঞানার্জন জলের উপর অঙ্কনের তুল্য।"[১৬] (সগির)

"জ্ঞান রত্মাগার এবং প্রশ্ন উহার কুঞ্জিকা।"[১৭] (সগির)

"জ্ঞান মুমেনের বন্ধু, বুদ্ধি উহার সহচর, কার্য উহার পথ-প্রদর্শক, অধ্যবসায় উহার মন্ত্রী এবং সহিষ্ণুতা উহার সেনাপতি, বিনয় উহার সন্তান এবং ভদ্রতা উহার সহোদর।"[১৮] (সগির)

www.pathagar.com

"আল্লাহর উদ্দেশে জ্ঞান আহরণ করা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যজনক।"[১৯] (সগির)

"জ্ঞানান্বেষণ আল্লাহর নিকট নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জেহাদ অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যজনক।"[২০] (সগির)

"জ্ঞান ইসলামের প্রাণ এবং ইসলামের স্তম্ভ। এবং যে ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করে আল্লাহ্ তাহাকে পুরস্কৃত করেন। অতঃপর যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষা করে এবং তদনুসারে কাজ করে সে যাহা জানে না আল্লাহ্ তাহা তাহাকে শিক্ষা দেন।"[২১] (সগির)

"যে শিক্ষার্থী জ্ঞানান্বেষণের নিমিত্ত বিদেশ গমন করে আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্তে উন্নত স্থান নির্দেশ করিবেন এবং তাহার প্রতি পদক্ষেপে যাহা সে স্থাপন করে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়।"[২২] (হাদিসের আলো)

"জ্ঞানীগণ যদি আল্লাহর বন্ধু না হন তবে আল্লাহর কোন বন্ধু নাই।"[২৩] (সগির)

"প্রত্যেক বস্তুলাভের পথ আছে। বেহেশ্ত লাভের পথ জ্ঞানান্বেষণ।"[২৪] (সগির)

"প্রথম জ্ঞান আল্লাহ্কে জানা এবং শেষ জ্ঞান তাহার প্রতি সর্ব-বিষয়ে আত্মসমর্পণ করা।"[২৫] (সগির)

"শিক্ষার্থী ইসলামের স্তম্ভ।"[২৬] (সগির)

"খোদার সৃষ্টি সম্বন্ধে নিবিষ্টমনে এক ঘণ্টা চিন্তা করা সত্তর বৎসর এবাদত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।'[২৭] (হাদিসের আলো)

"রাত্রিতে একঘণ্টা জ্ঞানানুশীলন করা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উপাসনা করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।"[২৮] (মিশকাত)

কোন্ বাণী ছেড়ে কোন্টা তুলে ধরব আমি ভেবে পাই না। ছোটবেলা থেকে অসংখ্য পুস্তক পড়েছি। নভেল, নাটক, ইতিহাস, ভূগোল স্মৃতির পাতায় পাতায় ধরে রেখেছি কিন্তু এমনিভাবে আকৃষ্ট হই নি। রসুলুল্লাহ (দঃ) - এর প্রতিটি শব্দ আমার কাছে অমৃত বলে মনে হয়। এ অমৃতসুধা যারা পান করে তারা যেমন তৃপ্তি পায়, যারা পান করায় তারা যেন এর চাইতেও বেশি তৃপ্তি পায়। এমন শক্তিশালী সুপেয় অমৃত কার ভাগ্যে জোটে? যে ভাগ্যবান সে-ই এ অমৃত পান করে এবং এ বিশ্বে অমর হয়ে থাকে। জ্ঞানী হবার লোভ আছে? এ অমৃত পান করে নবযুবক হবার সাধ আছে? এ অমৃতের ধারা এখনি পান করে নিন। দেখতে পাবেন শিরায় এবং উপশিরায় তড়িৎ গতিতে এ অমৃত কাজ করবে এবং নব উদ্দীপনা দিয়ে আপনার প্রাণশক্তি এনে দেবে ও জ্ঞান বিকাশের পথে আলো ছড়িয়ে দেবে। বেহেশ্তের পথ সুগম করে আপনার কর্মময় জীবনের একটা সুন্দর মানচিত্র অঙ্কন করে দেবে। নৈতিক, আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এনে দেবে এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

কোন্ ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন? কোন্ ধরনের জ্ঞানার্জন জাতি, সমাজ ও দেশের জন্য মঙ্গলজনক? কোন্ জ্ঞানের আলোকে শান্তি ও মুক্তির পথ রচনা করা যায়? কোন্ জ্ঞানীর মাহাত্ম্যে কোটি কোটি মানুষ অন্ধকারের পঙ্কিলতা হতে মুক্তি লাভ করে? –এই জটিল প্রশ্নগুলির সমাধান করা উচিত।

যে শিক্ষা চরিত্র গঠনে সহায়তা করে, যে শিক্ষা একতা, বিশ্বাস ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে, আত্মাকে সংযমী করে, যে শিক্ষা বিপুল আনন্দ ও উদ্দীপনা দিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মানুষ হবার অনুপ্রেরণা দেয়, যে শিক্ষা আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তৌহিদের বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়, যে শিক্ষা আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ঘাটন করে মানবজাতিকে সুখ ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায়, যে শিক্ষা জড় জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম–সেই শিক্ষাই ইসলামের শিক্ষা। অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের সারতত্ত্ব শিক্ষা, খোদার প্রেম ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, জীবন পরিচালনার শিক্ষা, জ্ঞানমূলক শিক্ষা, শারীরিক ক্ষমতা অর্জনের কৌশল শিক্ষা, সংযমের শিক্ষা, সহানুভূতির শিক্ষা, নবীদের আদর্শ শিক্ষা, সমাজ গঠন-মূলক

www.pathagar.com

শিক্ষা, কৃষিকার্য, ধনোপার্জন, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা, দাম্পত্য জীবনের নীতি শিক্ষা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের শিক্ষা, স্বজাতি-বিজাতি ও দেশপ্রেম শিক্ষা, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা, সংকীর্ণতা পরিহার ও উদারতার শিক্ষা, আত্মার পরিচয় শিক্ষা, কোথা হতে এসেছে, কে সৃষ্টি করেছে, অনন্তকালের জন্য কোথায় বা আবার চলে যাবে এসব তত্ত্বজ্ঞানমূলক শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাধারা বিকাশের শিক্ষা, ন্যায় বিচারের শিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষাই মানবকে পরিপূর্ণতা দান করে।

যে শিক্ষায় মানবের কোন কল্যাণ সাধিত হয় না, যে শিক্ষায় মানুষ পথভ্রষ্ট হয়, যে শিক্ষা আল্লাহর পথ সুগম করে না-সে শিক্ষা ইসলামের শিক্ষা নয়। প্রিয় রসুল সাবধান বাণী উচ্চারণ করে তাই বলেছেন ঃ

'কুলেখক কুকর্মীর তুল্য।"[২৯] (সগির)

"অনেক উপাসক মূর্খ এবং অনেক জ্ঞানী কুকর্মশীল হয়, অতএব মূর্খ উপাসক এবং অসৎ জ্ঞানীকে পরিত্যাগ কর।"[৩০] (সগির)

"শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা অসৎ, মানুষের মধ্যে তাহারাই সর্বাপেক্ষা অধম।"[৩১] (মিশকাত)

"যে জ্ঞান দ্বারা কোন উপকার হয় নাই তাহা সেই রত্নাগার তুল্য, যাহা হইতে খোদার পথে কিছুই ব্যয় করা হয় নাই।'[৩২] (মিশকাত)

"শীঘ্রই মানুষের প্রতি এমন এক যুগ উপস্থিত হইবে যখন ইসলামের নাম ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না এবং কোরআনের আকার ব্যতীত কিছুই বাকি তাকিবে না এবং মসজিদগুলি শূন্য পড়িয়া থাকিবে এবং শিক্ষার অভাবে সেগুলি ধ্বংস হইবে। আকাশের নিচে আলেমগণ সর্বাপেক্ষা অধম ব্যক্তি হইবে। তাহাদের নিকট হইতে বিবাদ বিসম্বাদ প্রচারিত হইবে এবং তাহাদের মধ্যেই উহা সৃষ্টি হইবে।"[৩৩] (হাদিসের আলো)

"যে ব্যক্তি জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে রোজ-কিয়ামতে আগুনের কোমরবদ্ধ দ্বারা বেষ্টিত হইবে।'[৩৪] (মিশকাত)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা ব্যতীত শুধু পার্থিব ভোগবিলাসের নিমিত্ত জ্ঞান অর্জন করে সে পরকালে বেহেশ্‌তের সৌরভ লাভ করিবে না।"[৩৫] (মিশকাত)

মানুষকে জ্ঞান দান করাই ছিল হজরতের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি জানতেন যে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত না হলে ন্যায়-অন্যায় বিচার করার ক্ষমতা মানুষের থাকবে না, ইহকাল ও পরকালের সুপথ রচনা করতে পারবে না। তাই তিনি কখনও বা নির্জন প্রান্তরে, কখনও পর্বতের গুহায়, কখনও লোকারণ্যে, কখনও বা সৃষ্টি বৈচিত্রের মাঝে নিজেকে নিমজ্জিত করে জ্ঞান আহরণ করেছেন এবং আলোক বর্তিকার মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর এ জ্ঞানের কোন সীমা ছিল না। তাই যে কোন লোক যে কোন প্রশ্নের সমাধান চাইলেই অতি সুন্দর এবং সুস্পষ্টভাবেই তা দিতে পারতেন। তাঁর যুক্তি, তাঁর চিন্তাধারা ছিল অকাট্য। তাই যুগ যুগের মনীষীরা তাঁকে অনুসরণ করেছেন এবং চিরদিন করবেন। বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা ও যুক্তি পরিবর্তনশীল কিন্তু এ মহা বৈজ্ঞানিকের থিওরী অপরিবর্তনীয়। সর্বযুগের সর্ব মানুষের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেই তিনি রচনা করেছেন তাঁর কষ্টিপাথরে যাচাই করা অমূল্য বাণী, যে বাণী কোন অমুসলিমের দৃষ্টিও এড়ায় নাই। আল্লাহ্‌ সত্যি বলেছেন ঃ

"এবং আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য অনুগ্রহস্বরূপ ব্যতীত প্রেরণ করি নাই।"৩৬ (সূরা আম্বিয়া। আয়াত ১০৭।)

টীকা ঃ ১'. – ৩৫. হাদিস সংগৃহীত হাদিসের আলো (১ম খণ্ড)

–আজহারউদ্দিন, এম. এ.।

www.pathagar.com

চরিত্র

"তোমাদের মধ্যে সে-ই ভাল যে চরিত্রে ভাল"১

কথাটি বলেছেন বৈজ্ঞানিক নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। মানুষকে তিনি ভাল করেই জানতেন। ভাল করেই চিনতেন। মানুষের জন্যই হয়েছিল তাঁর জন্ম। যে যুগে তাঁর আবির্ভাব, সে যুগ ছিল অন্ধকারের যুগ সে যুগ ছিল পাষাণ-প্রতিমার যুগ। সে যুগ ছিল হীন-চরিত্রের যুগ। দয়া ছিল না, মায়া ছিল না, প্রেম ছিল না, ভক্তি ছিল না। ছিল কুপ্রবৃত্তি, হিংসা, বিদ্বেষ, কপটতা, কৃপণতা, অত্যাচার, অবিচার ও ব্যভিচার। 'জ্ঞানীর লোভ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমি সে যুগের আরববাসীদের অবস্থার কিছুটা বর্ণনা করেছি এবারে চরিত্রের ওপর একটু আলোচনা করে হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণীগুলি তুলে ধরব এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করে দেখব সমাজবিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন এর কতটুকু।

চরিত্র মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। চরিত্রহীন মানুষ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। যে চরিত্র হারায়, সে সবকিছুই হারায়। যার চরিত্র উন্নত, তার আদর পৃথিবীর সর্বত্র।

চরিত্রবান ব্যক্তির লক্ষণ এই যে, সে সর্বদা সত্যভাষী, মিষ্টভাষী, অল্পভাষী, ন্যায়পরায়ণ, উদার, মহৎ, ধার্মিক, ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল ও অমায়িক। মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও গুরুভক্তি তাদের চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ। পরের দুঃখে তারা কাতর; পরের সুখে সুখী। মানুষ ও জীবজন্তুর উপকারে তারা নিজেদেরকে কার্যে নিয়োজিত করে অনাচার, অত্যাচার ও অবিচার থেকে তারা মুক্ত, দানের হস্ত প্রসারিত।

চরিত্রহীন ব্যক্তির স্বভাব ঠিক এর উল্টো। মিথ্যা কথায় তারা সহজেই মানুষকে ভোলায় এবং নিজেদের কাজ উদ্ধার করে। মানুষকে ঠকাবার ও প্রতারণা করবার প্রবৃত্তি এদের বেশি। পরের সর্বনাশের চেষ্টায় তারা থাকে মত্ত। ভক্তি, ভালবাসা ও প্রেম তাদের হৃদয়ের অনুভূতি নয়—কৃত্রিম স্বভাব। এরা হয় কটূভাষী ও কৃপন। মাতা-পিতা, পরিবার-পরিজনকে আপন করে নিতে এরা হয় ব্যর্থ। অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় তাদের হৃদয় হয় কলুষিত। জ্ঞানের লোভের পরিবর্তে ধনের লোভে তারা হয় মত্ত। নারীরা হয় ভোগের সামগ্রী। সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, অন্যায় অত্যাচার ও ব্যভিচার হয় এদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শৈশব কালই চরিত্র গঠনের প্রথম স্তর। পিতা-মাতা ও ভাই-বোনদের চরিত্রের ওপরই নির্ভর করে কচি শিশুর ভবিষ্যৎ চরিত্র। চোরের ছেলে চোর হয় আর সাধুর ছেলে সাধু হয়। কেননা শিশুমন অনুকরনপ্রিয়। যদি কোন শিশু তার পিতাকে চুরি করতে দেখে তবে সে মনে করে চুরি করাই কৃতিত্ব ও সেটাই প্রকৃত পথ। আর যদি কোন শিশু তার পিতাকে দান করতে দেখে তবে সে দানে অভ্যস্ত হয় এবং এই দানের মধ্যেই পরম আনন্দ পায়। তাই দেখা যায় দাতার ছেলে উপবাস করেও দান করে এবং অন্যের কাছে বোকা বলে পরিচিত হয়। তা হলে দেখা যায় যে— শিশুর চরিত্র পিতা-মাতা ও আপন পরিবার-ভুক্ত লোকের ওপর নির্ভরশীল। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন এটা লক্ষ্য করে বলেছেন, "আঠারো বৎসর পর্যন্ত মানুষ যা কিছু শিক্ষা করে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাই অনুসরণ করে।"

এর কারণ হলো এই যে কচিপ্রাণে যা দাগ কাটে, কচি স্মৃতিপটে যে রেখাপাত হয়, তা

---

১. সহীহ বুখারী ঃ তর্জমা। আবদুর রহমান খাঁ—কোরাইশের মর্যাদা।
পরিচ্ছেদ ২৮৯ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

মুছে যায় না। কালচক্রে সেগুলিরই পুনরাবৃত্তি হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের চরিত্র গঠন নির্ভর করে সুশিক্ষা ও স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের চরিত্রের ওপর। শিক্ষক যে আদর্শে শিক্ষা দান করেন তার ভক্ত ছাত্র সেই আদর্শেরই অনুকরণ করে। শিক্ষক নীতিহীন ও নিষ্কর্মা হলে ছাত্রও নীতিহীন ও নিষ্কর্মা হয়ে ওঠে। যদি কোন শিক্ষক তার ছেলেদের মনে দাগ কেটে দেয় যে সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই তবে সে ছেলে নাস্তিক হতে বাধ্য। আর যদি কোন ছেলে তার শিক্ষককে আল্লাহর গভীর প্রেমে নিয়োজিত দেখতে পায় তবে সে ছেলে আল্লাহর প্রেমে পাগল না হলেও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে খেয়ালী হয় না।

চরিত্র গঠন পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপরও নির্ভরশীল। দুশ্চরিত্র ছেলেদের সংস্পর্শে এসে একজন চরিত্রবান ছেলেও তার চরিত্র হারাতে বাধ্য হয়। আবার সচ্চরিত্র ছেলেদের সংস্পর্শে এসে একজন দুশ্চরিত্র ছেলেও ভাল হয়। উন্মাদের পরিবেশে কিছুদিন থাকলে একজন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তিও উন্মাদ হয়। তেমনি আবার সচ্চরিত্র, বিদ্বান ও জ্ঞানীর পরিবেশে উন্মাদ ব্যক্তিও প্রকৃত জ্ঞান ফিরে পায়। হজরতের বাণী এ কথাই প্রমান করে।

"সৎসঙ্গ এবং অসৎসঙ্গের তুলনা কস্তুরী বিক্রেতা ও কর্মকারের তুল্য। কস্তুরী বিক্রেতার কস্তুরী যে ক্রয় করিবে সে তো উহার ঘ্রাণ লাভ করিবেই–যে উহা কিনিবে না সেও উহার সুগন্ধ পাইবে। কিন্তু কর্মকারের হাঁপর হয় তোমার তৈজসপত্র বা বস্ত্র পোড়াইবে, নতুবা সতত তুমি উহার দুর্গন্ধ অনুভব করিবে।" (সগির)

"মহৎদিগের সহিত সহবাস কর এবং জ্ঞানীদিগের নিকট শিক্ষা কর এবং দার্শনিকদের সহিত মিলিত হও।" (শায়খান)

চরিত্রহীন ব্যক্তির দুর্দশা পদে পদে। চোরকে জেল খাটতে হয়। ডাকাতকে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়। অত্যাচারী, সুদখোর ও ঘুষখোরের সামাজিক বিচারেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয়। পরের কান কাটতে গিয়ে নিজের নাক কেটে কত হাজার হাজার চরিত্রহীন ব্যক্তি যে নিদর্শন রেখে গেছে তার হিসাব করা কঠিন। প্রাণের সাথে কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। দুর্দশায় পড়লে কেউ সহানুভূতি দেখায় না। নিজের একান্ত পরিজনও হয় তার শত্রু। দেশ-বিদেশে যেখানেই যাক না কেন তার স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তাই তারা সম্মানের পরিবর্তে অসম্মানিত ও বিরাগভাজন হতে বাধ্য হয়।

একটা দেশ ও জাতির উন্নতি ও অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে কর্মঠ, দেশ-প্রেমিক, সত্যবাদী ও জ্ঞানী-গুণীর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চরিত্রের ওপর। তাদের মহান চরিত্রের ওপরই ন্যস্ত থাকে জাতির ভবিষ্যৎ। অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলহ, অবিশ্বাস ও প্রতারনার জাল বুনে অসৎচরিত্র ব্যক্তিরা জাতিকে পঙ্গু করে দেয়।

বৈজ্ঞানিক নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এসব কলুষকালিমা দেখে অস্থির হয়ে ওঠেন। মানুষ সামাজিক শ্রেষ্ঠ জীব হয়েও যদি সমাজে বাস করতে না পারে, শ্রেষ্ঠ হৃদয় থাকা সত্ত্বেও হৃদয়বান না হয়, বিবেক থাকা সত্ত্বেও বিবেকহীন হয়, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মূর্খ হয় – তবে কারা এ দেশকে শাসন করবে? কারা সৃষ্ট জীবকে ভালবাসবে? কারা সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে? তিনি দেখলেন, সমাজ-বিজ্ঞানী হয়ে এ মূঢ় সমাজের জন্য নতুন থিওরী দিতে হবে–যে থিওরীর মূলসূত্র হবে প্রেম-প্রীতি–ভালবাসা, আত্মবিশ্বাস, ঐশ্বরিক প্রেম, কর্তব্য, শ্রম, সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা, আত্মনির্ভরতা, নীরবতা, দানশীলতা, বিনয় ও লজ্জা। এগুলিই হবে মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এবারে আমরা একটি একটি করে এগুলি আলোচনা করব।

www.pathagar.com

প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা

"বিশ্বের প্রতিটি পদার্থই একে অপরকে সজোরে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণী শক্তি নির্ভর করে তাদের ভর ও দূরত্বের উপর।" (নিউটন)

এ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক নিউটন সপ্তদশ শতাব্দীতে। এটাই **মহাকর্ষ সূত্র** - যার ওপর পদার্থবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় গড়ে উঠেছে। এর অর্থ বড় ব্যাপক, জটিল ও মূল্যবান। আমরা পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন প্রমাণে এটাকে প্রমাণও করেছি।

বিশ্বের প্রতিটি পদার্থের সঙ্গে প্রতিটি পদার্থের একটি আকর্ষন আছে এবং এদের মধ্যে সুসমন্বয় আছে। এ আকর্ষণ ও সমন্বয় না থাকলে এ বিশ্ব টিকে থাকত না। যে অদৃশ্য শক্তির টানে একটি অপরটিকে আকৃষ্ট করে সেই শক্তিকেই প্রেম-প্রীতি বা ভালবাসা বলে। কোরআনেও এ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে।

যেমন–"মানবমণ্ডলীকে রমণীগণের ও সন্তান-সন্ততির এবং পুঞ্জীভূত স্বর্ণ, রৌপ্যভাণ্ডারের এবং সুশিক্ষিত অশ্ব পালিত পশুর এবং শস্যক্ষেত্রের প্রেমাকর্ষণী দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছে। ইহাদের জন্য পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ এবং আল্লাহর নিকটই শ্রেষ্ঠতম অবস্থান।"[১] (কোরআন-৩ঃ১৪)

প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা এমনি একটি বস্তু যা চোখে দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিক কোন প্রমাণেও এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ এ অদৃশ্য শক্তি বিরাজমান বিশ্বের সর্বত্র। শুধু প্রাণিজগতেই নয়, নিষ্প্রান বস্তুর মাঝেও এ প্রেমাকর্ষন দেখা যায়। একটি জড় বস্তুর ইলেকট্রন প্রোটনের প্রেমে আকৃষ্ট হয়। তাই ছুটোছুটি করে প্রোটনের সঙ্গে মিলিত হয় এবং নতুন পদার্থের সৃষ্টি করে। গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল এমনকি হিংস্র জন্তুর প্রেমাকর্ষন দেখলে অবাক হতে হয়। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন প্রভৃতির মাঝে যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ বিদ্যমান তা কোন জ্ঞানী-গুণী বা বৈজ্ঞানিকই অস্বীকার করতে পারেন না। অদৃশ্য শক্তিগুলির মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ আকর্ষন জ্ঞানীকে উন্মাদ করে, রাজাকে ভিখারী করে, সাধুকে শয়তান করে, ধনীকে নির্ধন করে। আবার এর ক্ষমতায়ই ডাকাত ধার্মিক হয়, চোর ভক্ত হয়, কৃপন দাতা হয় এবং পাষাণও মায়ার প্রান পায়। এ সম্পর্কই গড়ে তুললেন হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি ঘোষণা করলেন–

"আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করার পর মানুষকে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের পরিচায়ক।"[২] (সগির)

"প্রেম-প্রীতিতে মুসলমানগণ পরস্পর একটি দেহ সদৃশ। উহার কোন অঙ্গ বেদনা বোধ করিলে সর্বাঙ্গ সেই বেদনা অনুভব করে।"[৩] (শায়খান)

"তোমার প্রতিবেশীর সহিত উত্তম সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করিলেই তুমি মুসলমান হইবে। যে তোমার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে তুমিও তাহার সঙ্গে উৎকৃষ্ট ব্যবহার কর, তবেই মুসলমান রূপে পরিগণিত হইবে।"[৪] (তিরমিজি)

আত্মবিশ্বাস

নিজের আত্মাকে জানা, চেনা ও পরিচয় লাভ করাকেই আত্ম-বিশ্বাস বলে। যার এ বিশ্বাস আছে সে-ই মানুষ – সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব।

মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের এ বিশ্বাস আছে কিনা বলা কঠিন। থাকলেও মানুষই একমাত্র জীব যে তার নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে–ভাল-মন্দের বিচারে নিজেকে

টীকা ঃ ১. কোরআন ঃ সূরা আল এমরান, আয়াত ১৪।

টীকা ঃ ২. -৪. হাদিস ঃ সংগৃহীত - হাদিসের আলো ২য় খণ্ড– মুহাম্মদ আজাহার উদ্দিন, এম. এ.।

www.pathagar.com

যাচাই করতে পারে। যার এ আত্মবিশ্বাস থাকে সে ব্যক্তিই কেবল নিজের ভবিষ্যতের একটা কল্পনা গড়ে তুলে সুখী ও সমৃদ্ধশালী হয়।

মানুষ কেউ ছোট নয়, কেউ ঘৃণ্য নয়, কেউ অস্পৃশ্য নয়। সবারই বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, কর্মক্ষমতা আছে। যে কোন বিশেষ একটি গুণেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ জ্ঞানার্জনে সক্ষম, কেউ বা কায়িক পরিশ্রমে সক্ষম, কেউ বা আবিষ্কারে সক্ষম, কেউ বা ধ্যান-ধারণা ও বুদ্ধি পরিচালনায় সক্ষম। যে কাজে যার আনন্দ আসে, সে কাজেই সে পারদর্শী হয়। সে কাজেই তার উন্নতি আসে। অঙ্কে ফেল করলেই যে সে শরীর বিজ্ঞানী হবে না, উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর থিওরী দিতে পারবে না এমন নয়। পদার্থ বিজ্ঞানে যার কোনই জ্ঞান নেই হয়তো সেই ব্যক্তিই রসায়ন বিজ্ঞানে ডক্টরেট নিয়ে হাজার হাজার রসায়ন বিজ্ঞানীর জন্ম দেয়। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আইনস্টাইন সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর থিওরী যুগ যুগের জন্য অমর হয়ে থাকবে। অথচ তিনিই অঙ্কে অকৃতকার্য হয়েছিলেন। আত্ম-বিশ্বাসে বলিয়ান–এ অমর বৈজ্ঞানিক নিজেকে ছোট করেন নি। নিজেকে অন্যের চেয়ে তুচ্ছ মনে করেন নি। তাই তাঁর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটালেন গভীর চিন্তা ও জ্ঞান সাধনায়। তাঁর এ জ্ঞানমশালেই আলোকিত হলো বিজ্ঞান-জগৎ। এরূপ দৃষ্টান্ত একটি দুটি নয় শত শত। নবী, পয়গম্বর, ওলি-গাউস, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনায়ক সবারই ফলশ্রুতির মূলে তাঁর আত্ম-বিশ্বাস।

মানুষ যে কত শক্তিশালী, বুদ্ধিমান ও সৃষ্টির সেরা জীব তার পরিচয় দিলেন হজরত মুহাম্মদ (দঃ) উদাত্ত কণ্ঠে এই ঘোষণা দিয়ে ঃ

"হে মানুষ! তুমি ছোট নও, ঘৃণ্য নও, অস্পৃশ্য নও–তুমি মহান। তুমি শক্তিমান। চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-বাতাস, মেঘবিচ্যুত, পাহাড়-নদী, তরুলতা সমস্তই তোমার ভৃত্য-তোমার সেবায় তারা নিয়োজিত। আল্লাহর নিচেই তোমার আসন, তুমি কেন অন্য কাহারো নিকট নতশীর হইবে।"[১]

শুধু নিজের বাণী দিয়েই মানুষকে তাঁর আত্মপরিচয়ের সুযোগ দিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চোখে এক তীক্ষ্ণ জ্যোতি এনে দিলেন আল্লাহর মহাবাণী উদ্ধৃত করে ঃ

"আলাম তারাউ আন্নাল্লাহা ছাক্‌খারা লাকুম মা-ফি সামাওয়াতে ওয়াল আরদ। ওয়া আছবাকা আলায়কুম নিয়ামাহু জাহিরাতান ওয়া বাতিনাত।"[২] (৩১-২০)

অর্থাৎ–"তোমরা কি দেখিতেছ না যে নভোমণ্ডলে যাহা এবং ভূমণ্ডলে যাহা আছে, তাহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি তাহার প্রকাশ্য ও গুপ্ত অনুগ্রহ পূর্ণ করিয়াছেন।"

মানুষ যে এমন ক্ষমতার অধিকারী তা তারা জানতো না। মানুষ ইচ্ছে করলে আকাশ ভুবনের স্তরে স্তরে পৌছাতে পারে মহাসাগরের তলদেশ থেকে মণিমুক্তা আহরণ করতে পারে। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সে ইহকাল ও পরকালের নেতা হতে পারে। এ বিশ্বাস, এ ধারণা দিলেন বৈজ্ঞানিক নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দেখালেন যে একজন অনাথ বালক, একজন দরিদ্র সন্তান, একজন অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত মানুষ, মেষ পালক থেকে একটি সাম্রাজ্যের অধিনায়ক, মহান রাষ্ট্রপতি, ধর্মনেতা, বিশ্বমানবের আদর্শ ও যুগ যুগের পথপ্রদর্শক হয়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

সর্বদেশের, সর্বকালের ও সর্বযুগের মহান ব্যক্তিদের জীবন চরিত্র নিয়ে আলোচনা করে দেখা যায় যে, শৈশব থেকেই তাঁরা আত্ম-বিশ্বাসে বলীয়ান। তাই তাঁরা সফলকাম হয়েছেন তাদের অভিযানে। এ বিশ্বাস না থাকলে কেউ নবী হতে পারতেন না। অবশ্য নবী হবেন আল্লাহর মনোনীত বান্দা। কেউ রাষ্ট্রনায়ক হতে পারতেন না। কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত

টীকা ঃ ১ . হাদিস ঃ সংগৃহীত-বিশ্বনবী–গোলাম মোস্তাফা।

২ কোরআন ঃ সূরা লোকমান, আয়াত ২০।

www.pathagar.com

পর্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করতে পারতেন না। কবি, লেখক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এ আত্ম-বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই করেন সাধনা। আর সে সাধনার ফলশ্রুতিতেই উত্তর কালে হয়ে ওঠেন বিশ্ববরেণ্য নেতা, মহামনীষী, মহাজ্ঞানী, মহা-বৈজ্ঞানিক ও বিশ্ববিজয়ী যোদ্ধা। ইতিহাস এর সাক্ষ্য। আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ান, মার্কনী, ডাল্টন, আইনস্টাইন, গ্যালিলিও, এরিস্টটল, প্লেটো যারা বিশ্ব ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, তাদের সাফল্যের পেছনে ছিল এ আত্মবিশ্বাস অসাধ্য সাধনে এ আত্মবিশ্বাসই একমাত্র ওষুধ। হজরত ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারীদের এ জন্যই বলেছেন ঃ

"আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আর সন্দেহ না কর, তবে ডুমুর গাছের প্রতি যাহা করা হইল কেবল তাহাই করিতে পারিবে, এমন নয় কিন্তু। এই পর্বতকেও যদি বল উপড়িয়া যাও ও সমুদ্রে গিয়া পড়, তবে তাহাই হইবে; আর তোমরা প্রার্থনায় যাহা কিছু চাহিবে, বিশ্বাস করিলে তাহা পাইবে।"

(বাইবেল ঃ মথি -২/২১)

আত্ম-বিশ্বাসের অভাবে জ্ঞান-বুদ্ধির মৃত্যু ঘটে। জীবন-যুদ্ধে পরাজয় আনে। শক্তি সাহসের ভাটা পড়ে। অন্তঃকরণের হতাশার রোগে আক্রান্ত হয়।......

আত্ম-বিশ্বাসীরাই তার আত্মার সন্ধান নেয়। যে তার আত্মার সন্ধান নেয় সে একে স্বচ্ছ ও নির্মল করতে চেষ্টা করে। নির্মল ও স্বচ্ছ আত্মাই একটি জাতির প্রাণ।

নিন্দা-হিংসা-বিদ্বেষ

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যে যুগে জন্মলাভ করেন সে যুগে এ প্রাণেরই ছিল অভাব। তাই হিংসা, বিদ্বেষ, নিন্দা, অপবাদ, অহঙ্কার ও অত্যাচারে সমাজ ছিল কলুষিত। এ শ্রেণীর লোকদের পবিত্র করতে তিনি প্রয়োগ করলেন কঠোর ভাষা–"তোমরা হিংসা হইতে সাবধান হও, কারণ অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠ বা তৃণকে দগ্ধ করে, হিংসাও সেইরূপ সৎকার্যগুলিকে ধ্বংস করে।" (আবু দাউদ)

"নিন্দুক কখনও বেহেশ্‌তে যাইবে না।" (নেসায়ী)

"সাবধান হও সন্দেহ করা থেকে। কেননা সন্দেহ সব চাইতে বড় মিথ্যা এবং পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করিও না। পরস্পরের ঈর্ষা করিও না; পরস্পরের প্রতি শত্রুতা ও মনোমালিন্য পোষণ করিও না এবং পরস্পর ভাই হইয়া থাকিও খোদার ভৃত্যরূপে।"

(সহীহ বুখারী ঃ তর্জমা-আবদুর রহমান খাঁ)

"সন্দেহ করা ত্যাগ কর–কারণ সন্দেহই সব চাইতে বড় মিথ্যা। অপরের দোষ খুঁজিও না। আড়ালে দাঁড়াইয়া কথা শুনিও না, গর্ব করিও না, হিংসা করিও না। কাহারো বিপদের সময় সাহায্য করিতে পরান্মুখ হইও না। আল্লাহর সেবক ও পরস্পরের ভাই হও।" (তিরমিজি)

সমাজবিজ্ঞানের জন্যে এমন মূল্যবান বাণী কে দিয়েছে? সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে প্রতিটি যুগের জন্য এমন অমর থিওরী কে তুলে ধরেছে? কেমন উপমা ও তুলনা দিয়ে তিনি মূঢ় মানব সমাজকে শুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। অমর বৈজ্ঞানিকের এ অমর থিওরী যুগ যুগের জন্য সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

আগুনে কাঠ বা তৃণ পোড়ালে এ সব বস্তুর কোন অস্তিত্বই থাকে না। মূল উপাদান পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। আর কিছুটা অসীম শূন্যাকাশে স্থান পায়। অবশিষ্ট যা থাকে সেটা মূল্যহীন। আগুনের লেলিহান শিখা থেকেই হিংসার জন্ম। তাই হিংসুক সমাজকে আগুনের মতোই পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। সমাজের কীট এ হিংসুককে ধ্বংস না করলে সমাজ সুষ্ঠু ও সবল হতে পারে না।

www.pathagar.com

প্রতিটি বাণীই বিশ্লেষণের যোগ্য। তাঁর এক একটা বাণী ধরেই এক একটা বই রচিত হয়। নিন্দাচর্চা মানুষের কু-স্বভাবের অন্যতম। মানুষ যদি শুধু নিন্দা করা থেকে মুক্ত থাকত তবে সমাজ অনেক উন্নতির দিকে এগিয়ে যেত। নিন্দার প্রয়োজন নেই একথা আমি বলছি না। কেননা নিন্দুককে নিন্দা করা কু-স্বভাব নয়- এটা সু-স্বভাবের মধ্যে গণ্য বলেই আমি মনে করি। আমাদের সমাজে নিন্দার প্রচলন এত বেশি যে এটাই একটি ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক রাজনীতিবিদের নিন্দা না করলে তার পেটের ভাতই যেন হজম হয় না। বক্তৃতার ছলে প্লাটফরমে দাঁড়িয়েই শুরু করে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর নিন্দা। মাঠে-ঘাটে-হাটে নিন্দাই হয় প্রচারের মূল বক্তব্য। এই নিন্দুকশ্রেণী কবি, লেখক, সাহিত্যিক, ওস্তাদ, বাবা-মা, ভাই-বোন এমনকি আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বরদেরও নিন্দা করে থাকে। এরূপ দৃষ্টান্ত একটি নয়, দুটি নয়, লক্ষ লক্ষ। ভাল করতে গেলেও এরা নিন্দা করে। এই পেশাদার নিন্দুকের জন্য বেহেশ্‌তের পথ রুদ্ধ–চিরতরে রুদ্ধ। কোরআন এর সাক্ষ্য দেয়–

"প্রত্যেক অপবাদকারী নিন্দুকের জন্য আক্ষেপ।"[১] (১০৪ঃ ১)

"এবং তোমরা গুপ্তচর হইও না এবং অসাক্ষাতে পরস্পরের দুর্নাম করিও না। তোমাদের মধ্যে কেহ কি মৃতভ্রাতার মাংস বক্ষণ করিতে ভালবাসে।"[২] (৪৯-১২)

"নিন্দার ফল ভালোর চাইতে খারাপই হয় অনেক বেশি, কেননা কেউ কারো সাক্ষাতে অথবা অসাক্ষাতে নিন্দা করলে যার নিন্দা করা হয় স্বভাবতই তার ক্রোধ হয়। ফলে তাদের মধ্যে ঘটে অপ্রীতিকর ঘটনা। এছাড়া নিন্দা করলে মানুষ সাধারণত নিরুৎসাহিত ও লজ্জিত হয়ে পড়ে। তার দ্বারা যে মূল্যবান কার্য সম্পাদন হবার কথা তার পথে পড়ে বাধা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোন কবি, লেখক, বৈজ্ঞানিক বা দেশপ্রেমিক সমাজের জন্য, দেশের জন্য বা পরকালের জন্য যদি কিছু দান করতে যান বা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কিছু রেখে যেতে চান, আর নিন্দুকের দল যদি তার বিরূপ সমালোচনা করে তার কার্য বন্ধ করে দেয়, তবে সে নিন্দুক কি সমাজের শত্রু নয়? তার চাইতে বড় শত্রু আর আছে কিনা আমি জানি না। হাজার হাজার এরূপ প্রতিভাবান ব্যক্তি এ নিন্দুকের পাল্লায় পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। সমাজবিজ্ঞানী রসুল এ নিন্দুকের পাপের মাত্রা ভাল করেই উপলব্ধি করতেন এবং জানতেন তাদের প্রায়শ্চিত্তের ফলাফল। তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন –

'নিন্দুক কখনও বেহেশ্‌তে যাইবে না।"[১]

তৃতীয় হাদিসটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। রসুল (দঃ) মানব সমাজকে সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন।–

'সন্দেহই সব চাইতে বড় মিথ্যা।' এ নিয়ে সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করা যাক। সন্দেহকে একটা রোগ বলা চলে। এ রোগে সাধারণ মানুষ প্রায়ই ব্যাধিগ্রস্ত হয়। এতে একবার আক্রান্ত হলে নিরাময় হবার উপায় থাকে না। এ রোগের কীট অন্তরকে এমনি ভাবে কাটে যে হৃদয়ের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই এদের হিতাহিত জ্ঞান কমে যায়, বুদ্ধি লোপ পায়, হিংসা বৃদ্ধি হয়, অন্তরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে। সন্দেহের বশে সর্বনাশ ঘটে। একটা সোনার সংসার ছারখার হয়ে যায়। ভক্তি-প্রেম-ভালবাসা নিমেষে হৃদয় থেকে মুছে যায়। অতি ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বা আপনজনও এ সন্দেহের জালে পড়ে প্রাণ হারায়। একটি কবিতায় আমি এ জন্যই লিখেছি–

ফাল্‌গুন বনে লাগলে আগুন
সবাই দেখতে পায়।
মনের বনে ধরলে আগুন
নিভান কঠিন দায়।

টীকা ঃ ১. কোরআন ঃ সূরা হোমাজাহ, আয়াত ১।

২. কোরআন ঃ সূরা হোজুরাত, আয়াত ১২।

১. হাদিসের আলো ২য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৯৭।

www.pathagar.com

এ মারাত্মক ব্যাধিতে যারা একবার আক্রান্ত হয় তাদের নিস্তার নেই। একজন হয়তো সম্পূর্ণ সুস্থ,শরীরে কোন প্রকার ব্যাধি নেই, অথচ মনে করে তার রক্ত চাপ দিচ্ছে। ভিটামিনের অভাব, শরীরে বল নেই, নাড়ীর গতি ঠিক নেই, গা জ্বালা করে, চোখে ঝাপসা দেখে ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রোগ সন্দেহ করে সত্য সত্যই সে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অথচ একজনের হয়তো সত্যই রোগ আছে কিন্তু সে মোটেই আমল দেয় না, রোগের কথা চিন্তাও করে না, তাকে দেখা যায় কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে গেছে। সন্দেহ নিয়ে অনেক চমকপ্রদ গল্প আছে যা রূপক নয়, বাস্তব। ডাক্তার কবিরাজদের নিকট গেলে এরূপ হাজার হাজার গল্প শোনা যায়। একজন হয়তো সারাদিন ধরে চিন্তা করছে যে তার শত্রু রাত্রিতে তার গলা কেটে যাবে। এ চিন্তা তার মস্তিষ্কে এমনি দাগ কাটতে থাকে যে ঘুমের ঘোরে অথবা চেতন অবস্থায়ই তার কাল্পনিক শত্রুকে ছুরি হাতে দেখতে পায় এবং অচেতন হয়ে যায়। প্রতিবেশী দৌড়ে এসে দেখে কিছুই নেই অথচ ঐ রুগী হাত দিয়ে তখনও তার শত্রুকে দেখায়। একজনকে মধুর সরবৎ পান করতে দিয়ে যদি বলা যায়, কি সর্বনাশ, তুমি বিষ খেয়েছ, তা হলে দেখা যাবে যে সে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং ব্যথ্যার কল্পনায় সারা দেহে অসহ্য জ্বালা বোধ করছে। এমনকি সে হার্টফেল করে মারাও যেতে পারে।

অন্তর-রোগে যারা আক্রান্ত তারা ইহকাল ও পরকালের সুচিন্তা বা সুপরিকল্পনা করতে পারে না। এরা মানুষের নিকট যেমন নিন্দনীয়, আল্লাহার কাছেও তেমনি অপছন্দনীয়। এ অন্তর-ব্যাধির কথা কোরআনে পরিষ্কার বলা আছে–"তাহাদের অন্তর সমূহে রোগ আছে, পরন্তু আল্লাহ্ তাহাদের রোগ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রহিয়াছে, যেহেতু তাহারা অসত্য বলিয়াছিল।" (২ ঃ ১০)

"বস্তুত তুমি দেখিবে যে যাহাদের অন্তরে রোগ আছে উহারা তাহাদের মধ্যে প্রভাবিত হইয়া বলে আমাদের আশঙ্কা হয় যে আমরা বা কালের আবর্তে পতিত হই।" (৫ ঃ ৫২)।

বাইবেলেও আমরা অনুরূপ বাণী দেখতে পাই। নিম্নে তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "তোমরা শুনিতে থাকিবে কিন্তু কিছুতেই বুঝিবে না। দেখিতে থাকিবে কিন্তু কিছুতেই প্রত্যক্ষ করিবে না। কারণ এই লোকদের অন্তঃকরণ অসার হইয়াছে, তাহাদের শ্রবণশক্তি স্থুল হইয়াছে, তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে, পাছে তাহারা চোখে দেখে, কর্ণে শোনে, অন্তরে বুঝিতে পারে এবং ফিরিয়া আসে ও আমি তোমাদের সুস্থ করি।" (বাইবেল ঃ মথি ১৩-১৪)

পারিবারিক জীবনে দেখা গেছে যে স্বামী তার স্ত্রীকে চরিত্রহীনা সন্দেহ করে পরিত্যাগ করেছে অথবা ক্রোধের আগুনে জ্বলে হত্যা করেছে। স্ত্রী পবিত্র স্বামীকে সন্দেহের বশে বিষ প্রয়োগ করে খুন করিয়াছে অথবা অভিমান করে বাপের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছে। হানাহানি, বিবাদ বিচ্ছেদ, মারামারি, কাটাকাটি যত কিছু ঘটনা একটা পরিবারে ঘটে থাকে তার মূলে প্রায়ই দেখা যায় এ সন্দেহ পোকার খেলা। ডাক্তার এ পোকা ইনজেকশন দিয়ে নষ্ট করতে পারে না–কবিরাজ দ্রব্যগুণের মাধ্যমেও এ পোকার সন্ধান পায় না–ওঝা মন্ত্র পড়েও এর মাথা হেঁট করাতে পারে না। যে রোগের ওষুধ নেই, সে রোগের কোন চিকিৎসা হয় না। অথচ এ রোগ সর্বনেশে রোগ, যার সৃষ্টি সন্দেহ থেকে। তাই বৈজ্ঞানিক নবী বলেছেন, সন্দেহ না করতে, মিথ্যার জন্ম না দিতে। কেননা সন্দেহ মিথ্যার সৃষ্টি করে। মিথ্যা পাপের মা।

'অপরের দোষ খুঁজিও না'–এ বাণী আমার কাছে সমাজ বিজ্ঞানের মূল থিওরী বলে মনে হয়। মানুষ যদি একে অপরের দোষ না খোঁজে তবে হিংসার উৎপত্তি হয় না–ক্রোধ আসে না, নিন্দার ভয় থাকে না–অপবাদের সুযোগ থাকে না। যেখানে দোষ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, স্বভাবত সেখানে কেউ কারো ক্ষতি করতে পারে না। কারণ দোষ দেখলে তখন তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করে। সবাই ঐ চেষ্টায় ব্রতী হলে সুন্দর এবং সাবলীল একটা সমাজ গড়ে ওঠে। প্রত্যেকটি মানুষ যদি অপরের দোষ না খুঁজে নিজের দোষ খুঁজত তাহলে সে শুধু খাঁটি সোনার মতোই হতো না, সমাজের জন্য হতো এক মূল্যবান রত্ন।

আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা শোনা, গর্ব করা, হিংসা করা এগুলি অত্যন্ত নিচু মনের পরিচয়।

www.pathagar.com

যাদের এ সব অভ্যাস আছে তারাই ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি করে অনর্থ ঘটায়। আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা শোনার অভ্যাস ছেলেদের চাইতে মেয়েদের অনেক বেশি। এরা আড়াল থেকে কথা স্পষ্ট শুনতে পারুক বা না পারুক সন্দেহের বশেই কথাটির বিকৃত রূপ দিয়ে স্বামীর কাছে অথবা ভাই-বোনের কাছে প্রকাশ করে, ফলে মুহূর্তের মধ্যে দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। সন্দেহমনা একদল পুরুষও আছে যারা নিজেকে গোপন রেখে অন্যের কথা শুনে এবং নানাভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে ও ভাবভঙ্গী করে যার সম্বন্ধে কথা হয় তার কাছে পেশ করে। কথাটির সত্যতা কতটুকু, উদ্দেশ্য কি, সত্যই বলা হয়েছে কিনা, কি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এ গুলি বিচার না করেই চলতে থাকে প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি। ফলে গুরুতর এক পর্যায়ে এসে পড়ে। এসব অন্যায় আচরণ ও কুস্বভাব থেকে মানুষকে মুক্তি দিতেই হজরত মুহাম্মদ (দঃ) দিয়েছেন অজস্র বাণী, যা যুগ যুগের জন্য অমর অক্ষয় হয়ে থাকবে। এবং ছিদ্রান্বেষীদের ওপর কঠোর সাবধান বাণী প্রতিটি জাতির ধর্মগ্রন্থেই দেখতে পাই। বাইবেলের একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

অপরের দোষ খোঁজা

(১) বাইবেল। লুক –৬/১......

"তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে যে কুটি আছে তাহা কেন দেখিতেছ? অথচ তোমার নিজের চক্ষুতে যে কড়িকাঠ রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য কর না অথবা চক্ষুতে যে কড়িকাঠ রহিয়াছে তাহা যখন দেখিতেছ না, তখন তোমার ভ্রাতাকে কেমন করিয়া বলিতে পার, ভাই এস তোমার চক্ষু হইতে কুটিটা বাহির করিয়া দিই। ভণ্ড প্রথমে নিজের চক্ষু হইতে কড়িকাট বাহির করিয়া ফেল, তখন তোমার চক্ষু হইতে কুটিটি বাহির করিবার জন্য স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।"

(২) কোরআনেও এ বিষয়ে সাবধান বাণী দেওয়া হয়েছে কঠোর স্বরে। বাণীটি নিম্নরূপ—"এবং যে কেহ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে তৎপরে উহা নিরপরাধীর প্রতি দোষারোপ করে তবে সে অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করিবে।" (৪ ঃ ১১২)

"প্রত্যেক অপবাদকারী নিন্দুকের জন্য আক্ষেপ।"

(সূরা হোমাজা। আয়াত ১)

ঐশ্বরিক প্রেম

আত্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করছিলাম। যারা নিজের আত্মাকে বিশ্বাস করে তারা আত্মার সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে। এই সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে তখন তারা মন-প্রাণ সঁপে দেয়। তারা বিশ্বাস করে যে সৃষ্টিকর্তা—এ বিশ্বের মালিক একজন আছেন। ভাল-মন্দ কাজের বিচারের জন্য এক শাসক আছেন—সে শাসক, সে মালিক, সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্। যার সন্ধান দিয়েছেন পূর্ববর্তী নবীগণ ও পরবর্তী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। এ সর্বশক্তির আধার, আল্লাহর প্রেমে মুগ্ধ হয়েই তিনি বলেছেন—

"পরলোকে আল্লাহ্ বলিবেন—আমার **প্রেমিকগণ** কোথায়? আজ আমি তাহাদিগকে আমার ছায়া দান করিব। আমার ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া নাই।" (মুসলিম)

যারা আল্লাহ্ প্রেমের প্রেমিক তাদের মর্যাদা কিরূপ হবে সেটারই ইঙ্গিত দিয়েছেন আমাদের নবী। যারা আল্লাহর প্রেমে পাগল তাঁরা ক্ষুদ্রতম স্বার্থের লোভে ভোলে না। জালিয়াতী, ভণ্ডামী, গর্ব, অহঙ্কার এগুলির মাথায় লাথি মেরে তারা শূন্য আকাশের নিচে অথবা ভাঙা কুঁড়েঘরে ভুখা পেটে সন্তুষ্ট মনে আল্লাহর প্রেম সুধা পান করে। এ সুধা পান করে যে তৃপ্তি তারা পায়, সে তৃপ্তি আড়ম্বরপূর্ণ রাজপ্রাসাদেও খুঁজে পাওয়া যায় না। হীরক,

www.pathagar.com

মণি-কাঞ্চনের লোভে তারা লোভী নয়। নারীর সুবিন্যস্ত কেশ, রূপালী দাঁতের হাসি ও প্রেমের চাহনিতেও তারা মত্ত নয়। রাজার ভূষণ, ভোগবিলাসের সামগ্রীতে তারা তুষ্ট নয়—তুষ্ট শুধু সেই আল্লাহর নামের অমৃত সুধাপানে।

এ জন্যই আল্লাহ্ প্রেমের এক পাগল লিখেছেন এবং প্রাণ মাতানো সুরে সবাইকে মুগ্ধ করে ঐ প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন। গানটি সাধক কণ্ঠে যখন হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসে তখন সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ঐ প্রেমে। ভুলে যায় দুনিয়া। ভুলে যায় আপন পর। ভুলে যায় সুখের লালসা। এ গান আমার কঁচি প্রাণেই দাগ কাটে। আজও ভুলি নি সে পাগলের কথা। যখনই হৃদয়-তন্ত্রে এটা ঢেউ খেলে, তখন আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে বিভোর হই। কার প্রেমে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি। দেখি কারা এ প্রেমের সুধা পান করে এ কথা শোনে—

"খোদারই প্রেমে সরাব পিয়ে
বেহুস হয়ে রই পড়ে হায়।" [নজরুল]

নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ও কলেমা বিশ্বাস এনে দেয়। ভক্তি এনে দেয়। পুণ্যের দরজা খুলে দেয়। বেহেশ্তের পথ উন্মোচন করে। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্র কর্ষণ করে না। প্রেম-লীলার পন্থা একটু ভিন্নরূপ। নবী, পয়গম্বর, ওলি-গাউস, সাধক, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ এ পথের সন্ধান জানেন। তাই সেই প্রেমেই নিজেকে বিলিয়ে দেন এ জগতেই। আল্লাহ্ ধ্যান, আল্লাহ্ জ্ঞান, এটাই তারা জানে, এটাই তারা মানে। এ প্রেমিকের দল মানুষের ক্ষতি করতে জানে না। এরা আড়াল থেকে গোপন কথা শোনে না। এরা সন্দেহের ব্যাধিতে ভোগে না—এরা নিন্দাচর্চা করে সমাজের সর্বনাশ ডেকে আনে না। এরা পুরস্কৃত না হলে কারা পুরস্কৃত হবে? সেই মহাবিপদের দিনে এদের মাথায় ছায়া না দিলে আল্লাহ্ কাদের মাথায় ছায়া দেবেন? শহীদ, পয়গম্বর তাঁরা পর্যন্ত এদের সম্মান দেখে সেদিন মনে মনে হিংসা করবেন। এ তত্ত্বটিও মেলে রসুলের বাণীতে—

"আল্লাহ্ বলেন—পরলোকে আমার প্রেমিকের জন্য আলোক-মঞ্চ থাকিবে। নবী ও শহীদগণ তাহাদিগকে দেখিয়া হিংসা করিবেন।"

(তিরমিজি)

"খোদার ভয়ে যখন কোন পুণ্যশীল মানুষের চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরে এবং তাহা গড়াইয়া তাহার মুখের মধ্যে পড়ে এবং যদিও উহার আকার মাছির মাথার চেয়েও ক্ষুদ্র হয় তথাপি আল্লাহ্ তাহার জন্য দোজখ হারাম করেন।" (মিশকাত)

আল্লাহ্ প্রেমের এমন মূল্যবান উপদেশ বিরল। চোখের জলই প্রেমের পরীক্ষা। চোখের জলই নির্মলতার নিদর্শন। অশ্রুভরা আঁখিই অনুতপ্ত অন্তরের প্রতিচ্ছবি। সজল নয়নের এ আঁখি দেখলে মানুষের অন্তরেই যেখানে দয়ার উদ্রেক হয়—ক্ষমার ও সাহায্যের মনোভাব এসে হৃদয় আপ্লুত হয়, সেখানে এ অশ্রু দেখে সৃষ্টিকর্তার দয়া ও মায়া যে কিভাবে তাঁর সৃষ্টজীবের ওপর পতিত হয় তা জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই অনুভব করবেন। অনুতপ্ত হৃদয়ের কান্না আল্লাহর পছন্দনীয়। রসুল (দঃ) নিজেও অশ্রুভরে কাঁদতেন এবং তাঁর করুণা প্রার্থনা করতেন। এ প্রার্থনা তাঁর ব্যর্থ হয় নি। তাই শিখিয়েছেন আমাদের মতো মূঢ় ও পাপী বান্দাদের। মনে প্রাণে এ তত্ত্বমূলক বাণীটি আমরা গ্রহণ করে যদি তাঁর নির্দেশকে পালন করতে পারি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা বেহেশ্তের অধিকারী হবো এতে কোন ভুল নেই। কেননা এ অঙ্গীকার আমাদের পথপ্রদর্শক, মানব মুক্তির দিশারী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর।

আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারা এই যে বাণীতে শুধু তাঁর অনুসারী মুসলিম জাতিকে বোঝান নি—বিশ্বের সমগ্র মানবকেই মুক্তির পথ দেখিয়েছেন।

খ্রীষ্টান, ইহুদি, হিন্দু প্রতিটি জাতির প্রতিটি মানুষেরই যে এটা মুক্তিরপথ, হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণী যে অকাট্য—তার প্রমাণ আমারা পাই তাঁদের ধর্মগ্রন্থ হতে। তাঁদের মহামানবদের সুস্পষ্ট বাণী হতে। নিম্নে এর উদ্ধৃতি দিয়ে হজরতের এ মূল্যবান বাণীর সার্থকতা প্রমাণ করছি।

www.pathagar.com

হজরত ঈসা (আঃ) বলেছেন—"ঈশ্বরই প্রেম, আর প্রেমে যে অবস্থান করে, সে ঈশ্বরে অবস্থান করে। বিচার দিনে যেন আমরা সাহস পাই এইজন্য প্রেম আমাদের মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে; কারণ তিনি যেমন আছেন আমরাও এই জগতে তেমনি আছি। প্রেমে ভয় নাই বরং পূর্ণ প্রেম ভয়কে দূর করিয়া দেয়। কারণ ভয়ের সহিত শাস্তি জড়িত। আর যে ভয় করে, সে প্রেমে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। আমরা তাঁহাকে প্রেম করি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের প্রেম করিয়াছেন। যদি কেহ বলে আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি অথচ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করি, সে মিথ্যাবাদী। কারণ যাহাকে দেখিয়াছে আপনার সেই ভ্রাতাকে যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে দেখে নাই তাহাকে প্রেম করিতে পারে না। আর আমরা তাহার নিকট হইতে এই আদেশ পাইয়াছি। ঈশ্বরকে যে প্রেম করে সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করে।" (বাইবেল, প্রেম, নিউ টেস্টামেন্ট)

"তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে—এইটি শ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য। তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করিবে।"[১]

আল্লাহর প্রেমভক্তি বোঝাতে গিয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেছেন—"প্রেমভক্তিতে সাধক ঈশ্বরকে খুব আত্মীয়ের ন্যায় বোধ করেন—যেমন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে গোপীনাথ বলিত—জগন্নাথ বলিত না।"[২]

"ভগবানের কথায় যার গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে ও চক্ষে ধারা ঝরে, সেইটি তার শেষ জন্ম বুঝিতে হইবে।"[৩]

"মানুষ তুমি অন্য জিনিস নিয়ে ভুলে আছ। এ-সব ফেলে দিয়ে যখন তুমি ঈশ্বরের জন্য কাঁদবে তখন তিনি এসে তোমায় দেখা দেবেন।"[৪]

তাহলে আমরা দেখতে পাই ঐশ্বরিক প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অশ্রুজল। এ জল শুকাবে না। মুছে যাবে না। মজুত থাকবে বিচার দিনের জন্য। বেহেশ্‌তের জন্য।

কর্তব্য

কর্তব্য শব্দটির অর্থ বড় ব্যাপক। এর বিশ্লেষণ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। তাই কোরআনের বাণী নিয়ে এ আলোচনায় হাত দিচ্ছি।

"ওয়া মা খালাক্‌না সামাওয়া ওয়াল আর্‌দা ওয়া মা বায়নাহুমা বাতিলান।"[৫] (১৩ ঃ ২৭)

অর্থাৎ—"এবং আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তদুভয়ের অন্তর্গত বিষয়সমূহ বৃথা সৃষ্টি করি নাই।"

আল্লাহর এ বিশাল সৃষ্টির অভ্যন্তরে যা কিছু আছে কোনটিই অহেতুক নয়, কোনটিই খেলো নয়, প্রতিটি সৃষ্টিরই একটা উদ্দেশ্য আছে। সৃষ্টবস্তু সে উদ্দেশ্যই সফল হচ্ছে। সে কর্তব্যই তারা পালন করছে। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। যদি তারা নিজস্ব কর্তব্য হতে বিমুখ হতো তবে সমস্ত সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতো। তারা নিজেরাও ধ্বংস হতো, আমরাও টিকে থাকতাম না। মেঘের কর্তব্য বারিবর্ষণ করা, চন্দ্র-সূর্যের কর্তব্য আলোক দান করা, বায়ুর কর্তব্য জীবকে বাঁচিয়ে রাখা, মাটির কর্তব্য জন্মদান করা, তরুরাজির কর্তব্য জীব-

---

টীকা ঃ ১. বাইবেল। মার্ক ১২/২৯—৩০।

টীকা ঃ ২. -৪. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উপদেশ, সংগৃহীত সুরেশচন্দ্র দত্ত, পৃষ্ঠা ৮৮,২৭।
৩.

৫. কোরআন-সূরা রাদ। আয়াত ২৭।

www.pathagar.com

জন্তুকে আহার্য দান করা ও পানির কর্তব্য সৃষ্ট জীবকে সজীব রাখা। এরূপ কোটি কোটি জানা-অজানা বস্তু যা কিছু এ বিশ্বে আছে সবই তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছে।

পাহাড়-পর্বত, · -নালা, খাল-বিল, সাগর-মরুভূমি, গ্রহ-নক্ষত্র, কে তার কর্তব্য সম্পাদন করছে না। বাতাস যদি অক্সিজেন, নাইট্রোজেন না দিত, সাগর যদি বাষ্প সৃষ্টি না করত, মরুভূমি যদি উষ্ণ বায়ু শূন্য মার্গে বিস্তার না করত, চন্দ্র-সূর্য যদি উদিত ও অস্তমিত না হতো, বৃক্ষরাজি যদি ফল দান না করত, ভূমি যদি জন্মদানে ব্যর্থ হতো তা হলে কি বিপদই না হতো। বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য ও কর্তব্যের সামান্য একটু দেখলাম। এবারে মানব শরীরের দিকে একবার তাকাই। হাত কাজ করে, পা হেঁটে যায়, চোখ দৃষ্টিশক্তি আনয়ন করে; কর্ণ শ্রুতিশক্তি এনে দেয়, পাকস্থলী হজম ক্রিয়া সম্পাদন করে, ধমনী ও শিরা-উপশিরা শরীরে রক্ত প্রবাহিত করে, মস্তিষ্ক বুদ্ধি চালনা করে, নাসিকা নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, মুখ আহার গ্রহণ করে, জিহ্বা কথার সৃষ্টি করে। যদি এবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খেয়াল বশে অভিমান করে বসত এবং যার যার কর্তব্য পালনে বিমুখ হতো তবে কি মানুষরূপে বেঁচে থাকার উপায় থাকত? থাকত না। কিছুতেই থাকত না। কোন বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাতেও ফল হতো না। আল্লাহর এসব নিখুঁত সৃষ্টির দিকে তাকালে বোঝা যায় মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? তার কর্তব্য কি? বৈজ্ঞানিক নবী এ জন্যই আল্লাহর সৃষ্টির দিকে তাকাতে বলেছেন এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালনে উপদেশ দিয়ে জাগতিক ও মহাজাগতিক কল্যাণ লাভ করতে বলেছেন।

মানুষ হিসাবে কর্তব্য, সমাজের প্রতি কর্তব্য, দেশের তরে কর্তব্য প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য, আল্লাহর প্রতি কর্তব্য এগুলি বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রসুল (দঃ) আমাদের শিখিয়েছেন। এক কথায় বলতে গেলে প্রতিটি পদে পদে অর্থাৎ প্রতিটি কথায় ও কাজে আমাদের কি কর্তব্য তা প্রত্যক্ষভাবে তিনি দেখিয়েছেন। তাঁর মহাবাণীর দু-একটি মাত্র এখানে উল্লেখ করছি—

"যে কোন মুসলমান তার ভ্রাতার সম্মান রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে তাহার প্রতি খোদারও কর্তব্য রহিয়াছে যে পরলোকে তিনিও তাহার সম্মান রক্ষা করিবেন। অতঃপর পাঠ করিলেন মুমেনদিগকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।" (মিশকাত)

"ক্ষুধার্তকে অন্নদান কর; রোগীর সেবা কর এবং বন্দীকে মুক্তি দাও যদি সে অন্যায়ভাবে বন্দী হইয়া থাকে।" (মুসলিম)

"তোমরা কি জান প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের কর্তব্য কি? যদি সে তোমাদের সাহায্য চায় তবে তাহাকে সাহায্য কর। যদি সে খাবার চায় তবে তাহাকে খাইতে দাও। যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় তবে সাহায্য কর। যদি অসুস্থ হয় তাহার শুশ্রূষা কর। যদি মারা যায় তাহার জানাজায় অনুগমন কর। যদি সে কল্যাণ লাভ করে তবে তাহাকে উৎসাহিত কর। আর যদি বিপদগ্রস্ত হয়, সহানুভূতি প্রদর্শন কর। তাহার অনুমতি ব্যতীত তোমার গৃহকে এত উচ্চ করিও না যাহাতে তাহার বাড়িতে বাতাস প্রবেশ করিতে বাধা পায়। তাহাকে যন্ত্রণা দিও না। যদি কোন ফল ক্রয় কর তবে তাহাকে কিছু দাও নতুবা গোপনে উহা লইয়া ঘরে যাও এবং তোমার সন্তানদিগকে উহা বাহিরে লইয়া যাইতে দিও না যাহাতে তাহার সন্তানদের দৃষ্টিতে না পড়ে।" (মিশকাত)

সমাজতন্ত্র নিয়ে সারা দুনিয়ায় আজ যে বিক্ষোভের ঝড় উঠেছে, ধনীদের নির্মূল করে গরিবকে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রকল্প তৈরি হচ্ছে ; পথে, ঘাটে, মাঠে যে অজস্র জীবন অকালে এজন্য ঝরে যাচ্ছে, কোটি কোটি টাকা যার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে, সে সুন্দর এবং সাবলীল একটা সমাজতন্ত্র এখনও গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি এবং হবে কিনা সে আশাও সুদূর পরাহত। সে সমাজতন্ত্র, সে বিধান, সে সুন্দর থিওরী মিলছে হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণীর মধ্যে। এ বাণীকে অবলম্বন করে আমরা যে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারব সেটাই হবে সর্ব যুগের, সর্ব দেশের ও সর্ব জাতির জন্য গ্রহণীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র।

www.pathagar.com

কাল-পাত্রভেদ, ধর্ম ও বর্ণের প্রভেদ এতে থাকবে না। হিংসার চোখে অপরের দ্রব্য লুণ্ঠন করে ভাগ করে দেবার প্রয়োজনও এতে পড়বে না। আইন করে, জোর করে, জুলুম করে, অত্যাচার করে, হাইজ্যাক করে, বাহাদুরী দেখানোর মত কৃতিত্বেরও কোন আবশ্যক পড়বে না। পড়বে শুধু মানসিক অবস্থার পরিবর্তন করে সমাজের ঊর্ধতন শ্রেণীর লোকদের কর্তব্য পালন করতে বাধ্য করা। এ কর্তব্য হবে রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর থিওরীর মাধ্যমে। তবেই হবে সমাধান। নতুবা যুগ যুগ ধরে নব্য থিওরী দাতাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগেই থাকবে। সমাধান আর হবে না।

কর্তব্যের ওপর আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিটি মানুষের কর্তব্য এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন। অথচ এদের কর্তব্য সম্পাদনেই আসে শান্তি, শৃঙ্খলা, জাতির বৃহত্তর মঙ্গল। আর এর অভাবে জাতি হয় পঙ্গু, দেশ হয় দারিদ্র্য, নাগরিক হয় উচ্ছৃঙ্খল।

জ্ঞানীর কর্তব্য জ্ঞান দান করা। শিক্ষার্থীর কর্তব্য জ্ঞান আহরণ করা। মায়ের কর্তব্য ছেলে মানুষ করা আর ছেলের কর্তব্য মায়ের মর্যাদা রক্ষা করা। রাজার কর্তব্য প্রজাপালন। প্রজার কর্তব্য তাঁর আদেশ পালন। যোদ্ধার কর্তব্য যুদ্ধ করা। সেবিকার কর্তব্য সেবা করা। একজন সব কর্তব্য পালন করতে পারে না। সমবেত কর্তব্যই দেশের কর্তব্য। সমঝোতায় কর্তব্যই জাতির কর্তব্য। এ কর্তব্যই করতে বলেছেন প্রিয়তম নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)।

শ্রম

"হে খোদা! আমাকে অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা এবং কৃপণতা, বার্ধক্য ও কলুষতা, উদাসীনতা ও দারিদ্র্য, লজ্জা ও নিচুতা হইতে রক্ষা কর।"[১]

"পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি"—এটা মনীষীদের কথা। এ কথা মহাপুরুষদের কথা। এ কথা রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজবিজ্ঞানীদের কথা। পরিশ্রম ভিন্ন কোন মানুষ বা কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। উন্নতির মূলেই নিহিত এ পরিশ্রম। যারা অলস, যারা কুড়ে, যারা অক্ষম, তারা শুধু নিজের জন্যই নয়, পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্যও কলঙ্কস্বরূপ। যে সব মনীষী অমর ও অক্ষয় হতে এ ধরায় আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁদের জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় তাঁরা সুখের পালঙ্কে, আরাম-আয়েসে জীবন অতিবাহিত করেন নি। নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, সুস্থ-সবল জাতি ও সমাজ গঠন করতে রাত-দিন পরিশ্রম করে তবেই সফলতা অর্জন করেছেন। শুধু মানুষই নয়, সমাজিক জীব ও প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায় পরিশ্রম করে একটা সুন্দর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। মৌমাছি সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে কত সুন্দর মৌচাক তৈরি করে, তাদের বাসস্থান নির্মাণ করে, মধু সঞ্চয় করে ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের থাকার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা যে পরিশ্রম করে খাদ্য সঞ্চয় করে তা সত্যিই অদ্ভুত। বাবুই পাখির বাসা তৈরির পেছনে যে শ্রম দরকার তার ব্যতিক্রম করতে তাদের দেখা যায় না।

শ্রম কোনদিনই ব্যর্থ হয় না। শ্রমের মর্যাদা সব সময়ই মেলে। ইহকাল ও পরকাল দুটোর জন্যই নিরলস শ্রম দরকার। এ জন্যই হজরত মুহাম্মদ (দঃ) শ্রমের ওপর এত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নিজের জীবনে শ্রমের মর্যাদা দিয়ে তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। একজন মেষপালক বালক থেকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন ধর্ম প্রচারক, শাসক, নায়ক, যোদ্ধা, সমাজ সংস্কারক হয়ে আমাদের জন্য নিদর্শন রেখে গেছেন। রাখাল হয়ে মেষপাল চরান, দরিদ্র হয়ে কূপ থেকে পানি উঠান, সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করা, নবী হয়ে ধর্ম প্রচার করা, মজুর হয়ে কাঠ কাটা, সাধারণ মানুষ হয়ে সংসারের কাজকর্ম করা, দর্জির বেশে কাপড় সেলাই করা, সমাজ-

টীকা ঃ ১. হাদিস-সংগৃহীত-হাদিসের আলো ২য় খণ্ড। কৃত-মুহাম্মদ আজাহারউদ্দিন, এম. এ.

www.pathagar.com

সেবক হয়ে গরিবের দুয়ারে দুয়ারে ঘোরা, শাসক হয়ে শাসন করার মতো কোন শ্রমই তিনি বাদ দেন নি। অলসতা, অক্ষমতা, কাপুরুষতা ও কৃপণতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাঁর প্রার্থনা এ কথা প্রমাণ করে। নিম্নে তাঁর আর একটি গুরত্বপূর্ণ বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"কোন আত্মাই তার জীবিকা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মরে না। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জীবিকা অন্বেষণের নিমিত্ত চেষ্টা কর এবং উহা পাইতে বিলম্ব হইলে আল্লাহর অবাধ্য হইও না।"[১] (বয়হাকী)

ওপরের বাণী হতে দেখা যায় যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) মানুষকে তাঁর জীবিকা অন্বেষণের চেষ্টা করতে বলেছেন এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে বলেছেন। আল্লাহ্কে ভয় করার কথাটি জীবিকা অন্বেষণের সঙ্গে যুক্ত করে সাবধান করে দিয়েছেন এই অর্থে যে, পেটের খোরাক যোগাতে গিয়ে যেন অপরের কোন অনিষ্ট না হয়। অর্থাৎ চুরি, ডাকাতি বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কেউ যেন জীবিকার সন্ধান না করে। উপদেশটির মর্ম কত গভীর, কত সুন্দর ও কত সমাজ গঠনমূলক। সৎভাবে জীবিকা উপার্জনের জন্য এরূপ বহু বাণীই তিনি সমাজকে দিয়ে গেছেন—

"সৎভাবে জীবিকা অর্জন করা অন্যতম ফরজ।"[২] (বয়হাকী)

শ্রমে অপারগ হয়ে শ্রম হতে বিমুখ হবারও তিনি নিন্দা করেছেন। শ্রমের ফল সময় মত মিলছে না মনে করে অনেকেই হতাশ হয়ে যায় এবং বৃহত্তর কার্যসাধন হতে নিবৃত্ত হয়। অনেকে আবার শ্রমের মর্যাদা বা সুফল পাচ্ছে না বলে অদৃষ্টকে দোষারোপ করে অথবা আল্লাহর ওপর বিরাগভাজন হয়। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে কর্মের ফল অনেক সময় ঠিকমতো না মিললেও ব্যর্থ হয় না। ইসলামের মহামন্ত্র প্রচার করতে তাঁকে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। নিজের মাতৃভূমি হতে বিতাড়িত হয়ে তিনি মদিনায় আশ্রয় নিয়েছেন। ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে নির্জন গুহায় বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। ওহোদের যুদ্ধে তাঁর সুশ্রী দন্ত হারিয়েছেন। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিকদের কটূক্তি শুনেছেন। অনাহার ও অনিদ্রায় দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, তবুও তাঁর কর্তব্য হতে বিমুখ হন নি। অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন নি। আল্লাহর কাছেও অভিযোগ জানান নি। যদি তিনি আমাদের মতো দুর্বল চিত্তের একজন মানুষ হতেন তবে সারা বিশ্বে কিছুতেই আধিপত্য বিস্তার করতে পারতেন না। তাঁর সৎসাহস, কর্মপদ্ধতি, শ্রম ও নিষ্ঠা আমাদের সত্যিই হতবাক করে দেয়। যে কাজ করতে আমরা লজ্জিত হই, ঘৃণা বোধ করি, মান-অপমানের প্রশ্ন তুলি, সেগুলি তিনি নিজ হাতে সম্পন্ন করে আমাদের জন্য নিদর্শন রেখে গেছেন। তাঁর সহধর্মিনী আয়েশা (রাঃ)-এর উক্তি হতে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি হজরতের শ্রমের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—"রসূলুল্লাহ নিজের জুতো নিজে মেরামত করেছেন। নিজের বস্ত্র নিজে সেলাই করতেন। তোমাদের প্রত্যেকের ন্যায় তিনিও গৃহকর্ম করতেন। তিনি মানুষের মধ্যে অন্যতম মানুষ ছিলেন। নিজের বস্ত্র নিজে ধৌত করতেন। নিজের ছাগী নিজে দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন।"[১] (তিরমিজি)

বৈজ্ঞানিকদের জীবন কাহিনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, তাঁদের আবিষ্কারের ফল একদিন দু'দিনের পরিশ্রমে হয় নি। বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। দুরাশা, নিরাশা ও হতাশায় তাঁদের মন কোনদিনই অস্থির হয়ে ওঠে নি। তাঁদের শ্রম যদি ব্যর্থ হতো তবে আমরা আজ কিছুই উপভোগ করতে পারতাম না। লজ্জা, অপমান, হীনতা, উদাসীনতা তাঁদের স্পর্শ করতে পারে নি। এ জন্য তাঁরা আত্মমর্যাদা লাভ করেছেন। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন ঃ

টীকা ঃ ১ .–২ হাদিস- সংগৃহীত-হাদিসের আলো ২য় খণ্ড কৃত–মুহাম্মদ আজাহারউদ্দিন, এম. এ.

টীকা ঃ ১ . হাদিসের আলো ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮। কৃত–পূর্বে বর্ণিত।

www.pathagar.com

"যে নিজের কাজ সম্বন্ধে লজ্জিত সে কখনও আত্মমর্যাদা লাভ করতে পারে না।"[২]

লজ্জা শ্রম হতে মানুষকে বিমুখ করে। কে কি বলবে এই লজ্জায় অনেকেই অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্যও সম্পাদন করে না।

এ চরিত্র অন্য দেশের মানুষের মধ্যে কেমন জানি না, তবে বাংলাদেশের মানুষের মাঝে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সামান্য একটু লেখাপড়া শিখেই মস্তবড় একজন বাবু সেজে বসে। তারা নিজের চেয়ারটাও নিজে টেনে বসতে লজ্জা পায়। কাপড়ে বা টেবিলে এক ইঞ্চি ময়লা হলেও নিজ হাতে পরিষ্কার করাকে অপমানজনক বলে ভাবে। শিক্ষার অহমিকা, পদমর্যাদার অভিমান, ধনের গর্ব, আভিজাত্যের নিছক অহঙ্কার নিত্য প্রয়োজনীয় শ্রম হতেও এ বাঙালী জাতিকে বিমুখ রাখে। এ স্বভাবের পরিবর্তন যতদিন না হবে ততদিন এরা কিছুতেই উন্নতি করতে পারবে না।

রাষ্ট্রীয় জীবনে, ধর্মীয় জীবনে, সামাজিক জীবনে ও পারিবারিক জীবনে শ্রম অপরিহার্য। শ্রমহীন জীবন অসাড় ও পঙ্গু।

মিল ফ্যাক্টরি, কলকারখানা, অফিস-আদালত প্রভৃতি যেগুলির ওপর রাষ্ট্র নির্ভরশীল তার শ্রমিকগণ যদি অলস ও নিষ্কর্মা হয় তবে সে রাষ্ট্রের পতন অনিবার্য। রাজ্যশাসক যদি অলস ও নিষ্কর্মা হয় তবে সে রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। কৃষক যদি সময় মতো বীজ বপন না করে, রোদ-বাদলের দিনে যদি তারা পরিশ্রম না করে শুয়ে বসে কাটায়, তবে সারা বছর ক্ষুধার কঠোর জ্বালাই তাকে সহ্য করতে হয়। আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় বলেই জয়ের টীকা কপালে পরে।

শ্রমকে নিয়েই ধর্ম। কঠিন তপস্যাকে নিয়েই সাধক। সাধনাকে অবলম্বন করে যাঁরা মহাপুরুষ হয়েছেন তাঁরাই স্ব স্ব ধর্ম প্রচার করে অমর হয়েছেন। কেউ একটানা ভাবে বারো বছর, কেউ পঁচিশ বছর, কেউবা সারা জীবন ধরে সাধনা ও উপাসনার মাঝে মঙ্গলময় আল্লাহর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। সাধনা ছাড়া আল্লাহ্‌কে মেলে না। কোরআন এর সাক্ষ্য দেয়ঃ

"হে মানব! নিশ্চয় তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে কঠোর সাধনায় সাধন কর–তবে তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিবে।"

(সূরা এনশেকাফ, আয়াত ৬)

মহাপুরুষদের মতো এই দুনিয়ায় যারা যত বেশি পরিশ্রম করে আল্লাহর পথে কাজ করবে পরজগতে তারা ততই আরাম-আয়েশ ভোগ করবে। এ কথার সঙ্গে পার্থিব জীবনের যে কোন সম্পর্ক নেই তা নয়। ছোট বেলায় যারা কঠোর পরিশ্রম করে পাঠ্যাভ্যাস করে উত্তরকালে তারাই আরাম-আয়েশ ভোগ করে। একই ক্লাসের ছাত্র–একজন আহার, নিদ্রার বিনিময়ে পরিশ্রম করে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে আর একজন ভোগবিলাস ও খেলাধূলার মোহে পড়ে অকৃতকার্য হয়। শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে, মশার উৎপাত সহ্য করে আত্মা ও মনকে যারা কষ্ট দিয়ে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করে তারাই উত্তরকালে জজ, ব্যারিস্টার, প্রফেসার, বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রনায়ক হয়ে দেশ ও জাতির গৌরব অর্জন করে। এ কৃতিত্বের মূলে থাকে তাদের একনিষ্ঠ সাধনা ও শ্রম। শৈশব জীবনকে দুনিয়ার কর্মের সঙ্গে তুলনা করলে মহাপুরুষদের এ বাক্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়। হজরতের বাণী তার সাক্ষ্য দেয়ঃ

"এ জীবন শুধু পরকালের ক্ষেত্রস্বরূপ। অতএব ইহলোকে সৎকার্য বপন কর যাহাতে পরলোকে পুণ্যের ফসল কাটিতে পার। আর চেষ্টা কর খোদার আদেশ এবং তিনি যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন চেষ্টা দ্বারাই তাহা লাভ করা যায়।"

(সগির, সংগৃহীত হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮)

---

২. সংগৃহীত-রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

www.pathagar.com

শ্রম

"যে ব্যক্তি নিজেকে পরমুখাপেক্ষী না করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা প্রতিবেশী ও আত্মীয় -স্বজনকে সাহায্য ও উপকার করিবার মানসে হালাল জীবিকা অর্জন করে কিয়ামতের দিন তাহার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার দীপ্তিমান চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হইবে।"[১]

"সৎ ব্যবসায়িগণ কিয়ামত দিবসে সিদ্দিক শ্রেণীর বুযর্গ এবং ধর্মযুদ্ধে নিহত শহীদবৃন্দের দলে উত্থিত হইবেন।"[২]

নবী, পয়গম্বর, জ্ঞানী মহাজ্ঞানীরা কোনদিনই অলস ও অকর্মণ্য মানুষকে ভালবাসেন নি। মন্দির-মসজিদে বসে বসে শুধু আল্লাহর ধ্যান করতেও বলেন নি। কর্মই জীবন। কর্মই ধর্ম। কর্মই এবাদত। কর্মের ওপরই নির্ভর করে সুখ, শান্তি, ইহকাল ও পরকাল। এ প্রসঙ্গে মহামনীষীদের দু-একটি বাণীর উদ্বৃতি দিচ্ছি–

একদা হজরত ঈসা (আঃ) এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কাজ কর?" প্রতি উত্তরে লোকটি জবাব দিল "আমি এবাদত করি।"

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তোমার আহার কোথা হইতে সংগ্রহ কর?' লোকটি উত্তর দিল, "আমার ভ্রাতা আমার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।" হজরত ঈসা (আঃ) বললেন, "তোমার ভ্রাতা তো তোমা অপেক্ষা অধিক আবেদ অর্থাৎ এবাদতকারী।"[৩]

স্বীয় কর্তব্য পালনে তৎপর হতে, হালাল রুজি-রোজগার করতে, অলস ও অকর্মণ্য হয়ে ঘরে বসে না থাকতে হজরত ওমরের নির্দেশ ছিল আরও কঠোর। তিনি বলেছেন ঃ

"উপার্জন ত্যাগ করিও না। 'আল্লাহ্ জীবিকা প্রদান করিবেন' –এই বলিয়া অকর্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিও না। কেননা যদিও আল্লাহর ক্ষমতা রহিয়াছে তথাপি তিনি আসমান হইতে তোমাদের জীবিকার জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য নিক্ষেপ করিবেন না। বরং তাঁহার নীতি এই যে, কোন অছিলায় তিনি তোমাদের জীবিকা প্রদান করিয়া থাকেন।"

মহামনীষী লোকমান হাকিম তাঁর স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন– "বৎস! উপার্জন ছাড়িও না। যে ব্যক্তি অর্থাভাবে পরমুখাপেক্ষী হয় তাহার ধর্ম সঙ্কীর্ণ, বুদ্ধি দুর্বল এবং তাহার মানবতা বিনষ্ট হয়। মানুষ তাহাকে ঘৃণার চোখে দেখিতে থাকে।"

আল্লাহ্ নিজ হাতে মুখে আহার তুলে দেবেন এরূপ ধারনা যারা করে তার নিতান্তই নির্বোধ। নিজের ও পরিবার-পরিজনের আহারের সংস্থান নিজ হাতে যারা না করে তারা শুধু নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনে না, বংশধরদের জন্যও অভিশাপ নিয়ে আসে।

আমাদের রাষ্ট্রনেতা, ধর্মনেতা, সমাজনেতা, শিক্ষক ও মণীষীদের অনেকেই অনেক গুরুত্বর্ণ ভাষণ দেন, পরিশ্রম করতে, সর্বশক্তি নিয়োগের পরামর্শ দেন। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও উক্তি লিখিত হয় সত্য কথা, কিন্তু কথা ও কাজের সঙ্গে মিল হয় না বলে জাতির জন্য কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয় না। এজন্যই পরবর্তী সময়ে সে সব উক্তি সমালোচনার সম্মুখীন হয়। মহামনষীদের কথা ও কাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল থাকে। তাঁদের থিওরী ও প্র্যাকটিসে গরমিল হয় না। এজন্যই তাঁদের থিওরী স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে। হজরত মুহাম্মদের Theory ও Practice -এ কেমন মিল ছিল নিম্নোক্ত ঘটনা তাঁর সাক্ষ্য বহন করে।

এক ঃ হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যখন মক্কা হতে মদিনা আগমন করেন তখন তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা। তাঁর সহচরবৃন্দ সবাই মিলে যখন এ কাজ আরম্ভ করলেন, তখন হজরত শুধু প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে চুপ করে বসে রইলেন না বা তার কল্পনা তুলে ধরেই ক্ষান্ত হলেন না। পরিশ্রম করে কত বৃহত্তর কার্য সম্পাদন করা যায়–একত্রিত হয়ে কাজ করলে অল্প পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে কত সুন্দরভাবে তা সমাধা করা যায় তিনি প্রত্যক্ষভাবেই তা দেখালেন। মর্যাদা, সম্মান, অহঙ্কার ও গৌরবকে তুচ্ছজ্ঞান করে একজন সাধারণ মানুষের বেশে কাজ করার মাঝে তিনি যে স্পৃহা ও জ্ঞানদান করলেন তা চিরদিন

টীকা ঃ ১ –২. হাদিস। সংগৃহীত কিমিয়ায়ে সা'আদত ৪র্থ খণ্ড। পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫।
টীকা ঃ ৩. হাদিস! সংগৃহীত কিমিয়ায়ে সা'আদত ৪র্থ খণ্ড। পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫

www.pathagar.com

ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে অলংকৃত করবে। একজন নবী হয়ে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হয়ে তিনি ইটের বোঝা মাথায় করে সাধারণ কুলি-মজুরের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করেন। সাহাবীরা অবাক হয়ে হজরতকে বলতেন–

"হজরত আপনি আল্লাহর নবী হয়ে কেন এত পরিশ্রম করেন। আমরা কিসের জন্য আছি? আপনি বিশ্রাম করুন।"

হজরত হাসি মুখে তাঁদের কথার জবাব দিতেন কিন্তু কোনদিনই পরিশ্রম বন্ধ করেন নি। কেননা তিনি জানতেন যে তিনি পরিশ্রম না করলেও এ কাজ সমাধা হবে তবুও করেছেন এজন্যই যে পরবর্তী বংশধরেরা যেন পরিশ্রমকে অবজ্ঞা না করে। পরিশ্রমের অভাবে যেন মুসলমান জাতি ধ্বংস না হয়ে যায়। অলস অকর্মণ্য হয়ে যেন ভিক্ষার ঝুলি এদের হাতে না পড়ে। নিজে পরিশ্রম না করে শুধু বড় বড় বুলি আওড়িয়ে যেন এরা রাষ্ট্রকে অন্যের হাতে তুলে না দেয়।

দুই ঃ একদা হজরত তার সহচরদের নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে এক জায়গায় তাঁবু নির্মাণ করে আশ্রয় নিলেন। এরপর সকলে মিলে রান্নার যোগাড় করলেন এবং প্রত্যেকের কাজ নির্দিষ্ট করে ভাগ করলেন। হজরত তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাকে কি কাজের ভার দিলেন?"

সকলে সমস্বরে বিনীতভাবে বললেন, "হুজুর আপনি আল্লাহর রসুল। আপনাকে কোন কাজ করতে হবে না।"

হজরত প্রতি উত্তরে বললেন, "যে ব্যক্তি নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে বিনা কাজে আপন লোকজনদের মধ্যে বসে থাকে আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন না। –আমি কাঠ সংগ্রহের ভার নিলাম।"

এরপর তিনি জঙ্গলে ঢুকলেন এবং কাঠ কেটে মাথায় বহন করে ফিরে এলেন।

এটাই ছিল হজরতের স্বভাব। এটাই ছিল তাঁর Theory ও Practice. যিনি Theory ও Practice এক হাতে নিয়ে আসেন তিনিই কি প্রকৃত বিজ্ঞানী নন?

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) শ্রমের মর্যাদা যেমন দেখিয়েছেন শ্রমিকের স্বার্থও দেখিয়েছেন। শ্রমিকশ্রেণী সাধারণত অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। শ্রমের পারিশ্রমিক তারা প্রায়ই ঠিকতম বুঝে পায় না। স্বার্থান্বেষী ধনী গোষ্ঠী বা মালিক সম্প্রদায় শ্রমিকের শ্রমে সুরম্য অট্টালিকা গড়ে তোলে, বিলাসের উপকরণ জুগিয়ে নেয়। তাদের রক্তের বিনিময়ে আরাম-আয়েসে দিন কাটায় অথচ শ্রমিকের পারিশ্রমিক বুঝিয়া দেয় না। শুধু তাই নয়–এ দুঃখী মজুরশ্রেণী এদের হাতে আবার নিষ্পেষিত হয়ে মার খায়। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে শ্রমের মর্যাদা তো পায় না, শ্রমলব্ধ পারিশ্রমিকের জন্যও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। এ শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে হজরত মালিকশ্রেণীকে নিম্নোক্ত আদেশ দিয়েছেন–"মজুরকে তার ঘাম শুকাইবার পূর্বেই প্রাপ্য দান কর।"[১]

অন্যত্র বলেছেন,

"আল্লাহ্ বলেন, রোজ কিয়ামতে আমি তিন ব্যক্তির শত্রু হইবে–

(১) যে আমার নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন করে না। (২) যে স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিয়া নিজে তাহার মূল্য আত্মসাৎ করে। (৩) যে ব্যক্তি মজুরকে কার্যে নিযুক্ত করিয়া তাহার প্রাপ্য দান করে না, যখন সে তাহা সমাধা করে।[২]

(সহীহ বুখারী)

টীকা ঃ ১. হাদিসের আলো। ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা -৬১

২. সহীহ বুখারী। কৃত– পূর্বে বর্ণিত।

www.pathagar.com

সাধনালব্ধ জ্ঞান বা ধন চেষ্টারই ফলশ্রুতি। বহু শতাব্দী হতে মানুষ চাঁদে যাবারা কল্পনা করত এবং বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিকগণ আকাশে পাড়ি জমাবার চেষ্টায় রাত-দিন কাটাতেন। তাঁদের যুগ যুগের এ সাধনা ব্যর্থ হয় নি। চাঁদে অভিযান করে মানুষ প্রমাণ করেছে। কোরআনের নিম্নোক্ত বাণী যেখানে শ্রমের অপিরসীম সফলতা ঘোষণা করা হয়েছে।

"আল্ লায়সা লেল্ ইন্সানে ইল্লা মা' সায়া।"[২] (৫৩ ঃ ৩৯)

অর্থাৎ, "এতদব্যতীত এমন কোন কিছুই নাই যার জন্য মানুষ চেষ্টা করে না।"

কোরআনের এ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা মানুষকে সচেতন করেছে, উদ্দীপিত করেছে ও অনুপ্রাণিত করেছে। তাই আজ তারা দেশ হতে দেশান্তরে, গ্রহ হতে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণ করছে ও আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি বৈচিত্র্য দেখে হতবাক হচ্ছে।

প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই শ্রমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাইবেলের একটি অতি সুন্দর উপমা এ বিষয়ে তুলে ধরছি। বাণীটি জ্ঞানী ও দার্শনিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে এর উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"হে অলস, তুমি পিপীলিকার কাছে যাও। তাহার ক্রিয়াসকল দেখিয়া জ্ঞানবান হও। তাহার বিচারকর্তা কেহ নাই। শাসনকর্তা কি অধ্যক্ষ কেহ নাই। তবু সে গ্রীষ্মকালে আপন খাদ্য সংগ্রহ করে। শস্য কাটিবার সময়ে ভক্ষ্য সঞ্চয় করে। হে অলস তুমি কতকাল শুইয়া থাকিবে? কখন নিদ্রা হইতে উঠিবে? আর একটু নিদ্রা, আর একটু তন্দ্রা, আর একটু শুইয়া হস্ত জড়সড় করিবে। তাই তোমার দরিদ্রতা দস্যুর ন্যায় আসিবে, তোমার দৈন্যদশা ঢালীর ন্যায় আসিবে।"

[বাইবেল–তৌরাত। হিতোপদেশ পরিচ্ছেদ। ৬/৬-১১।

সত্যবাদিতা

"সত্যকথা আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়।"[১]

হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জবিনচরিত যারা আলোচনা করেছেন তাঁরা জানেন যে হজরত জীবনে কোনদিন মিথ্যা কথা বলেন নি এবং বলতেও উপদেশ দেন নি। এমনকি সাধারণভাবে আমরা যে সব কথা বলে থাকি যা মিথ্যার মধ্যে পড়ে না বলে মনে করি তেমন কথাও তিনি বলতে নিষেধ করেছেন। এ সম্বন্ধে ছোট একটা গল্প বলে তাঁর বাণীর উদ্বৃতি দিচ্ছি।

একদা মহানবীর সম্মুখে কয়েকজন মহিলা উপস্থিত হয়। এ সময়ে হজরতের নিকট কিছু খাদ্যদ্রব্য রাখা হয়। তিনি মহিলাদের উক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন কিন্তু মহিলারা স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলে আমাদের ক্ষুধা নেই। হজরত তখন বলেন ঃ

"হে রমণীগণ! ক্ষুধার সহিত মিথ্যাকে মিশ্রিত করিও না।"[২] (মিশকাত)

এ ধরনের কথা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই প্রায় বলে থাকে। এমন কথায় যে পাপ হবে তা আমরা মোটেই ভাবিতে পারি নি। অথচ এমন ধরনের কথা বলতেও হজরত নিষেধ করেছেন। সামান্য মিথ্যা যে উত্তরকালে মহামিথ্যার রূপ নেবে না তা বলা যায় না। তাই তিনি মিথ্যারূপ কোন বাক্যই বলতে নিষেধ করেছেন।

শৈশবকালেই তিনি 'আল-আমিন' বা সত্যবাদী উপাধি পেয়ে-ছিলেন। তাঁর সত্যবাদিতার খ্যাতি যখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন সবাই তাঁহাকে অন্তর থেকে স্নেহ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করতে শেখে। তাঁর সত্যবাদিতাই তাঁর জীবনে এনে দিয়েছিল চরম সার্থকতা। তিনি জানতেন মিথ্যাই সকল অনর্থের মূল। ঝগড়া-বিবাদ, হানা-হানি, খুনো-খুনি

---

২. কোরআন। সূরা নজম। আয়াত – ৩৯।

www.pathagar.com

সব মিথ্যা হতেই শুরু হয়। এ মিথ্যাকে ধ্বংস করতে না পারলে, মিথ্যার মূলোৎপাটন করতে না পারলে সবল ও সুন্দর সমাজ গঠন করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ভয় শেখানোও সম্ভব নয়। তাই ঘোষণা করলেন, "মিথ্যাবলা মহাপাপ।"[১]

"মিথ্যা বাক্য হতে সতর্ক হও। কারণ উহা ঈমানকে কলুষিত করে।" (সগির)

একটি মিথ্যাকে হাজারো মিথ্যা দিয়েও ঢাকা যায় না। মিথ্যা প্রকাশিত হবেই হবে। প্রকাশিত হলে মিথ্যার মাশুল তাকে দিতেই হবে। মিথ্যাবাদী লাঞ্ছিক, অপমানিত ও ঘৃণিত হয় কিন্তু সত্যবাদী প্রশংনীয়, সম্মানী ও আদরণীয় হয়। সত্যকথা যদিও অনেক সময় অপ্রিয় হয় তবুও নিন্দনীয় হয় না। হজরত বলেছেন, "আমি সাদিক ও মকসুদ।"[২]

'সাদিক' অর্থ সত্যবাদী আর 'মকসুদ' অর্থ যার সত্যবাদিতা সর্ববাদিসম্মত। সত্যের বাণী প্রচার করতে, সত্যের পথ দেখাতে ও সত্যকে অবলম্বন করতেই এসেছিলেন সত্যের বাহক হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। মিথ্যা ছাড়া যারা সত্য জানত না, মিথ্যাই ছিল যাদের সম্বল –সেই মিথ্যার মূলোৎপাটন করে তিনি যুগ যুগের জন্য অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর বিধান যদি মানুষ মেনে চলত তাহলে তারা এ পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে পারত। ভয়-ভীতি ও নিন্দার ভয় তিনি করেন নি। সত্য প্রচারে লোভ-লালসাও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একবার কাফেরদের সর্দার ওৎবা অলিদ হজরতকে বলে,

"হে মুহাম্মদ! কোন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে তুমি আমাদের জাতীয় ধর্মের বিনাশ করছ? যদি রাজৈশ্বর্যে লোভ থাকে তবে বল তোমাকে আমরা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বর করছি। আর যদি ধন-রত্নের অভিলাসী হও তবে সমগ্র রাজ্যের কোষাগার তোমার হাতে অর্পণ করছি।" হজরত প্রতি-উত্তরে বলেন,

"যদি আমার দক্ষিণ হস্তে চন্দ্র আর বাম হস্তে সূর্য এনে দাও তবুও আমার সঙ্কল্প হতে বিচ্যুত হবা না।" (স্বর্গের জ্যোতি হতে উদ্ধৃত)

সত্যের বাণী প্রচারে এমন দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর নিম্নোক্ত হাদিসটি এ কথার সাক্ষ্য দেয় ঃ

"আমরা যেখানেই থাকি না কেন সত্যের উপর দাঁড়াইব খোদার ব্যাপারে–নিন্দুকের ভয় করে নয়।"[১]

"সত্যবাদিতা চালিত করে পুণ্য কাজের দিকে এবং পুণ্য কাজ চালিত করে বেহেশ্তের দিকে; আর মানুষ সত্য বলিতে বলিতে হয় পরম সত্যবাদী, এবং মিথ্যাবাদিতা চালিত করে পাপ কাজের দিকে, এবং মানুষ মিথ্যা বলিতে বলিতে খোদার কাছে লিখিত হয় চরম মিথ্যাবাদীরূপে।"[২]

সত্যবাদী ছাড়া সৎ কাজ হয় না। সৎ কাজ না করলে সমাজ উপকৃত হয় না। সমাজ উপকৃত না হলেই বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, অরাজকতা, অবৈধতা ও ব্যভিচারে ভরে ওঠে সমগ্র দেশ। এজন্যই দরকার সত্য প্রতিষ্ঠা।

ইহকালের জন্য যেমন সত্য কথার প্রয়োজন রয়েছে, পরকালের জন্যও তেমনি প্রয়োজন রয়েছে। কেননা সত্য কথা পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্যের মাঝেই বেহেশ্ত রচিত হয়। প্রতিটি ধর্মের মনীষী একথা স্বীকার করেন।

টীকা ঃ ১. সগির–সংগৃহীত, হাদিসের আলো, পৃষ্ঠা–৮০। ২য় খণ্ড। কৃত–পূর্বে বর্ণিত।

টীকা ২. সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা ২৯৬ এবং শিষ্টাচার পরিচ্ছেদ। তর্জমা-আবদুর রহমান খাঁ।

টীকা ঃ ১. সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা ২৯৬ এবং ৪৩১ শিষ্টাচার পরিচ্ছেদ।

তর্জমা–আবদুর রহমান খাঁ।

২. সগির–সংগৃহীত হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড। সহিষ্ণুতা পরিচ্ছেদ।

www.pathagar.com

"দয়া ও সত্য তোমাকে ত্যাগ না করুক্। তুমি তদুভয় তোমার কণ্ঠদেশে বাঁধিয়া রাখ। তোমার হৃদয়ফলকে লিখিয়া রাখ। তাহা করিলে অনুগ্রহ ও সুবুদ্ধি পাইবে। ঈশ্বরকেও মনুষ্যের দৃষ্টিতে পাইবে।" (বাইবেল হিতোপদেশ ৩/৩-৪)

সত্যের পথে চিন্তা করা, সত্যের পথে চলা, সত্য কথা বলা ও সত্যের জন্য সংগ্রাম করাই সত্যবাদিতা। সত্যবাদীর হৃদয় প্রশস্ত হয়; সে নির্ভীক ও দয়ালু হয়। দেশের, সমাজের ও পরিবারের সে গৌরব হয়।

সহিষ্ণুতা

"সহিষ্ণুতাই সন্তুষ্টির চাবি।" [১] (সগির)

এ মহামূল্যবান বাণীটি সমাজ বিজ্ঞানী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর। আপদে-বিপদে, দুঃখে-দৈন্যে যারা ধৈর্য ধারণ করতে পারে তারাই জীবনের সর্বস্তরে উন্নতি সাধন করে। যারা ধৈর্য ধরতে অক্ষম তারাই প্রকৃতপক্ষে ভীরু ও কাপুরুষ। মহামনীষীদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় কত ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁরা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেছেন ও সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে মানব সমাজকে প্রেরণা দিয়েছেন। কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে হজরত আইয়ুব (আঃ) আঠারো বছর পর্যন্ত অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন তবুও আল্লাহর কাছে নিরাময়ের জন্য একদিনও প্রার্থনা করেন নি। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন তবুও নমরুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য আল্লাহর নিকট হাত তোলেন নি। ফেরাউনের অত্যাচারে হজরত মুসা (আঃ) তাঁহার দলবলসহ দেশত্যাগ করেছেন, তবুও ফেরাউনকে তিনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা-বলে পাথরে রূপান্তরিত করেন নি। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) জীবনের শুরু থেকেই কাফেরদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠেছিলেন, প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদিনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, ওহোদের যুদ্ধে শত্রুহস্তে আহত হয়েছিলেন তবুও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেন নি বরং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন,

"হে আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা কর। কারণ তারা অজ্ঞান, কিছুই বুঝে না।" (সংগৃহীত–হজরতের জীবনচরিত)

ক্ষুধার কঠোর জ্বালায় তিনি পেটে পাথর বেঁধে কাটাতেন তবুও অধৈর্য হন নি। পুত্রশোকে বিচলিত হয়েও মনঃক্ষুণ্ন হন নি। যে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা মেলে না। প্রথম জীবনে যখন তিনি তৌহিদের বাণী প্রচার করেন তখন লোকে তাকে শুধু ঠাট্টা–বিদ্রূপই করত না, পাগল বলে ডাকত এবং হাততালি দিত। তবুও কারোর ওপর রাগ করেন নি।

মানুষের যত প্রকার গুণ আছে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। ধৈর্য ধারণ যদিও কঠিন তবুও একে অবলম্বন করা ছাড়া উন্নতি অসম্ভব। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে, " Patience is bitter but its fruit is sweet" অর্থাৎ ধৈর্য বড় তিক্ত কিন্তু ইহার ফল মধুর।

এ সম্বন্ধে আল্লাহর নির্দেশ নিম্নরূপ ঃ

"নিশ্চয়ই ধৈর্যশীল–কেবলমাত্র তাহারাই অগণিতভাবে পূর্ণ প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে।"[১]

"যাহারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল তাহারাই সত্যপরায়ণ এবং তাহারাই ধর্মভীরু।"[২] (২ ঃ ১৭৭)

টীকা ঃ ১. সগির–সংগৃহীত হাদিসের আলো। ২য় খণ্ড। সহিষ্ণুতা পরিচ্ছেদ।

টীকা ঃ ১. কোরআন। সূরা জোমর, আয়াত ১০।

২ –৩. " " বাকারাহ, " ১৭৭ ও ১৯৪।

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গী।"৩ (২-১৯৪)

"এবং যদি তোমরা বিশ্বাসস্থাপন কর ও সংযমী হও তবে তোমাদের জন্য মহান প্রতিদান রহিয়াছে।"৪ (৩ ঃ ১৭৯)

ধৈর্যশীলদের জন্য এরূপ অসংখ্য বাণী কোরআনে আছে। এ বাণী ইহকাল ও পরকালের জন্য সত্য।

মহাজ্ঞানী, মহাপুরুষ ও পয়গম্বদের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের কাহিনী শুনলে অবাক হতে হয়। হজরত ওয়ায়েস করনী (রাঃ)-কে যখন ছেলেরা পাথর মারত তখন তিনি বলতেন, হে বৎসগণ! ছোট ছোট পাথর মার। বড় পাথর মেরে আমার পা ভেঙে দিলে নামাজ পড়তে পারব না।" (কিমিয়ায়ে সা'আদত)

সহিষ্ণুতার গল্প বললে বিরাট আকারের বই হয়ে যায়। যে নবী আমাদের সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে এত মূল্যবান তত্ত্ব দিয়েছেন তাঁহার জীবনের একটি কাহিনী উল্লেখ করছি।

কোন এক ইহুদী বালক হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে জানায় যে তার পিতা তাকে খাবার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। রসুল তাঁর সাহাবীগণসহ সেখানে গেলেন কিন্তু বালকের পিতা তাঁকে বলল, "কই আমি ত আপনাকে দাওয়াত করি নাই।" হজরত বিনা বাক্য ব্যয়ে ফিরে এলেন। পরদিন বালকটি আবার হজরতকে দাওয়াত করল। এবারেও হজরত বিশ্বাস করে সাহাবীগণসহ ইহুদির বাড়িতে গেলেন, কিন্তু বালকটির পিতা পূর্বদিনের মতোই উত্তর দিল। হজরত বিরক্ত না হয়ে ফিরে এলেন। তৃতীয় দিন ঐ বালকটি হজরতকে আবার দাওয়াত করল। হজরত তার বাড়িতে গেলেন। বালকটির পিতা হজরতকে উপহাস করতে ও লাঞ্ছিত করতে উটের রক্ত হজরত ও তাঁর সাহাবীদের ওপর ছিটিয়ে দিল। হজরত কোন কথা বললেন না বা রাগ করলেন না। সাহাবীগণসহ গৃহে ফিরে এলেন। চতুর্থ দিন বালকটি হজরতকে আবার দাওয়াত করতে আসলে হজরত ওমর গর্জে উঠে বললেন, "একটি সামান্য বালক আল্লাহর নবীকে এভাবে অপমান করবে আর আমরা চুপ করে থাকব?"

ওমরের কথায় হজরত হাসতে লাগলেন। এবারও হজরত সাহাবীগণসহ ইহুদির বাড়িতে গেলেন। হজরত তার বাড়িতে পৌছে দেখলেন যে জনৈক ইহুদি হজরতের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে এবং বাড়িটি সুন্দরভাবে সাজিয়ে বিছানাপত্র তৈরি করে রেখেছে। ঘর হতেও খুশবু বের হচ্ছে। বালকের পিতা ইহুদি হজরত ও তাঁর সাহাবীদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং বসতে দিলেন। এরপর সে তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সবাইকে নিয়ে হজরতের পদতলে লুটিয়ে পড়ল এবং বলল, "হে আল্লাহর নবী, আমাকে মাফ করুন। আমাকে ও আমার পরিজনকে পবিত্র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দিন। আমাদের ধর্মপুস্তকে আছে যিনি শত অত্যাচার ও অপমান সত্ত্বেও রাগ করবেন না তিনিই সেই শেষ সত্য নবী।" এই বলে ইহুদি লোকটি পরিজনসহ ইসলাম গ্রহণ করল।

সহিষ্ণুতার এমন উজ্জ্বল নিদর্শন দেখিয়েছেন হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। যে থিওরী তিনি দিয়ে গেছেন নিজ জীবনে তা বার বার প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করেই দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিকগণ থিওরী দিয়ে ক্ষান্ত হন না। প্রমাণ করে তার যথার্থতা নিজ হস্তে বিচার করেন। যখন খাঁটি বলে প্রমাণিত হয় তখনই শুধু মানব সমাজের জন্য তুলে ধরেন। বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)-ও ঠিক তাই করেছেন। এর ব্যতিক্রম করেন নি।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে দেখতে পাই যারা ধৈর্য ধারণ করে শৈশবকাল থেকে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি বা সংসার-জীবন পালন করে আসে তারাই উত্তরকালে যশ, খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করে ধন্য হয়। রোদ-বাদল, শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে চাষীরা মাঠে কাজ করে বলেই সোনার ফসল ফলে, যা খেয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে কোটি কোটি জীব। কামার-

---

৪. " " আল এমরান, " ১৭৯-এর শেষ অংশ।

www.pathagar.com

কুলি, শ্রমিক-মজুর, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তারা যদি মান-অপমান ভুলে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে কর্তব্য পালন না করত তাহলে এ সমাজ পঙ্গু হয়ে যেত। কথায় কথায় যদি একে অপরের গলায় ছুরি দিত, সহিষ্ণুতার পরিচয় না দিয়ে যদি ছেলেরা বিদ্যাশিক্ষা না করত, সাধক যদি ক্ষুধার জ্বালা সহ্য না করে সাধনা ত্যাগ করত তাহলে তারা কিছুতেই সফলকাম হতে পারত না। সহিষ্ণুতা শান্তি আনে, শৃঙ্খলা আনে, অপার আনন্দ ও সুখ আনে। এজন্যই হজরত মুহাম্মদ (দঃ) সহিষ্ণুতার ওপর এত জোর দিয়েছেন। এবং নিজে সহিষ্ণুতার অসাধারন নিদর্শন ও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"পার্থিব বিষয়ে সংযম আত্মা ও দেহের সৌরভ বৃদ্ধি করে এবং পার্থিব বিষয়ের মোহ দুঃখ ও বিপদ বৃদ্ধি করে।"[১] (সগির)

"শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংযম।"[২] (সগির)

"সেই ব্যক্তিই সুখী যে খোদার বাধ্য হয় এবং তাহার জীবিকাকে যথেষ্ট মনে করে এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে।'[৩] (সগির)

"ধৈর্যশীল ব্যক্তিই ইহকাল ও পরকালের নেতা।"[৪] (মুসলিম)

"মুমেনদের মধ্যে যাঁহারা সংযমী তাঁহারাই উৎকৃষ্ট এবং যাহারা লোভী তাহারাই নিকৃষ্ট।"[৫] (সহীহ, বুখারী)

হজরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, "তোমরা মন্দের প্রতিরোধ করিও না বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে অন্যটিও তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও। আর যে তোমার নামে মামলা করিয়া তোমার জামা লইতে চায় তাহাকে চাদর লইতে দাও। আর যে কেহ তোমাকে ধরিয়া এক ক্রোশ যাইতে বাধ্য করে তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও। যে তোমার কাছে চায় তাহাকে দাও। আর যে তোমার নিকটে ধার চায় তাহার প্রতি বিমুখ হইও না।" (বাইবেল, মথি ৫। ৩৯-৪২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন ঃ

"কামারের নাইয়ের উপর কত আঘাত পড়ে অথচ সে যেমন তেমনি থাকে। মানুষের ঐ রকম সহ্যগুণ হওয়া উচিত।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, লিখিত সুরেশচন্দ্র দাস। পৃষ্ঠা ৫৯৫)

আত্মনির্ভরতা

"মানুষের সাহায্য হতে বিরত হও যদিও উহা দন্ত মার্জনের কাঠিও হয়।"(হাদিসের আলো–ভিক্ষাবৃত্তি পরিচ্ছেদ)

এ মহাবাণী সমাজবিজ্ঞানী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর। অলস, কাপুরুষ, ভীরু ও লোভী ব্যক্তিরা নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে না। পরমুখাপেক্ষী হয়ে কাটায়। বিনা পরিশ্রমে, বিনা আয়াশে অন্যের দ্রব্য কিভাবে আত্মসাৎ করা যায়–এ চিন্তাতেই তারা মত্ত থাকে। যাদের এ স্বভাব তারা কোনদিন জীবনে উন্নতি করতে পারে না। ইংরাজিতে একটা কথা আছে, **"Allah helps those who help themselves"** অর্থাৎ "যারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করে, আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করেন।" কোরআনেও একথা পরিষ্কার বলা আছে।

আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই এরা প্রতিটি স্বাবলম্বী। পা হাতের ওপর নির্ভরশীল নয়, চক্ষু কর্ণের ওপর নির্ভরশীল নয়, নাক জিহ্বার ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যক্ষ স্বয়ং সম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল। যার যে কাজ অন্যের ওপর ভরসা না করে সে তা পালন করে যাচ্ছে। এ মহাবিশ্বের দিকে তাকালেও

টীকা ঃ ১ –৫, সংগৃহীত –হাদিসের আলো। কৃত–পূর্বে বর্ণিত।

www.pathagar.com

ঠিক তাই দেখা যায়। চন্দ্র তার আপন কক্ষসমূহে পরিভ্রমণ করছে। সূর্য তার নির্দিষ্ট গতিতে অবিরামভাবে ঘুরছে। গ্রহ-নক্ষত্র স্ব স্ব কর্তব্য পালন করে সৃষ্টিকর্তার বাধ্যতা প্রমাণ করছে। মেঘ বারি বর্ষণ করছে। বৃক্ষরাজি ফলদান করছে। তৃণলতা ও উদ্ভিদ খাদ্যদান করছে কেউ কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেউ কারো ওপর নির্ভরশীল নয়। নিজ নিজ কার্য সম্পাদনে প্রতিটি সৃষ্টিই ব্যস্ত।

শিশু নিজ পায়ের ওপর দাঁড়াতে শেখে; তাই হাঁটতে ও দৌড়াতে পারে। সাঁতার শিখতে নিজেকেই বার বার জলে নেমে শিখতে হয়। অন্যের শিক্ষা নিজের কোন উপকারে আসে না। নিজে কষ্ট করে লেখা-পড়া না শিখলে অন্য কাউকে টাকা-পয়সা দিয়ে জ্ঞানার্জন করা যায় না। নিজে ভাত না খেলে অন্যের উদর ভর্তিতে যেমন ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, তেমনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হয়ে উন্নতি না করলে উন্নতি হয় না। যাঁরা এ বিশ্বের বুকে অমর হয়ে বেঁচে থাকেন তাঁরা নিজের চেষ্টাতেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্যের সাহায্যকে তাঁরা মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন। হজরত নিজেই এর প্রকৃত উদাহরণ।

নিজের জীবন দিয়ে তিনি এটা প্রমাণ করলেন আর পঙ্কিল সলিলে নিমজ্জমান মানব সমাজকে হাত ধরে টেনে তুলে সম্মানের উচ্চতর শিখরে সমাসীন করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্কবাণী দিলেন,

"নিশ্চয় তোমাদের যে কোন লোকের পক্ষে ভিক্ষা করার চেয়ে– সে উহা প্রাপ্ত হউক বা না হউক – একগাছি রশি এবং এক বোঝা কাষ্ঠ নিজের পৃষ্ঠে বহন করিয়া এবং তাহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা উত্তম। কারণ ইহাতে আল্লাহ্ তোমাদের সম্মান রক্ষা করিবেন।" (সহীহ্ বুখরী)

উপর্যুক্ত বাণী হতে বোঝা যায় যে আত্মনির্ভরতার মর্যাদা কত অধিক। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে।

একদা আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি হজরতের নিকট উপস্থিত হয়ে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। হজরত বললেন, "তোমার গৃহে কী কিছু আছে?" সে বলল, "হ্যাঁ, একখানি চাদর আছে। যাহার কিয়দংশ দ্বারা আমি আমার দেহ আবৃত করি এবং কিয়দংশ দ্বারা শয্যা রচনা করি এবং একটি পেয়ালা আছে উহা দ্বারা আমি জল পান করি।"

তিনি বললেন, "সেই দুটি দ্রব্য আমার নিকট আন।"

অতঃপর উহা তাঁর নিকট আনলে তিনি উহা আপন হস্তে গ্রহণ করে বললেন, "কে এই দ্রব্য দুটি ক্রয় করবে?"

এক ব্যক্তি বলল, "আমি উহা এক দিরহামে ক্রয় করতে পারি।" তিনি বললেন, "কে এর দ্বিগুণ বা তিনগুন মূল্য দিতে পার?"

এক ব্যক্তি বলল, "আমি দুই দিরহামে এটা গ্রহণ করতে পারি।"

অতঃপর তিনি তাকে ঐ দ্রব্য দুটি দিলেন এবং সেই দিরহাম দুটি উক্ত আনসারীকে দিয়ে বললেন, "এদের একটি দিয়ে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে পরিজনকে খেতে দাও এবং অপরটি দিয়ে রশি ক্রয় করে আমার নিকট নিয়ে এস।"

অতঃপর তিনি তা দিয়ে একটি শক্ত রশি প্রস্তুত করলেন এবং বললেন, "যাও কাষ্ঠ সংগ্রহ করে বিক্রয় কর এবং পনেরো দিন পর আমার সঙ্গে দেখা করো।"

লোকটি চলে গেল এবং সেদিন থেকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করতে শুরু করল। পনেরো দিনের মধ্যে সে পনেরো দিরহাম সঞ্চয় করে হজরতের নিকট উপস্থিত হলো। হজরত লোকটিকে কিছু অংশ দিয়ে খাদ্য ও কিছু অংশ দিয়ে বস্ত্র কিনবার উপদেশ দিলেন। অতঃপর হজরত বললেন, কোন্টি অধিকতর উপযুক্ত ও প্রশংসনীয়? এটি অথবা পরলোকে ভিক্ষুকের চিহ্নসহ উপস্থিত হওয়া?" (আবু দাউদ, মিশকাম, ২০৩ পৃষ্ঠা)

এমন বাস্তব কর্মপন্থা হজরত তাঁর জীবনে বহু নিদর্শন এবং অভাবগ্রস্ত ভিখারীকে স্বাবলম্বী হতে বহু উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর উপদেশবাণী পালন করলে কাউকেই পরমুখাপেক্ষী হতে হবে না। যারা অন্যের দুয়ারে-দুয়ারে ভিক্ষা করে তারা শুধু অকর্মণ্য ও অলস হয়ে সমাজকে ধ্বংস করে না–নিজেরাও পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। ভিক্ষার

www.pathagar.com

হাত প্রসারিত করে কেউ মর্যাদাপ্রাপ্ত হয় না। আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের ওপর নারাজ। হজরতের বাণী থেকে এটাও পরিষ্কার বোঝা যায়।

"যে ব্যক্তি ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে আল্লাহ্ তার জন্য অভাবের দ্বার উন্মুক্ত করেন।" (তিরমিজি)

"যে কখনও কারো নিকট কিছু চাইবে না বলে আমাকে প্রতিশ্রুতি দেয় আমিও তাকে বেহেশ্তের প্রতিশ্রুতি দিই।"

(আবু দাউদ, মিশকাত, ২০৬ পৃষ্ঠা)

"ভিক্ষা করা আর নিজের মুখে আঘাত করা সমান। অতএব যার খুশি সে তার মুখ অক্ষত রাখুক এবং যার খুশি তা ক্ষত-বিক্ষত করুক।" (আবু দাউদ, তিরমিজি, মিশকাত ২০৯ পৃষ্ঠা)

"যে ব্যক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করে সে নিশ্চয় ভস্ম সঞ্চয় করে। চাই বেশি, চাই কম।" (মুসলিম)

"কেউই তদপেক্ষা উত্তম ভক্ষণ করে নি–যা সে নিজ হস্তে উপার্জন করেছেন। হজরত দাউদ স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন।" (বুখারী)

নীরবতা

হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণী–নীরবতার প্রয়োজন ও গুনাগুণ আলোচনা করব। তিনি বলেছেন, "নীরবতাই শ্রেষ্ঠতম এবাদত।" (সগির)

এবাদত কি? এ নিয়ে কিছুটা জ্ঞানলাভ করা দরকার। আল্লাহ্ পাক কোরআনে বলেছেন, "এবং আমি মানুষ ও জ্বীন সম্প্রদায়কে আমার এবাদতের উদ্দেশ্য ভিন্ন সৃষ্টি করি নাই।"

(কোরআন ঃ সূরা জারিয়াত, আয়াত ৫৬)

এবাদত অর্থে আমরা সাধারণত নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাতকে বুঝে থাকি। কিন্তু এবাদতের প্রকৃত অর্থ তা নয়। সত্য ন্যায়ের পথে জীবন পরিচালনার নামই এবাদত। এক কথায় বলা যায়–যে কাজে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সন্তুষ্ট থাকে সেটাকেই এবাদত বলা হয়। দাক্ষিণ্য, নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত প্রভৃতি কার্যাবলীকেই এবাদত বলা হয়।

আল্লাহর প্রেমে জীবন উৎসর্গ করা যেমন এবাদত, অত্যাচারী, জালিম, মুনাফেক ও নাস্তিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও তেমনি এবাদত। ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দেওয়া যেমন এবাদত, কুশিক্ষার হাত থেকে রক্ষা করাও তেমনি এবাদত। জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা যেমন এবাদত, জীবকে হত্যা করে জীবন রক্ষা করাও তেমনি এবাদত। আরাম-আয়াশ ভোগ করে সৃষ্টিকর্তার কাজে নতি স্বীকার করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যেমন এবাদত, দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অনটন, রোগ শোকে ধৈর্য ধরাও তেমনি এবাদত। আহার-বিহার, চাল-চলন, কথাবার্তা যা জীবনের জন্য অপরিহার্য ও প্রয়োজন সবই এবাদত। এ সব কার্যবিধির মধ্যে নীরবতাই শ্রেষ্ঠতম এবাদত। কেন, সে কথাই বিশ্লেষণ করছি।

বোবার শত্রু নেই–এ কথাটি সবাই জানেন। বোবা কথা বলতে জানে না। জিহ্বা তার নিষ্ক্রিয়। তার মনের কথা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ করতে পারে না। মানুষ যখন ইচ্ছামতো মনের কথা প্রকাশ করে তখনি যত অঘটন ঘটে। নিন্দা, অপবাদ, মিথ্যা চাটুকারিতা, সবকিছু জিহ্বার সাহায্যেই প্রকাশিত হয় এবং ঝগড়া, বিবাদ, কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এক অশান্তি সৃষ্টি করে। মানুষ যদি কথা বলতে না পারত তাহলে এত বিশৃঙ্খলা, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, মারামারি, কাটাকাটির হাত থেকে রেহাই পেত। আর এ রেহাই পাবার অর্থই হতো পরম শান্তি ও মুক্তি। এছাড়া বাহুল্য বাক্য ব্যয় মানুষকে

www.pathagar.com

হেকমত শূন্য করে। জ্ঞানী-মহাজ্ঞানীদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য মৌনতা অবলম্বন অর্থাৎ নীরবতা; প্রতিটি পয়গম্বর ও জ্ঞানী লোকই নীরবতা পালন করেছেন ও নীরবতার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। হজরত ঈসা (আঃ) বলেছেন,"যদি এবাদত সমূহকে দশ ভাগে ভাগ করা যায় তবে তন্মধ্যে এক বাক্‌শক্তি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নয় ভাগ রয়েছে। বাকি এক ভাগ রয়েছে লোকসমাজ হতে দূরে থাকা।" [১]

হজরত লোকমান (আঃ) বলেছেন, "বাক্‌শক্তি নিয়ন্ত্রণ এক চমৎকার হেকমত। কিন্তু লাভ করার প্রতি কারো কোন অনুরাগ বা উৎসাহ নেই।"[২]

কোন জ্ঞানী-বিজ্ঞানীকে এর ব্যতিক্রম করতে দেখা যায় না। নীরবে তাঁরা সাধনা করেন। বৈজ্ঞানিকদের দেখা যায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নির্জনে বাহুল্য বাক্যব্যয় না করে তাঁরা গবেষণা চালিয়ে যান। যদি সমাজে মিশে কুটিল রাজনীতিতে মিশতেন অথবা প্রেমের বুলিতে নারীর মন জয় করতেন তাহলে কিছুতেই তাঁরা আবিষ্কার করতে পারতেন না। নির্জন গুহায় ঘোর অন্ধকার স্থানে বছরের পর বছর সাধনা করে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) নবুয়ত পেলেন। অযথা কথা বলাকে তিনি কোন দিনই পছন্দ করতেন না। বেশি কথা বলা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেননা অতিরিক্ত কথার মাঝে থাকে অতিরঞ্জন, মিথ্যা, অপবাদ, যা সমাজের জন্য ডেকে আনে হিংসা, বিভেদ, বিচ্ছেদ ও কলহ। এছাড়া শরীর বিজ্ঞানের মতে, অতিরিক্ত কথা বলা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরা অতিরিক্ত কথা বলার ফলে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ফলে মাথাধরা, অনিদ্রা, চোখজ্বালা প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। এ অভ্যাস বেশি দিন ধরে চললে উন্মাদ হবার সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়া মস্তিষ্কের ওপর বেশি চাপ পড়ার ফলে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে বাষ্পের সৃষ্টি হয় যা মস্তিষ্কের উর্বরতা শক্তিকে নষ্ট করে দেয়। এ জন্যই যারা বেশি কথা বলে তাদের স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। যারা জ্ঞানী তাদের লক্ষণ কম কথা বলা। হজরতের বাণী এ কথাই প্রমাণ করে।

"কোন মুসলমানকে নীরব ও গম্ভীর দেখলে তোমরা তাঁর সংসর্গ লাভ কর। এরূপ ব্যক্তি কখনই অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন ও জ্ঞানী না হয়ে পারে না।" (সংগৃহীত, সৌভাগ্যের পরশমণি, ইমাম গাজ্জালী। তর্জমা–আবদুল খালেক, রসনার আপদ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ১৫৭)

"নীরবতা জ্ঞানীর অলঙ্কার ও মূর্খের আবরণ।"[১]

"বাহুল্য বাক্য বর্জন করাই মুসলিমের সৌন্দর্য।"[২]

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এর চাইতে সুন্দর বাণী কে দিয়েছে? মস্তিষ্কের ওপর অতিরিক্ত কথা বলা এরূপ ক্রিয়া করবে শরীর বিজ্ঞানের ডিগ্রী না নিয়ে কে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন?

জিহ্বার ওপরই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া নির্ভর করে। এই জিহ্বা হিংসার কথা বললে, অহঙ্কারের কথা বললে চোখ মুখ দিয়ে আগুন ছোটে, ঝগড়া-বিবাদ করলে শরীরের শিরা-উপশিরা স্ফীত হয়ে ওঠে, প্রেমের বুলিতে নারীকে আকৃষ্ট করলে যৌনাঙ্গ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে ফেলে। আবার আল্লাহর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে চোখ ফেটে জল আসে। সহানুভূতি ও সান্ত্বনার কথা বললে মস্তিষ্ক শীতল হয়। জ্ঞানের কথা বললে, হাসির কথা উঠলে চোখে মুখে আনন্দের লহরী ছোটে। চার পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এই জিহ্বা হৃদয় , মন ও সমস্ত শরীরকে নিয়ে কি খেলাই না খেলে। কাউকে করে জ্ঞানী, কাউকে করে সাধক, কাউকে করে পাগল। এজন্যই হজরত তাঁর জিহ্বাকে স্পর্শ করে বলেছেন,

"এটাই আমার জন্য সর্বাপেক্ষা বিপদজনক।"[১]

---

১ –২. সংগৃহীত 'ইমাম' গাজ্জালী সাহেবের কিমিয়ায়ে সা'আদত। সৌভাগ্যের পরশমনি, (রসনার আপদ পরিচ্ছেদ) ১৫৭,১৬২

টীকা ঃ ১ সগির।

২. তিরমিজি। সংগৃহীত–হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৪–৭৫।

১, ও ২ তিরমিজি (সংগৃহীত–ইমাম গাজ্জালী সাহেবের কিমিয়ায়ে সা'আদত। রসনা পরিচ্ছেদ এবং হাদিসের

www.pathagar.com

"এটাকে সংযত কর, তবেই সৎকার্যে সুদৃঢ় হবে ও মুক্তি পাবে।"[২]

জিহ্বার সৃষ্টি সত্যি অদ্ভুত। রসায়ন বিজ্ঞানের সব উপাদান দিয়েই যেন এ জিহ্বার সৃষ্টি। অ্যাসিড জাতীয় জিনিসও যেমন এতে ধরা পড়ে, ক্ষার জাতীয় দ্রব্যও ঠিক একইভাবে ধরা পড়ে। শুধু তাই না, অ্যাসিড ও ক্ষার জাতীয় দ্রব্যের প্রকারভেদও অতি সুন্দর ও স্পষ্ট-ভাবে ধরতে সক্ষম। যেমন লেবুর রস, আমলকীর রস ও তেঁতুলের রস বুঝতে সক্ষম। তেমনি গ্লুকোজ, মধু, আঙ্গুর, বেদানা প্রভৃতি মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যও বুঝতে সক্ষম। এমন ফিল্টার, যা লক্ষ লক্ষ দ্রব্যের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করতে পারে, সৃষ্ট জগতে আর কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই। রসায়ন বিজ্ঞান পরীক্ষাগারেও এমন কোন পদার্থের সন্ধান পাই নি। শুধু রসায়ন বিজ্ঞানে ফিল্টার হিসাবেই এ জিহ্বা শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয় নি, পর্দার্থ বিজ্ঞানের মূল্যবান পরীক্ষা যন্ত্রসমূহকেও (Testing equipments) হার মানিয়ে দিয়েছে।

পদার্থ বিজ্ঞানের কোন যন্ত্রই আমাদের ইচ্ছামতো কথা সৃষ্টি করতে পারে না। মনের ভাবকে প্রকাশ করতে পারে না; প্রেমের আবেগও ফুটিয়ে তুলতে পারে না। জিহ্বা মনের ইচ্ছাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সুর দিয়ে আমাদের সরস ও সজীব করে রাখে।

Medium wave, short wave –যে ধরনের Frequency হোক না কেন এ জিহ্বা তার ব্যবহার জানে। আশ্চর্য জিহ্বা, যারা এর সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে তারাই ধন্য হয়েছে; আর যারা এর অপব্যবহার করে মানব সমাজকে কলুষিত করেছে, তারাই ইহকাল ও পরকালকে নষ্ট করেছে। হজরতের মহাবাণী তার সাক্ষী–

"মুখের কথা ও জিহ্বার কটুবাক্যই মানুষকে দোজখে নিক্ষেপ করিবে।"[১]

"যে ব্যক্তি অশ্লীল ভাষায় কথা বলে তার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম।"[২]

"দোজখের মধ্যে কতক লোকের মুখ দিয়া মলমূত্র নির্গত হইবে এবং উহা দুর্গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্যান্য দোজখবাসীরা অভিযোগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, ইহারা কেমন লোক? তাহাদের এই অবস্থা কেন? উত্তর আসিবে, ইহারা সেই সমস্ত লোক যাহারা পৃথিবীতে অশ্লীল ভাষায় কথা বলিতে ভালবাসিত এবং অশ্লীল গালাগালি করিত।"[৩]

এ জন্যই জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ ঠিক পথে হওয়া উচিত। এই মূল্যবান যন্ত্রটিকে দিয়ে মূল্যবান দ্রব্যের স্বাদই গ্রহণ করা উচিত। একে অন্যায়ভাবে চালিত করে দেহমনকে কলুষিত করা উচিত নয়। এর সুষ্ঠু পরিচালনা যারা জানে না তাদের পক্ষে নীরবতাই উত্তম। এর চাইতে প্রকৃষ্টতম আর কোন পন্থা নেই।

পবিত্র বাইবেলে এ সম্বন্ধে একটি সতর্কবাণী দেখতে পাই যা নিম্নরূপ ঃ –মথি পরিচ্ছেদ।

১৫/১৭ "তোমরা কি এখনও অবোধ? তোমরা কি বুঝিতে পার না যে যাহা কিছু মুখের ভিতরে যায় তাহা উদরে প্রবেশ করিয়া নর্দমায় গিয়ে পড়ে? কিন্তু মুখ হইতে যাহা বাহির হয় তাহা অন্তঃকরণ হইতেই বাহির হইয়া আসে এবং তাহাই মানুষকে অপবিত্র করে। কারণ অন্তঃকরণ হইতেই সমস্ত কুচিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, লাম্পট্য, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য ও নিন্দা বাহির হইয়া আসে। এই সকলই মানুষকে অপবিত্র করে। অধৌত হস্তে ভোজন মানুষকে অপবিত্র করে।"

লুক-৬/৪৫

"ভাল লোক তাহার অন্তরের ভাল ভাণ্ডার হইতে ভাল বিষয়ই বাহির করে। মন্দ লোক মন্দ ভাণ্ডার হইতে মন্দ বিষয়ই বাহির করে, কারণ হৃদয়ের প্রাচুর্য হইতেই তাহার মুখ কথা বলে।"

আলো, ২য় খণ্ড)।

টীকা ঃ ১ . তিরমিজ। সংগৃহীত–হাদিসের আলো কৃত–পূর্বে বর্ণিত।

২ –৩ কিমিয়ায়ে সা'আদত। রসনার আপদ পরিচ্ছেদ।

www.pathagar.com

দানশীলতা

নিঃস্বার্থভাবে অপরকে কোন কিছু বিতরণ করার নামই দান। অন্য কথায় বলা যায় যে যশ, খ্যাতি, মান-সম্মান ও স্বার্থসিদ্ধির উর্ধ্বে থেকে যে দ্রব্য অন্যের উপকারার্থে ব্যয় করা হয় সেটাকেই দান বলে। দান বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। শুধু ধন-দৌলত, বাড়ি-ঘর ও জমিজমা বিলিয়ে দেবার নামই দান নয়—জ্ঞানদান, শিক্ষাদান, আত্মদান, মর্যাদা দান, শারীরিক শক্তি দান, বুদ্ধিদান, খাদ্যদান, বস্ত্রদান, উপদেশ দান প্রভৃতি দানের শ্রেষ্ঠ অংশ। এ দানের গুরুত্ব অপরিসীম। এ দানই সমাজকে গঠন করে, সুস্থ ও সবল করে, আত্মা, দেহ ও মনকে পবিত্র করে, দুঃখ-কষ্ট লাঘব করে, জীবনকে উন্নত করে, মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব আনে। এজন্যই হজরত বলেছেন,

"হে বনি আদম! যাহা তুমি ব্যয় কর উহা তোমার পক্ষে কল্যাণকর এবং যাহা তুমি সঞ্চয় কর উহা তোমার পক্ষে ক্ষতিকর, তুমি যেন কৃপণতার জন্য নিন্দিত না হও। তোমার পরিজনের মধ্যে যাহারা দরিদ্র প্রথমে তাহাদিগকে দান কর।"[১]

যারা কৃপণ, দান করতে চায় না, তাদের হৃদয় হয় পাষাণ। অন্তরে তাদের সহানুভূতি আসে না। প্রেমাকর্ষণ এদের স্পর্শ করতে পারে না। তাই সমাজের হয় এরা শত্রু। সমাজকে করে ধ্বংস। মানুষের মাঝে এনে দেয় বিভেদ ও বিচ্ছেদ।

দাতার হৃদয় হয় কোমল, অন্তর হয় স্বচ্ছ ও সুন্দর, প্রানভরা মায়া, মমতা ও সহানুভূতিপূর্ণ। পরের দুঃখে এদের হৃদয় গলে, চোখ থেকে অশ্রু ঝরে, নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে তারা চায় অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে, তাই দানের হস্ত প্রসারিত করে।

দাতা বীর হাতেম তাই পরের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে পৃথিবীতে অমর হয়ে রয়েছেন। হজরত ইব্রাহিত (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহর জন্যে কোরবাণী করে যুগ যুগের জন্য এক জ্বলন্ত ইতিহাস রচনা করেছেন। ওয়ায়েশ করণী হজরতের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সমস্ত দাঁত নিজ হাতে ভেঙে ফেলে দানের এক উজ্জ্বল নিদর্শন দেখিয়েছেন। দানবীর হাজী মুহাম্মদ মহসীন তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দীন-দুঃখী, এতিম-ফকির, কাঙাল-মিসকিন ও হিন্দু-মুসলিম মেধাবী ছাত্রদের দান করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁর দৈনন্দিন রোজগার গরিবদের দান করে বাংলার মানুষকে চেতনা দিয়েছেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী মৃত্যুর সময় নিঃসম্বল অবস্থায় প্রান ত্যাগ করেছেন। হজরত আবুবকর (রাঃ), হজরত ওসমান (রাঃ), হজরত ওমর (রাঃ), মৃত্যুর পূর্বে এক কপর্দকও রেখে যান নি। সব কিছুই দান করে মুসলিম ইতিহাসকে অলঙ্কৃত করেছেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, আর. পি. সাহা প্রভৃতি মনীষীরা মানুষের উপকারার্থে, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, সরাইখানা, মন্দির, জলাশয় প্রভৃতি কাজে নিজেদের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের এ দান কোনদিন ব্যর্থ হয় নি এবং হবেও না। জাতি চিরদিন তাঁদের স্বরণ করবে ও শ্রদ্ধার চোখে মনেপ্রাণে তাঁদের স্মৃতি গেঁথে রাখবে। ইহকালেই মাত্র তাঁরা মর্যাদার উচ্চতম শিখরে সমাসীন থেকে পুরুস্কৃত হবেন।

"নিশ্চয়ই দানকারী ও দানকারিণীগণ এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণে ঋণ প্রদানকারিগণের জন্য উহা দ্বিগুণিত করা হইবে এবং তাদের জন্য সম্মানিত প্রতিদান রহিয়াছে।'[১] (৫৭ ঃ ১৮)

"তোমাদের কি হইয়াছে যে তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করিবে না? এবং আল্লাহর জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উত্তরাধিকারিত্ব; তোমাদের মধ্যে কেহই তাহাদের সমতুল্য নও—যাহারা মহাবিজয়ের পূর্বে ব্যয় করিয়াছিল, যাহারা পরে ব্যয় করিয়াছে ও ধর্মযুদ্ধ করিয়াছে তদপেক্ষা উহারাই পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর; এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্‌ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।"[১] (৫৭ ঃ ১০)

টীতা ঃ ১. সংগৃহীত হাদিসের আলো । হাঃ নং ৪৩৭।

টীকা ঃ ১ . কোরআন ঃ সূরা হাদিদ, আয়াত ১৮।

টীকা ঃ ১ . কোরআন ঃ সূরা হাদিদ, আয়াত ১০.১১। বাইবেল। মথি। দান প্রার্থনাদি ধর্মকার্যের কথা—৫/৩ এবং ১৯/২১।

www.pathagar.com

"যাহারা স্বীয় ধন দান করিয়া থাকে রাত্রিকালে এবং দিনের বেলায় তাহাদের জন্য তাহাদের পুরস্কার তাহাদের পালনকর্তার নিকট নির্ধারিত রহিয়াছে এবং তাহারা কোন আতঙ্ক বা ভয়ের সম্মুখীন হইবে না এবং চিন্তারও সম্মুখীন হইবে না।" (কোরআন)

বাইবেলেও দান সম্বন্ধে অনেক স্থলে উপদেশ দেওয়া আছে।

যেমন,

"কিন্তু তুমি যখন দান কর তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে তোমার বাম হস্তকে তাহা জানিতে দিও না। তোমার দান যেন গোপনে হয়। তাহাতে তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন তিনি তোমাকে প্রতিদান দিবেন।"[২]

"যদি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে চাও, তবে চলিয়া যাও, তোমার স্বর্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদের দান কর। তাহাতে তুমি স্বর্গে ধন পাইবে।"[৩]

(মথি ১৯/২১)

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) দানের যে উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছেন তার তুলনা মেলে না। নিজের খাবার পরকে দিয়ে পেটে পাথর বেঁধে কাটিয়েছেন। পর্বতসম স্বর্ণের প্রতিশ্রুতি পেয়েও উপেক্ষা করেছেন এবং সত্যের বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে জগৎকে আলোকিত করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি এক দিরহামও অবশিষ্ট রাখেন নি। সারা জীবনব্যাপী তিনি জ্ঞানদান, শিক্ষা দান, উপদেশ দান ও ধন দান করে অমর হয়ে আছেন। নিম্নে তাঁর দানের কয়েকটি উপমা দিচ্ছি।

একদা হজরত মুহাম্মদ (দঃ) আসরের নামাজ শেষ করে সহসা উঠে দাঁড়ালেন এবং সবার স্কন্ধের ওপর ভর দিয়ে পার হয়ে নিজ ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর এ সন্ত্রস্ত ভাব দেখে উপস্থিত জনতা ভীত হয়ে পড়ল। হজরত ফিরে এসে লক্ষ্য করলেন যে তাঁর দ্রুত গমনের জন্য সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েছে। তখন তিনি বললেন, "হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে আমার ঘরে এক টুকরো স্বর্ণ জমা আছে। আমি উহা এক রাত্রি জমা রাখিয়া দিব তাহা আমি পছন্দ করি না। তাই অবিলম্বে উহা দান করিয়া আসিলাম।"[১] (বুখারী শরীফ)

একদা কয়েকজন মদিনাবাসী সাহাবী হজরত (দঃ)-এর নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। হজরত তাদের দান করলেন। তারা পুনরায় সাহায্য প্রার্থনা করলে হজরত (দঃ) সেবারও দান করলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা কিছু ছিল বারংবার দান করে সবকিছু নিঃশেষ করে ফেললেন। এবার তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন, "আমার নিকট টাকা-পয়সা কিছু থাকলে তা তোমাদের না দিয়ে নিজের কাছে জমা রাখতাম না।"[২] (বুখরী শরীফ)

হাকিম ইবনে হেযাম (রাঃ) বলেছেন, একদা আমি হজরত (দঃ)-এর নিকট কিছু সাহায্য চাইলে আমাকে দান করলেন, আবার চাইলাম আবার দান করলেন এবং বললেন–

"হে হাকিম! স্মরণ রেখো, ধন দৌলত অতিশয় লোভনীয়, লালসা উদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক বস্তু। লিপ্সা ও কৃত্রিম ক্ষুধামুক্ত হয়ে যে ব্যক্তি তা আহরণ করবে সে তাতে বরকত লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি লিপ্সা ও কৃত্রিম ক্ষুধার বশীভূত হয়ে তা আহরণে ব্যস্ত হবে সে ধনের দ্বারা তার ভাগ্যে বরকত জুটবে না। তার অবস্থা এরূপ হবে যে, খাচ্ছে অথচ তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করছে না। স্মরণ রেখো, ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।"

(মিশকাত, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

টীকা ঃ ২ –৩. বোখারী শরীফ। তর্জমা–মোঃ শামসুল হক, ২য় খণ্ড। পৃষ্ঠা ৬৩ ও ৭৮-৮০।

টীকা ঃ ১ . –৩. বোখারী শরীফ। তর্জমা–মোঃ শামসুল হক, ২য় খণ্ড। বৈ. মু. (১ম)–৭

www.pathagar.com

পাথরে ঘষে ঘষে যেমন সোনাকে খাঁটি ও নিখুঁত বলে প্রমাণ করা হয়, তেমনি সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সমাবেশে হজরত নিজেকে খাঁটি সোনার চাইতেও খাঁটি ও মূল্যবান বলে প্রমাণ করেছেন। এমন অদ্ভুত ও উন্নত চরিত্রের মানুষ সমাজে মেলে না। একবার নয়, দুবার নয়, বার বার হজরতের নিকট ব্যক্তি দান প্রার্থনা করে তিরস্কৃত হয় নি, লাঞ্ছিত হয় নি এবং অপমানিতও হয় নি। উপরন্তু পেয়েছে অমূল্য উপদেশ যা জীবনকে করেছে সুন্দর, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য পেয়েছে আলোর পথ।

অভাবগ্রস্ত না হয়ে দানের বস্তু গ্রহণ করার মতো অপরাধ আর নেই। লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে যারা নিজের আত্মাকে বিকিয়ে দেয়, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে তাদের চাইতে ঘৃণ্য সৃষ্টি দুনিয়ায় আর নেই। কায়িক পরিশ্রমলব্ধ অর্থে যেমন সন্তুষ্টি আসে, দানের বস্তু লাভে সে সন্তুষ্টি আসে না। কেননা বিনা পরিশ্রমে যে বস্তু মেলে তা অল্পক্ষণেই খরচ হয়ে যায়। এ খরচের উপর মায়া থাকে না। প্রয়োজন, অপ্রয়োজনের পার্থক্য এতে ধরা পড়ে না। যেমন সহজে লাভ করা হয় তার চাইতেও সহজে নিঃশেষ হয়ে যায়। এজন্যই মহাজ্ঞানী হজরত (দঃ) বলেছেন যে, দানের বস্তু নিয়ে বরকত হয় না। **'ওপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম'** কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে দাতার সম্মান ও মর্যাদা যেমন দেখান হয়েছে তেমনি গ্রহীতার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে।

আমি পূর্বেই লিখেছি যে, দান শুধু অর্থের নয়, বিষয়বস্তুতেই নয়, যে কোন সৎ কাজই দানের মধ্যে গণ্য হয়। হজরতের নিম্নোক্ত বাণী তা প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন, "দান-খয়রাত করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

সাহাবিগণ আরজ করলেন, "ইয়া নবী উল্লাহ! হে আল্লাহর নবী; যার সামর্থ্য নেই সেই ব্যক্তি কি করবে?"

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বললেন,"শারীরিক পরিশ্রম করবে ও সে পারিশ্রমিক দ্বারা নিজেও উপকৃত হবে এবং দান-খয়রাতও করবে।"

সাহাবিগণ আরজ করলেন, "যদি সেরূপ কোন সুযোগ না পায়?" হজরত বললেন, "কষ্ট ও ক্লেশে পতিত বিপদগ্রস্ত অসহায়কে সহায়তা করবে।"

সাহাবিগণ আরজ করলেন, "যদি সেরূপ ক্ষমতা, শক্তি ও সুযোগ না পায়?"

হজরত বললেন, "সৎ ও ভাল কাজ করবে এবং মন্দ ও অসৎ কাজ হতে সংযমী হবে। এটাই তার জন্য দান-খয়রাতরূপে গণ্য হবে।"[১]

হজরতের প্রতিটি বাণী সমাজবিজ্ঞানের জন্য অপরিহার্য, বিধি-সম্মত ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় নিরূপিত। এর ব্যতিক্রম ঘটলে সমাজ ও জাতি সুখী ও সমৃদ্ধশালী হতে পারে না। যে হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে 'দানশীলতা' পরিচ্ছেদ আরম্ভ করেছি সেখানে দেখেছি যে হজরত (দঃ) দান করতে উপদেশ দিয়েছেন নিজ পরিবারভুক্ত দুঃখীদের। আপনজনকে অভুক্ত রেখে, আপন ভাই-বোনকে বিবস্ত্র রেখে, নিজ প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের মূর্খ রেখে পরের তরে দানের হস্ত প্রসারিত করা নিতান্তই বোকামী ও মূর্খতার সামিল। কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই এ দানকে উৎসাহিত করবে না। প্রতিটি দাতা যদি রসুল (দঃ)-এর এ মহাবাণীকে সম্মুখে রেখে দান করত, তবে গ্রহীতারা সমাজে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় হতো না। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে পেটের ক্ষুধা থাকলেও, অভাবের তাড়নায় চোখে-মুখে অন্ধকার দেখে প্রায় শতকরা ৯৫ জন লোকই পরের কাছে হাত পাততে চায় না। বিবেক তাদের দংশন করে। মন তাদের বাধা দেয়। কিন্তু নিজ আত্মীয় বা পরিজন যারা এ অসহায়দের কথা জানে তাদের কাছে দুঃখের কথা জানাতে বা সাহয্যের জন্য অনুরোধ করতে ততটুকু লজ্জিত হয় না। এজন্যই নিজ পরিবার ও পরিজনের মধ্যে যারা সক্ষম উপযুক্ত ও ধনী তাদের উচিত নিজেরাই নিজেদের গরিব আত্মীয় স্বজনদের সাহায্য করা।

টীকা ঃ ১ · বোখারী শরীফ। তর্জমা–মোঃ শামসুল হক, ২য় খণ্ড।

www.pathagar.com

আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় ও ঢাকা-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয়, "স্বজনপ্রীতি চলবে না।" স্বজনপ্রীতির উদ্দেশ্য কি, এর অর্থ কি, এর গুরুত্ব কতটুকু তা যারা জানে না, তারাই স্বজন প্রীতির নামে চমকে ওঠে। স্বজন-প্রীতি অর্থ আপনজনের প্রতি আকর্ষণ। আপনজনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা, স্নেহ করা ও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করা। যাদের এ গুণ আছে তারা আপনজনের অর্থাৎ নিজ পরিবারভুক্ত লোকজন, প্রতিবেশী, নিকটতম অধিবাসী, নিজ জেলা বা দেশীয় লোকজনের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে পারে না। এটা দোষের কোন কথা নয়। নিজ পরিবারভুক্ত লোক, আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশীকে দুঃখে সাহায্য করা, বিপদ হতে উদ্ধার করা, চাকরি বা ব্যবসা ক্ষেত্রে সাহায্য করা, লেখাপড়ার জন্য সুযোগ সুবিধে করে দেওয়া, ক্ষুধার্তকে অন্নদান বা আর্থিক সাহায্য করা, এসবকে স্বজনপ্রীতির মধ্যে ধরে নিয়ে অপপ্রচার করা দোষণীয়। পরিবার-পরিজনদের মঙ্গল করা অন্যায় নয়, অমঙ্গল করা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাহায্য না করা অন্যায় ও পাপ বলেই আমি মনে করি। স্বজন-প্রীতি বিধিসম্মত, ধর্মসম্মত ও আল্লাহর আদেশসম্মত।

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বলেছেন —

"যে কোন ভাল কাজই দান (স্বরূপ)।"[১]

দানের অর্থ ব্যাপক। সৎ নিয়তে মানুষ যে কাজ করে সেটাই দানের মধ্যে গণ্য হয়। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি পথের ধারে একটি বৃক্ষ রোপণ করে এই উদ্দেশ্যে যে মানুষ এর ছায়াতলে আশ্রয় নেবে, পশু-পক্ষী এর শাখা-প্রশাখায় বাসা তৈরি করবে, জীবজন্তু এর ফল খেয়ে তৃপ্তিলাভ করবে তাহলে এ দান হবে তার জন্য সাদকা।[২] একটি ফলবান বৃক্ষ রোপণ করে যে ব্যক্তি তার ফল নিজ হস্তে পরিবার-পরিজনকে খাওয়ায়, তার অবর্তমানে যারা এ বৃক্ষের ফল খেয়ে তৃপ্তি লাভ করে তারা বৃক্ষ রোপণকারীর প্রশংসা করুক বা না করুক প্রতিদান তার মিলবেই। হজরতের বাণী তার সাক্ষ্য দেয়।

"যে কোন মুসলিম একটি গাছ লাগায় এবং মানুষ বা অন্যজীব উহার ফল খায় তাহার জন্য উহা হইবে একটি দান। (সহীহ বুখারী)

দানের যে মূল্যবান অংশটি জগৎকে উদ্ভাসিত করেছে ইসলাম ধর্মে সেটাকে বলা হয় যাকাত।[৩] যাকাতের প্রয়োজনীয়তা কি, সমাজের জন্য এর অবদান কি, জাতির স্বার্থে, দীন-দরিদ্রের স্বার্থের অনুকূলে না প্রতিকূলে এটা ইন্‌শা আল্লাহ্‌ বিশ্লেষণ করব ধনবিজ্ঞান পরিচ্ছেদে।

বিনয়

নম্রতা, ভদ্রতা, আমায়িকাতা, শিষ্টাচার প্রভৃতি মানবের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির সমন্বয়কে বিনয় বলা হয়। যে ব্যক্তি বিনয়ী আল্লাহ তাঁকে যেমন ভালবাসেন মানব সমাজের কাছেও তিনি তেমনি আদরণীয় ও বরণীয় হন। অহঙ্কারী, কর্কশভাষী ও আত্মাভিমানী ব্যক্তি যদিও নিজেকে বড় মনে করে তবুও প্রকৃতপক্ষে সে বড় নয়। কেননা এ স্বভাবের লোক দিয়ে সমাজ উপকৃত হয় না। এদের স্বভাব ধীরে ধীরে এমনি রূপ ধারণ করে যা হিংস্র ও নিকৃষ্ট জন্তুর স্বভাবে পরিণত হয়। হিংসা ও বিদ্বেষে এদের মন হয় ভরপুর। কারো উপকার করা তো দূরে থাক অপকারের চিন্তাতেই হয় মত্ত। এজন্যই হজরত (দঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি খোদার জন্য বিনীত হয় খোদা তাকে উন্নত করেন এবং যদিও নিজেকে ছোট মনে করে তবুও সে

টীকা ঃ ১. সমীহ বুখারী।

টীকা ঃ ২. সাদকা, মৃত্যুর পরে যে কাজের পূণ্য মেলে।

টীকা ঃ ৩. যাকাত—কোরআন ও হাদিসের নির্ধারিত নিয়মে যথা খাওয়া-পরা বাদে বৎসরে যে টাকা উদ্বৃত্ত তার শতকরা $২\frac{১}{২}$ % ভাগ অভাবগ্রস্ত দীন-দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করাকে যাকাত বলে। $৭\frac{১}{২}$ ভরি সোনা বা ৫২ ভরি রুপো থাকলে সম্পূর্ণ গহনার দাম হিসাব করে ঐ হারে টাকা দান করতে হয়।

www.pathagar.com

লোকের দৃষ্টিতে বড়। যে অহঙ্কার করে আল্লাহ্ তাকে অবনত করেন, সে লোকের চোখে ছোট হলেও নিজের মনে বড় হয়। অতঃপর সহজেই সে কুকুর ও শুকরের স্বভাব প্রাপ্ত হয়।" (মিশকাত থেকে সংগৃহীত)

কুকুর ও শুকরের স্বভাব কেমন এটা প্রতিটি মানুষই জানে। তবুও বলতে হয় এমন নিকৃষ্ট স্বভাবের প্রাণী আর নেই। যেমন নিকৃষ্ট খাদ্য এরা খায় তেমনি নিকৃষ্ট স্বভাবও এদের গড়ে ওঠে। সামাজিকতা বলে এদের কিছু নেই। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি যেমন একত্রে থাকতে ভালবাসে, একত্রে আহার করে তৃপ্তি পায়, একে অপরের বিপদে দৌড়ে আসে, কুকুর ও শুকর তা করে না। একের গণ্ডিতে অপরকে এরা আসতে দেয় না। স্নেহ-মমতা এদের নেই বললেই চলে। শুধু বাচ্চাকে লালনপালন করার জন্য যতটুকু মায়া-মমতা প্রকৃতি থেকে পায় ততটুকুই ব্যবহার করে। একটু বড় হলে মা ও সন্তানের মধ্যে আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। একে অন্যের খাদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। স্বার্থের ব্যাঘাত হলেই দু'জনের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। কদর্য যৌনচেতনার অধিকারী এ দুটি প্রাণী কুকুর ও শুকর। তাই এদের সঙ্গে হজরত (দঃ) তুলনা করেছেন অহঙ্কারী ব্যক্তির।

হজরত চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিনয়। গুরুজনদের নিকট যেমন তিনি বিনয়ী হতেন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বিদেশীদের নিকটও তেমনি অমায়িক, ভদ্র ও নম্র হয়ে সবার মন আকৃষ্ট করতেন। নিজের প্রশংসার জন্য কোনদিন কোন কাজ করেন নি বরং কেউ তাঁর প্রশংসা করলে লজ্জিত হতেন এবং তাঁর প্রশংসা করতে নিষেধ করতেন। তাঁর নিম্নোক্ত বাণী একথার সাক্ষ্য দেয়–

"খ্রীষ্টানগণ মরিয়মপুত্র ঈসাকে যেরূপ খোদার পুত্র বলে অত্যধিক প্রশংসা করে তোমরা আমাকে তদ্রূপ করো না। কারণ আমি তাঁর ভৃত্য। অনন্তর আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রসুল বলো।" (শায়খান সহীহ বুখারী)

শুধু তাই নয়, উপরন্তু এ কথাই দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন–

"তোমাদের মধ্যে যারা অমায়িক তারাই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়।" (সহীহ বুখারী)

"আমাকে অন্য নবীদের চেয়ে উত্তম বলো না।" (আবু দাউদ)

"আল্লাহ্ নম্রতা ভালবাসেন প্রতিটি কাজে।" (সহীহ বুখারী)

"আল্লাহ্ ভদ্রতা ও নম্রতাকে ভালবাসেন এবং বিনয়ীকে যা দেন গর্বিতকে তা দেন না।" (মিশকাত)

"সমস্ত মানুষ আদমসন্তান এবং আদম মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।" (সগির)

হজরত (দঃ)-এর এরূপ মূল্যবান বাণী একটি নয়, শত শত। সমাজ জীবনকে সুন্দর ও সাবলীল করতে তিনি কত মূল্যবান তত্ত্বই না আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন। প্রতিটি বাণী বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কি গূঢ় রহস্য এর মাঝে রয়েছে সেগুলিও তন্ন তন্ন করে দেখান সম্ভব নয়। এখানে শুধু শেষ উদ্ধৃতি দিয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করছি।

আমাদের সমাজ বড় কলুষিত। হিংসা-বিদ্বেষ, মান-অভিমান, যশ-খ্যাতি, শক্তি-সামার্থ্যকে অবলম্বন করে একে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। একজন সুন্দর ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি একজন কুৎসিত ও দুর্বলকে ঘৃণা করে। ধনী ব্যক্তি দরিদ্রকে, শিক্ষিত অশিক্ষিতকে, জ্ঞানী অজ্ঞানীকে অত্যন্ত ছোট মনে করে। শুধু তাই নয়, জাতিভেদের পার্থক্য এনে, দেশী-বিদেশীর পার্থক্য করে রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটায়। সাদা-কাল চামড়ার প্রভেদ টেনে হিংসার বীজ ছড়িয়ে দেয় অথচ তারা জানে না একই আদম সন্তান থেকে তারা আগত। তাদের শারীরিক উপাদান একই। একই হাড়-মাংস ও রক্ত-মজ্জায় তাদের দেহ গঠিত। মৌলিক উপাদান যেখানে এক, যৌগিক উপাদান সেখানে ভিন্ন হলে ক্ষতি কি?

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে এক পরমাণু কার্বন থেকে দশ কোটিরও বেশি পদার্থের সৃষ্টি করা যায়। যদিও চরিত্রের দিক থেকে এসব পদার্থ ভিন্ন তবুও মূল উপাদান একই। তদনুরূপ একই মাটি হতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, সাবেইন, তাবেইন,

www.pathagar.com

পারসিক, পৌত্তলিক, শিখ, আমেরিকান, রাশিয়ান, চীনা, জাপানী প্রভৃতি মানুষের জন্ম। সবাইকে আবার এক মাটিতেই রূপান্তরিত হতে হয়। বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, হিটলার, মুসোলিনী, চেঙ্গিস, তৈমুর, নাদির, আকবর, পিটার সে মাটিতেই রূপান্তরিত হয়েছে; সে মাটির বুকেই ঠাঁই নিয়েছে। দুর্বল, অসহায়, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও অবাঞ্ছিত হাজার হাজার মানুষের হয়েছে একই মাটি হতে জন্ম, একই মাটিতে রূপান্তর। তাই প্রতিটি দেশের প্রতিটি জাতির, প্রতিটি সমাজের একই মাটির স্বভাবে গড়ে ওঠা উচিত। মাটি যেমন জীবকে অফুরন্ত খোরাক যোগায়, মাটির স্বভাব নিয়ে গড়া মাটির মানুষ যারা, তারাও সমাজকে ঠিক তেমনি অফুরন্ত সম্পদ ও প্রেরণা যোগায়। তাই জাতিভেদ, বর্ণভেদ, সমাজভেদ দেশাচারভেদ ভুলে যদি আমরা মাটির মানুষ আদম সন্তান–এই বাস্তবকে স্বীকার করি তাহলে ধরাতেই স্বর্গ রচনা করা যায়। হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজ, খ্রীষ্টান সমাজ সবাই মিলে তখনই কেবল গড়া সম্ভব মানব সমাজ যে সমাজ হবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সমাজ।

বিনয়ের ওপর নবী-পয়গম্বর ও মহাপুরুষগন কত গুরুত্ব আরোপ করেছেন নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি তার সাক্ষ্য বহন করে–হজরত ইসা (আঃ) বলেছেন, "বিনয়ী যাহারা তাহারা ধন্য, কারণ তাহারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে।"[১]

"যে কেহ আপনাকে শিশুর মতো নত করে সেই স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ।"[২]

"যে কেহ আপনাকে উন্নত করে তাহাকে নত করা হইবে আর যে কেহ আপনাকে নত করে তাহাকে উন্নত করা হইবে।"[৩]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন,

"যে বৃক্ষ ফলবান হয় তা নুয়ে পড়ে। বড় হবে তো ছোট হও।"[৪]

লজ্জা

বিনয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ 'লজ্জা'। লজ্জাহীন মানুষ পশুর সমান। যার লজ্জা নেই, সে সব কিছুই করতে পারে। চুরি, ডাকাতি, ষণ্ডামী, গুণ্ডামী, ভণ্ডামী কোন কিছুই করতে তার দ্বিধা আসে না। মুখে যা আসে বলে যায়। অন্তর যা বলে তাই করে যায়। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় লজ্জাহীন ব্যক্তির কাছে সমান। একটি মেয়ের সর্বনাশ ঘটাতে যেমন তার লজ্জা হয় না, অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করতেও তার বিবেকে বাঁধে না। নিজের বাসনা চরিতার্থ করতে যা খুশি করতে পারে। এরা সমাজের কীট। এদের চরিত্র হজরত (দঃ) পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপেই বিচার করেছেন। তাই বলেছেন।

"যখন তুমি লজ্জা কর না, তখন তো যা ইচ্ছা করতে পার।"[৫] (সহীহ বুখারী)

লজ্জা ছাড়া ঈমান হয় না। ঈমান ছাড়া পুণ্য অর্জন হয় না। পুণ্য ছাড়া আল্লাহকে খুশি করা যায় না। 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।"[১] একথা হজরত (দঃ) বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন–"লজ্জা ঈমানের শাখা এবং ঈমানদার বেহেশ্‌তে যাইবে। লজ্জাহীনতা অবিশ্বাসের অঙ্গ এবং অবিশ্বাসী দোজখে থাকিবে।"[২]

টীকা ঃ ১ –৩. বাইবেল মথি, ৫-৫ ও ১৭-৪।

টীকা ঃ ৪. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ (সুরেশ দত্ত, ৮০ পৃষ্ঠা)।

টীকা ঃ ৫ . সহীহ বুখারী।

টীকা ঃ ১ . শায়খান।

টীকা ঃ ২. তিরমিজি। ঐ হাঃ নং – ৩৫৬ ও ৩৫৮। সংগৃহীত, আজাহারউদ্দিন কৃত হাদিসের আলো। লজ্জা পরিচ্ছেদ।

www.pathagar.com

লজ্জাহীন ব্যক্তি অপকর্ম করে মানুষের বিচারেই জেল খাটে, হাজত খাটে ও সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে। আল্লাহর নিখুঁত বিচারে তারা যে এর চাইতেও কঠিন শাস্তি ভোগ করবে ও দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কোরআনও একথাই সাক্ষ্য দেয়–

"এবং অপকৃষ্টতার বিনিময় তদনুরূপ অপকৃষ্টতা।"[৩] (সহীহ বুখারী)

হজরত (দঃ)-এর বাণী নিয়ে আমরা সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে লজ্জার আবশ্যকতা, ফল ও প্রতিফল বিচার করে দেখব, এ মহাবাণীর গুরুত্ব কতটুকু।

লাজুক ব্যক্তিকে অনেকেই অকর্মণ্য এবং অনাধুনিক বলে আখ্যায়িত করে। চাটুবাক্য, ফাঁকিবাজী, প্রতারণা, জুলুম, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার এগুলি শুধু লজ্জাহীন ব্যক্তিদেরই কর্ম। এ সব অপকর্মে সমাজ উপকৃত হওয়া তো দূরের কথা–সমাজকে তারা করে দেয় পঙ্গু। লজ্জাহীন ব্যক্তিদের ভয়ে প্রতিটি মানুষ সন্ত্রস্ত থাকে।

যারা লজ্জাশীল, তারা নিজেদের জীবনে যেমন শান্তি ও শৃঙ্খলা আনে, অপরের জন্যও তেমনি নিয়ে আসে অপার আনন্দ, বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা। কেননা চুরিকে তারা যেমন ঘৃণা করে, মিথ্যা, অপবাদ, হিংসা -বিদ্বেষ, অত্যাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি অসৎ গুণাবলী হতেও অনেক দূরে থাকে। লজ্জা তাদের চোখে এক আবরণ এনে দেয়, যার ফলে অন্যায় ও অপকর্ম হতে তারা বহু দূরে থাকে। যা কিছু তারা করে তার পেছনে থাকে মহৎ উদ্দেশ্য যা প্রতিফলিত হয় তাদের জীবনে। পূর্ণাঙ্গ জীবনের বিনিময়ে তারা নিয়ে আসে মহাকল্যাণ।

পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই লজ্জার প্রয়োজন। লজ্জাহীন পুরুষ যেমন সমাজকে ধ্বংস করে, লজ্জাহীনা নারীও তেমনি একটা জাতিকে ধ্বংস করে। লজ্জাহীন পুরুষ যেমন একটি রাষ্ট্রের দুশমন, লজ্জাহীনা নারীও তেমনি রাষ্ট্রের কীট। মায়মুনা, ঘসেটী বেগম, ক্রিষ্টিন কিলার, পদ্মিনী ও শত নারী তার সাক্ষ্য বহন করে। মিথ্যা সাক্ষ্য, উলঙ্গ প্রেম, কদর্য যৌনক্রিয়া, হীনতা, পাশবিকতা, চুরি, ডাকাতি, খুন ও লজ্জাহীন বাক্য হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে ও পথের কাঙাল করেছে। এ জন্যই নারীদের জন্য 'পর্দার' বিধান দিয়েছে ইসলাম। যৌনবিজ্ঞান পরিচ্ছেদে এ নিয়ে ইন্‌শা আল্লাহ্‌ আলোচনা করব।

অনেকের মতে, লজ্জা বৃহত্তর কার্য সাধনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন কোন গুরুজন বা শিক্ষক কোন ভুল শিক্ষা দিচ্ছেন অথবা জ্ঞানের অভাবে প্রকৃত তত্ত্ব পরিবেশন করতে লজ্জায় ভুল না ধরিয়ে দেওয়া বা প্রতিবাদ না করা ক্ষতিকর। এ ক্ষেত্রে লজ্জা অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয়। এতে কল্যাণের কিছু নেই। এরূপ চিন্তা করে অনেকেই রসুল (দঃ)-এর এ বাণীকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাসম্মত নয় বলে বলতে পারে। কিন্তু রসুল (দঃ)-এর বিধান এরূপ অন্যায়কে সমর্থন করে না। যারা লজ্জা করে অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহস পায় না তারা ভীরু বা অন্যায়ের সমর্থক। এর দৃষ্টান্ত রসুল (দঃ) জীবনভর দিয়েছেন। যখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রধান ও প্রতাপশালী ব্যক্তিগণ হজরতের চাচা আবুতালেবকে ডেকে হজরত সম্বন্ধে সাবধান করে দিলেন, তখন আবুতালেব হজরত (দঃ)-কে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কথা বলতে মানা করলেন। হজরত সত্য কথা বলতে লজ্জিত হলেন না। তাঁর প্রাণপ্রিয় চাচাকে ভয় করেও চুপ থাকলেন না। উদাত্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন," চাচাজান, সমগ্র বিশ্ব যদি আমার বিরুদ্ধে চলে যায়, তবুও আমি সত্য প্রচারে বিরত হবো না।" (বিশ্বনবী –গোলাম মোস্তফা)

একটি দুটি ঘটনা নয়, হজরতের এরূপ সাহসিকতা ও বিশ্বাস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা ছিল। লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে অন্যায়কে তিনি প্রশ্রয় দেন নি।

মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁরা অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। অশ্লীল আচরণকে তাঁরা ঘৃণাবোধ করতেন। লজ্জা ছিল তাঁদের ভূষণ। লজ্জাই ছিল আচরণ। লজ্জাই ছিল তাঁদের সম্পদ। ওলি, গাউস, কুতুব, ফকির, নবী ও পয়গম্বরগণ—যাঁরা আল্লাহর আশীর্বাদপ্রাপ্ত, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করেছিলেন তাঁদের সৌন্দর্য প্রাপ্ত,

---

টীকা ঃ ৩. কোরআন। (সূরা শুরা, আয়াত ৪০)

www.pathagar.com

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করেছিলেন তাঁদের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তাঁদের লজ্জায়।

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) কেমন লাজুক ছিলেন নিম্নের উদ্ধৃতি হতে তা বোঝা যায়।

"হজরত অন্তঃপুরবাসিনী কুমারী অপেক্ষা অধিকতর লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি অপ্রিয় কোন বস্তু দেখিতেন তাঁহার মুখে আভাস পাওয়া যাইত।"[১]

"নবী (দঃ) অবিবাহিতা পর্দানশীন বালিকার চেয়েও লাজুক ছিলেন।"[২]

"নবী (দঃ) অশ্লীল কথা বলিতেন না বা লজ্জাহীন ছিলেন না এবং বলিতেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ভাল যে চরিত্রে ভাল।"[৩]

তা হলে যা দেখা যায় চরিত্র গঠন করতে যতগুলি বৈশিষ্ট্যের দরকার লজ্জা তাদের মধ্যে অন্যতম। লজ্জাহীন ব্যক্তিকে চরিত্রবান বলা চলে না। চরিত্রবান ব্যক্তি না হলে সমাজ গঠন হয় না। সমাজ না থাকলে একটি দেশ ও জাতি টিকে থাকতে পারে না। এ জন্যই হজরত (দঃ) চরিত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। চরিত্রবান হয়েই তিনি জন্মলাভ করেছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রবান মহাপুরুষ রূপেই খ্যাতিলাভ করে মৃত্যুবরণ করেছেন। সারা জগতের মানুষ যেমন এ সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহর কোরআনও সেই সাক্ষ্যই দেয়। "নিশ্চয়ই তুমি সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।" (কোরআন ঃ সূরা কলম, আয়াত ৪)

দুর্নীতি ও অনাচার

'জানিও, অন্ধকার যুগের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান আমার পদতলে দলিত ও মথিত হলো এবং অন্ধকার যুগের রক্তের দাবী আজ হতে চিরতরে রহিত হলো। অন্ধকার যুগের সুদ প্রথাও আজ হতে বন্ধ হলো।'[১] —বলেছেন প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ (দঃ) তাঁর বিদায় হজ্বের বাণীতে।

নীতির বিরুদ্ধাচরণ করাই দুর্নীতি। আচার-অনুষ্ঠান কৃষ্টি ও সভ্যতার বিরোধিতা করাই অনাচার।

কে না জানে চৌদ্দশ' বছর আগের কথা। কে না জানে সেই অন্ধকার যুগের দুর্নীতি ও অনাচারের কথা। বিভেদ-বিচ্ছেদ, অনাচার-অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, অগ্নিপূজা, মূর্তিপূজা, সূর্যপূজা, পাথরপূজা ছিল সে যুগের মানুষের স্বভাব। চুরি, ডাকাতি ছিল সে যুগের প্রথা। নারী-শিশুকে জ্যান্ত কবর দেওয়া ছিল সে যুগের রীতি।

এই দুর্নীতি ও অনাচারের মাথায় কুঠারাঘাত করতেই এলো ইসলাম। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম প্রগতির ধর্ম। ইসলাম শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধর্ম। ইসলামের বাণীবাহক হজরত মুহাম্মদ (দঃ) উদাত্তকণ্ঠে তাই ঘোষণা করলেন, 'সত্য এসেছে। অসত্য বিদূরীত হয়েছে।"

সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও ধর্ম বিজ্ঞানের ভিত্তিই হল ইসলাম। ইসলাম সর্ব যুগের ধর্ম। ইসলাম সর্ব ধর্মের ধর্ম। ইসলাম সমস্ত মানবগোষ্ঠীর ধর্ম। ইসলামই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। কোরআন এর সাক্ষ্য দেয়।[২]
(৩ ঃ ১৯)

"ইন্নাদ্দীনা এন্দাল্লাহেল ইসলাম।"[২]

টীকা ঃ ১. শায়খান। সংগৃহীত হাদিসের আলো, ১ম খণ্ড।

টীকা ঃ ২.-৩ সহীহ বুখারী, (তর্জমা আঃ রহমান খাঁ, ২৯০ ও ৮৮ পৃষ্ঠা।)

টীকা ঃ ১. মুহাম্মদ আজাহার উদ্দিন, হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড, পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ১৯৮।

টীকা ঃ ২. কোরআন ঃ সূরা আল এমরান, আয়াত ১৯৮৫।

www.pathagar.com

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম।'

"যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসরণ করে ফলত তাহা তখনই তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হইবে।"[১] (৩ ঃ ৮৫ কোরআন)

মানুষে মানুষে যে পর্বতসমান পার্থক্য, রাজায় প্রজায় যে প্রভেদ, বংশে বংশে ও দেশ-বিদেশের মাঝে যে ব্যবধান বিদ্যমান ছিল সে ব্যবধান, সে পার্থক্য দূর করলেন বৈজ্ঞানিক নবী হজরত (দঃ)। তিনিই সাম্যের বাণী দিলেন। তিনিই সাম্যের গান গাইলেন। তিনিই বিশ্বের বুক থেকে দুর্নীতি, অনাচার ও কুসংস্কারের মাথায় কুঠারাঘাত হানলেন।

যে দুর্নীতিতে সমাজ কলুষিত হয় তাদের মধ্যে সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, মূর্তিপূজা, ক্রীতদাস প্রথা, নারীর অমর্যাদা, অবৈধ রক্তপাত, চুরি করা, এতিমকে বঞ্চিত করা, মদ্যপান, জুয়াখেলা ইত্যাদি। দুর্নীতি ও অনাচার ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ। এমন অপরাধের ক্ষমা নেই। এসব অপরাধ মানুষকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে নিয়ে আসে। সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটায়। আত্মীয়ে আত্মীয়ে কলহের সৃষ্টি করে। ভাই-বোন, দেশী-বিদেশীদের মধ্যে রক্তপাতের সূচনা করে। আত্মাকে কলুষিত করে। বিশ্বাসে শিথিলতা আনে। মনকে ছোট করে, সুচিন্তার মাথায় কুঠারাঘাত হানে। বিস্তৃতভাবে এগুলি আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি না। কেননা, এ নিয়ে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন চিন্তাশীল মনীষী ও লেখকগণ লিখে গেছেন এবং এর কুফল বর্ণনা করেছেন।

সুদখোর, ঘুষখোর, মদ্যপায়ী ও জুয়াড়িরা সমাজের কীট। এরা সমাজকে ধ্বংস করে। শান্তি ও শৃঙ্খলাকে ব্যহত করে। মান-ইজ্জত নষ্ট করে। অর্থের অপচয় করে। দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসা, সহানভূতি এদের অন্তরে থাকে না। হজরত এজন্যই এগুলি হারাম বলে ঘোষণা করেছেন এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

"যখন কোন ব্যভিচারী জেনা করে তখন সে আর মুমেন থাকে না এবং যখন কোন চোর চুরি করে তখন সে আর মুমেন থাকে না এবং যখন কোন মদ্যপায়ী মদ্য পান করে তখন সে আর মুমেন থাকে না এবং যখন কোন দস্যু দস্যুতা করে এবং লোকেরা তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তখন সে মুমেন থাকে না এবং তোমাদের কেহ যখন পরনিন্দা করে তখন সে আর মুমেন থাকে না। অতএব তাহাদের সম্বন্ধে সাবধান হও।"[১]

সুদ প্রথা

সুদ প্রথা জনসাধারণকে শোষণ করার এক প্রকৃষ্ট হাতিয়ার। বিশ্বের সর্বত্রই এ জঘণ্যতম প্রথা বিদ্যমান ছিল—আজও আছে। সে যুগে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে এমন ভাবে প্রচলিত ছিল যে সুদ ছাড়া কোন টাকাই ধার দেওয়া হতো না। ফলে ধনীরা অল্পদিনেই বিনা প্ররিশ্রমে ঘরে বসে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করত। গরিব দুঃখীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই প্রয়োজনের তাগিদে মহাজনদের নিকট হতে টাকা ধার নিত আর এ সুদের বোঝা বহন করত। সুদ দিতে না পারলে তাদের বাড়ি-ঘর, জিনিস-পত্র, জমি-জমা মহাজনেরা জোর করে নিয়ে এদের পথের কাঙাল করে ছাড়ত।

সুদ দু-প্রকার। একটিকে সরল সুদ বলা হয়। অন্যটিকে বলা হয় চক্রবৃদ্ধি সুদ। শেষোক্ত প্রকারের সুদই মারাত্মক। কেননা বছর শেষে আসল টাকার সঙ্গে সুদ যোগ করে যে অঙ্ক দাঁড়ায় সেটাই দ্বিতীয় বছরের প্রারম্ভে আসলের রূপ নেয়। যেমন একশ' টকার এক

টীকা ঃ ১. সংগৃহীত হাদিসের আলো। ২য় খণ্ড, কৃত পূর্বে বর্ণিত।

টীকা ঃ ১. কোরআন ঃ সূরা আল এমরান, আয়াত ৮৫।

www.pathagar.com

বছরের সুদ পাঁচ টাকা। কোন মহাজন দশ হাজার টাকা ধার দিলে বছর শেষে সুদ হবে পাঁচশ' টাকা। দ্বিতীয় বছরের প্রারম্ভে আসল হবে (দশ হাজার+পাঁচশ') দশ হাজার পাঁচশ' টাকা। এইভাবে দশ বছর পরিশোধ করতে না পারলে যে অঙ্ক দাঁড়াবে তা পরিশোধ করার মতো কোন শক্তিই কোন খাতকের থাকতে পারে না। তাই বাধ্য হয়ে মহাজনকে সর্বশেষ সম্বল ভিটেটুকুও লিখে দিতে হয়। গরিব-দুঃখীর এ ভয়াবহ দুরবস্থা দেখে হজরত (দঃ) অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যে দুর্নীতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছিল, তাকে দূর করা যে কত কঠিন হজরত (দঃ) তা বুঝতে পারলেন। তবুও দেখলেন এ নির্মম অত্যাচার হতে সমাজকে মুক্ত করতেই হবে। তাই যুগ যুগের ধনীগোষ্ঠীর একচেটিয়া ব্যবসাকে অর্থাৎ সুদ প্রথাকে হারাম বলে ঘোষণা করেন। সুদ দেওয়া এবং নেওয়া দুটি মহা পাপ। সুদখোরের রক্ত অপবিত্র বলে সমাজ হতে তাদের বিচ্ছিন্ন করলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহর নির্দেশ ঘোষণা করলেন,

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে সুদের মধ্যে যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা বর্জন কর, কিন্তু যদি তা না কর তবে তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও রসুলের পক্ষ হতে যুদ্ধ বিঘোষিত হইবে।"[১] (২ ঃ ২৭৮)

"যারা সুদ খায় তারা শয়তানের স্পর্শে আকৃষ্ট ব্যক্তির দণ্ডায়মান হওয়ার অনুরূপ ব্যতীত দণ্ডায়মান হইবে না।"[২] (২ ঃ ২৭৫)

সমাজ বিজ্ঞানে উন্নততর থিওরী দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক নবী হজরত মুহাম্মদ। (দঃ)। সুদ বিশ্বজনীন সাম্রাজ্যবাদের একটি অতি জঘন্য নিদর্শন। হজরত সুদখোরের স্বার্থপরতা, কপটতা, প্রবঞ্চনা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা হতে রেহাই দিলেন দরিদ্র কৃষক, মজুর, কামার কুলি ও বুভুক্ষু জনতাকে। সুদের প্রভাবে দরিদ্রের রক্ত পুঞ্জীভূত হয়ে ধনীর রত্নাগার পূর্ণ হতো, ফলে হিংসা, বিদ্বেষ, রেষারেষি ও ঘৃণার সৃষ্টি করে সমাজে আনত ভেদবৈষম্য, অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা। সুদখোরের হাতে জনসাধারণের সম্পদ আবদ্ধ থাকায় জাতির সম্পদ ও ধনাগম ক্রমশ কমে আসে, যার ফলে সাধারণ মানুষের কর্মশক্তি লোপ পায়। জাতীয় কর্মশক্তি লোপ পাবার অর্থই সে দেশের অর্থনৈতিক অবনতি। অর্থনৈতিক অবনতিই একটা দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে।

অন্যদিকে সুদখোরের দল যেমন কঠের হয়, তেমনি অলস ও অকর্মণ্য হয়েও সমাজ ও দেশের ক্ষতি সাধন করে। এদের লগ্নিকৃত অর্থ সুদের অর্থে ব্যবহৃত না করে মিল-ফ্যাক্টরী, ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহার করলে তা দ্বারা দেশের সম্পদ যেমন বাড়ে, লক্ষ লক্ষ বেকার সমস্যার সমাধান করে জাতীয় আয়ও তেমনি বাড়ে। ফলে দেশ ও জাতি ঐশ্বর্যশালী হয়। এ ছাড়া ধার নেবার প্রবৃত্তি কমে আসে, স্বাবলম্বী হতে সবাইকে কঠোর পরিশ্রম করারও এক উদ্দীপনা এনে দেয়।

একটা প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায়। সুদ প্রথা না থাকলে প্রয়োজনের সময় দরিদ্রেরা কি ভাবে টাকার সংস্থান করবে? এজন্যই ইসলামে যাকাত ও দান প্রথা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে যেন গরিব জনসাধারণ বাঁচতে পারে। যাকাতের ওপর ইন্‌শাআল্লাহ ধনবিজ্ঞান পরিচ্ছেদে আলোচনা করব।

ক্রীতদাস প্রথা

সভ্য দুনিয়ার সভ্য যুগে এ কথাটি বলতে ও শুনতে কারও কাছেই আজ ভাল লাগবে না যে মানুষ হয়ে মানুষকে কিভাবে ক্রীতদাস করে রেখেছে। প্রতিটি মানব সন্তান যেখানে মুক্ত

টীকা ঃ ১. ও ২. কোরআন। সূরা বকর, আয়াত ২৭৮ ও ২৭৫।

www.pathagar.com

হয়ে ভূমিষ্ট হয় সেখানে তাকে গোলাম করে রাখার প্রবৃত্তি যে কত নিকৃষ্ট ও জঘন্য তা বলার প্রয়োজন রাখে না। এ ধরনের অনাচার ছিল প্রাচীন যুগের আরব দেশে। যে দেশে জন্ম নিয়েছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। এ রীতিকে কেউ তুলে দিতে পারে নি। এ অনাচার ও দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ কেউ করতে সাহস পায় নি। কেননা এ রীতি ও নীতির পেছনে ছিল স্বার্থন্বেষী ধনীগোষ্ঠীর একতরফা স্বার্থ। চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রথায় গরিবকে নিঃসম্বল করে আরবের এ কুখ্যাত ধনীরা তাকে বাধ্য করত তারই বুকের ধন ছেলে-মেয়েদের হাট-বাজারে তুলে গরু-ছাগল-ভেড়ার মতো বিক্রি করতে। কেনা গরু-মহিষ, উট-গাধার পিঠে বোঝা দিয়ে যেমন মালিক সারা দিন-রাত নিষ্ঠুরভাবে খাটিয়ে নেয়, তেমনি নিত এসব ক্রীতদাস দাসীদের। শুধু তাই নয়, মন যোগাতে না পারলে কর্তা-গিন্নিরা এদের পিঠে মারত চাবুক। উমাইয়ার মতো পাষাণ কর্তার সে যুগে অভাব ছিল না। ক্রীতদাস বেলালের পিঠে যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে উমাইয়া রাগের প্রতিশোধ নিত আর হাসিমুখে তামাসা দেখত, তেমনি শত শত উমাইয়া এরূপ নিরীহ ক্রীতদাসদের প্রহার করে পৈশাচিক প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করত। সহ্য করতে পারলেন না মানুষের নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। মেনে নিতে পারলেন না সাম্যের গায়ক এ মরু-বুলবুল। জেহাদ ঘোষণা করলেন এ মহাযোদ্ধা আল্লাহ্‌র রসুল। এ শোষকশ্রেণী ও অত্যাচারীদের লক্ষ্য করে আদেশ করলেন, 'ক্রীতদাসকে মুক্তি দাও—বন্দীকে মুক্ত কর।"[১]

হজরত (দঃ) তাঁর নিজের ক্রীতদাস জায়েদকে (হজরতের সাহায্যার্থে তাঁর স্ত্রী কর্তৃক ক্রীত) মুক্তি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এবং অমর বাণী দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করলেন, "যে ব্যক্তি একজন ক্রীতদাসকে মুক্তি দেয়, দোজখের শাস্তি তার মাফ হয়।"[২]

এ দৃষ্টান্ত দেখে ভক্ত সাহাবাবৃন্দ ও মুমেন মুসলমানগন একে একে সবাই ক্রীতদাসকে মুক্তি দিয়ে এক নব ইতিহাস রচনা করেন।

ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া, তার প্রতি সদ্ব্যবহার করা, তাকে সুশিক্ষা প্রদান করা প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। ক্রীতদাসকে মুক্তি দেবার অর্থ তার আত্মাকে মুক্তি দেওয়া, বেহেশ্‌তের পথ উন্মুক্ত করা ও আল্লাহকে খুশি করা। তাঁর নিম্নোক্ত বাণীসমূহ এ সাক্ষ্য বহন করে।

"যে ব্যক্তি একজন মুসলিম ক্রীতদাসকে মুক্তি দেবে আল্লাহ্ তাহার প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গকে দোজখের শাস্তি হতে রক্ষা করিবেন, এমনকি তাহার গুপ্তাঙ্গের জন্য তাঁহার গুপ্তাঙ্গ।"

(বোখারী শরীফ, মওলানা শামসুল হক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৬)

"যদি কাহারো কোন বালিকা ক্রীতদাসী থাকে এবং সে যদি তাহাকে শাস্তি না দিয়া শিষ্টাচার ও সুশিক্ষা দান করে এবং তাহাকে মুক্তি দান করে এবং বিবাহ দেয়, সে নিশ্চয় দ্বিগুণ পুরস্কার পাইবে।"[১]

"ক্রীতদাস তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাহাদিগকে তোমাদের অধীনে রাখিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি তাহার ভাইকে তাহার অধীনে রাখিয়াছে সে নিজে যাহা আহার করে তাহাই তাহাদিগকে আহার করিতে দিবে। নিজে যেমন পোশাক পরিধান করে, তাহাদিগকে তেমন পোশাক পরিধান করিতে দিবে এবং তাহাদের শক্তির বাহিরে কোন কাজ করিতে দিবে না, নতুবা তাহাতে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে।"[১]

ক্রীতদাসকে মুক্তি না দেওয়া, প্রহার করার পরিণাম কি সে কথা বলেও তিনি মুসলিম

টীকা ঃ ১. শায়খান। সংগৃহীত-মুহাম্মদ আজহারউদ্দিন এম. এ., হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪ ও ৪৭।

টীকা ঃ ১. নাসায়ী ব্যতীত অন্য পাঁচজন। সংগৃহীত–মুহাম্মদ আজাহারউদ্দিন এম. এ., হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪ ও ৪৭।

www.pathagar.com

সমাজকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি তাহার ক্রীতদাসদের সহিত অসৎ ব্যবহার করে সে বেহেশ্‌তে যাইবে না।"[২]

"আমি কি তোমাদিগকে বলিব কে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম? সেই ব্যক্তি যে একাকী আহার করে ; ক্রীতিদাস-দাসীদের প্রহার করে এবং কাউকে কিছু দেয় না।"[৩]

একদা আবু মাসুদ এক ক্রীতদাসকে প্রহার করছিলেন। হজরত (দঃ) তা দেখে বললেন, "হে আবু মাসুদ! ক্রীতদাসের ওপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা তোমার ওপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা তার চাইতে ঢের বেশি। যদি ক্রীতদাসকে প্রহার করা হতে বিরত না হও, তবে দোজখ তোমার জন্য উন্মুক্ত হবে এবং অগ্নি তোমাকে স্পর্শ করবে।"

(মুসলিম ও তিরমিজি)

এরূপ একটি দুটি বাণী নয়, অসংখ্য উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি মানুষকে সজাগ করে দিলেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠা হতে ক্রীতদাস পরিচ্ছেদ তিনিই মুছে ফেললেন।

মানুষ হয়ে মানুষকে খুন করার মত অপরাধ আর নেই। এ পাপের মাফ হয় না বলে আমরা জানি অথচ ক্রীতদাসকে মুক্ত করলে এ মহাপাপও মাফ হয়। আল্লাহ্‌র বাণী তার সাক্ষ্য দেয়।

"এবং যে কেহ ভ্রমবশত কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করে তবে সে জনৈক বিশ্বাসী দাসকে মুক্ত করিয়া দিবে এবং ক্ষমা না করিলে তাহার স্বজনকে হত্যার বিনিময়ে সমর্থন করিবে।[৪] (৪ ঃ ৯২)

ব্যভিচার

নারী-পুরুষের অবৈধ মিলনের নাম ব্যভিচার। যৌবনে নারীপুরুষ মিলনের জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। প্রকৃতিগত যৌন চেতনাই এজন্য বিশেষ প্রভাব থাকলেও সংযমের সঙ্গে একে রোধ করা বিশেষ প্রয়োজন; নতুবা সমাজ কলুষিত হয়। হিংসা, বিদ্বেষ ও অপমানে কলহের সৃষ্টি হয়। এছাড়া এ গর্হিত কাজ সমাজের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনে। অবৈধ মিলনের ফলে যে দুর্ভাগ্যবান সন্তানের জন্ম হয় তাকে নিয়েই প্রতিটি সমাজ বিপদে পড়ে। এই অযাচিত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের কোন দায়িত্ব জন্মদাতা নেয় না। অভিশাপ নেমে আসে নিরীহ নারীর ওপর। সমাজ থেকে সে হয় বহিষ্কৃত। বাপ-মায়ের হয় কলঙ্ক। আত্মীয়-স্বজনেরা হয় বৈরী। জাতির জন্য হয় কালিমা। ফলে গর্ভজাত শিশুকে হয় প্রাণ হারাতে, নতুবা সমাজের মহকলঙ্ক হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। বেঁচে থাকার অর্থ কি? অভিশপ্ত দুর্ভাগ্য জীবনে লাভ কি? স্নেহ, মায়া, মমতা শূন্য জীবনের আনন্দ কি? বাপের পরিচয় নেই। মায়ের আদর নেই, আত্মীয়-স্বজনের সম্বন্ধ নেই, সরকারের খেয়াল নেই তবে সে শিশুর জন্মদাতা কোন্ পিশাচ? কোন্ শয়তান? কোন্ অপকর্মকারী? কোন্ ব্যভিচারী? হজরত দেখলেন এ মহা অপরাধকারীর ক্ষমা হতে পারে না। এ পিশাচ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। এ নিষ্ঠুর-পাষাণ সমাজের বন্ধু হতে পারে না। তাই সমাজকে নির্দেশ দিলেন উপযুক্ত সাক্ষী নিয়ে ব্যভিচারীকে মাটিতে অর্ধেকটুকু পুঁতে পাথর মারতে। তাঁর দৃষ্টিতে এমন পাপ আর নেই। তিনি বলেছেন,

"একমাত্র ব্যভিচার সত্তর বছরের এবাদতকে ধ্বংস করে।"[১]

টীকা ঃ ২. ইবনে মাজা। " " "
টীকা ঃ ৩. মিশকাত। " " "
টীকা ঃ ৪. কোরআন ঃ সূরা নেসা, আয়াত ৯২।
টীকা ঃ ১.-৩. সগির।

www.pathagar.com

"ব্যভিচার অপেক্ষা গর্হিত পাপ আর নেই।"[২]

"ব্যভিচারী মূর্তিপূজকের তুল্য।"[৩]

ব্যভিচার বলতে আমরা নারী-পুরুষের অবৈধ সম্মেলন বা দৈহিক মিলনকে বুঝে থাকি। কিন্তু মহাপুরুষদের সংজ্ঞায় শুধু দৈহিক মিলনই নয়, পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি ও কুচিন্তাকেও ব্যভিচার বলে। রসুল বলেছেন,

"পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টির নাম ব্যভিচার।"[১]

হজরত ঈসা (আঃ) বলেছে—"যে কোন লোক স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল। তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বিঘ্নের কারণ হয়, তবে তাহা উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া দাও ; তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং তোমার একটি অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল। আর তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তোমার বিঘ্নের কারণ হয় তবে তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দাও। তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়া অপেক্ষা বরং তোমার একটি অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল।"[২]

নারীদের দিকে দৃষ্টি পড়বে না এমন কোন কথা নয়। চোখ থাকলে দৃষ্টি পড়বেই। সে দৃষ্টির মাঝে কুচিন্তা হওয়াও স্বাভাবিক। তাই দৃষ্টিকে অবনমিত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কোরআনের নির্দেশও তাই।

"তোমার দৃষ্টিকে অবনমিত কর।"

রসুল (দঃ) বলেছেন, "দৈবাৎ কোন রমণীর প্রতি যদি তোমার দৃষ্টি পড়ে তবে দ্বিতীয়বার তার দিকে দৃষ্টিপাত করো না, কারণ প্রথম দৃষ্টি শুভ হলেও দ্বিতীয় দৃষ্টি বৈধ নয়।"[৩]

কত সুন্দর রসুলের এ বাণী। হঠাৎ যদি কোন সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী নারীর প্রতি চোখ পড়ে তবে ক্ষতি নেই, কেননা সে দৃষ্টিতে তার প্রতি কুচিন্তার উদ্রেক হয় না। কিন্তু বার বার দৃষ্টি দিলে সেই সুন্দরী নারীর রূপলাবণ্য, কেশবিন্যাস, চাহনী, কথা, চলাফেরার ভঙ্গি বা বেশভূষা বিশ্লেষণের একটা সুযোগ আসে। ফলে মানুষের মনে স্বাভাবতই একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আর সে আলোড়ন থেকেই হয় প্রলোভন। এ প্রলোভন ধীরে ধীরে কামচিন্তা ও সম্মেলনের দুশ্চিন্তায় রূপ নেয়।

মহাপুরুষদের মতে, এরূপ দুশ্চিন্তা ও এরূপ দৃষ্টিকেও ব্যভিচার বলে। এ দৃষ্টি তাহলে শুভ নয়। এ দৃষ্টি থেকে বিরত হতে ও এ প্রলোভন হতে নিজেকে বাঁচানোর নামই সংযম। এ সংযমকারীদের জন্য আছে মহাপুরস্কার। আল্লাহর ঘোষণা তা প্রমান করে।

"এবং জীবনের সম্মুখে প্রলোভন বিদ্যমান আছে, এবং যদি তোমরা সদ্ব্যবহার কর ও সংযমী হও তবে তোমরা যাহা করিতেছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ অভিজ্ঞ।"[১] (৪ ঃ ১১৮)

আল্লাহর বাণী হাতে নিয়ে হজরত (দঃ) এলেন ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠা করতে। সমাজকে সুষ্ঠু ও সবল করতে। জীবকুলের জন্য ন্যায়ের শাসন বদ্ধমূল করতে। ব্যভিচার ও ব্যভিচারিণী উভয়েই সম অপরাধী। কারো অপরাধ কম, কারো অপরাধ বেশি এ কথা হজরত স্বীকার করেন নি। কেননা তাঁর ওপর যে ওহী নাজেল হয়েছিল তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, "এবং তাহাদের নারীগণের মধ্যে যাহারা অশ্লীলতা করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত কর, অনন্তর যদি তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাহাদিগকে গৃহসমূহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ-যে পর্যন্ত মৃত্যু তাহাদিগকে তুলিয়া না লয় কিংবা আল্লাহ্ তাহাদের জন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন। এবং যদি তোমাদের মধ্যে দুজনই দোষ করে

টীকা ঃ ১ .সগির।

টীকা ঃ ২ . বাইবেল। মথি ৫। ২৭-৩০।

টীকা ঃ ৩ . আবু দাউদ ও তিরমিজি।

টীকা ঃ ১ . কোরআন : সূরা নেসা, আয়াত ১১৮ এবং ১৫-১৭।

www.pathagar.com

তবে উভয়কেই শাস্তি প্রদান কর। কিন্তু তাহারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সদাচারী হয় তবে তদুভয় হইতে প্রত্যাবর্তিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা গ্রহণকারী করুণাময়। আল্লাহর নিকট তাহাদের জন্যই ক্ষমা যাহারা অজ্ঞতাবশত পাপ করিয়া থাকে তৎপর অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করে। অতএব আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।"[২]

ব্যভিচারী ও ব্যাভিচারিণীদের শস্তি কি ধরনের হওয়া উচিত কোরআনের বাণী হতে তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সমাজের শত্রু এ শ্রেণীর নর-নারীদের ক্ষমা নেই। হজরত মুসা (আঃ) ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। তওরাতে এর প্রমাণ মেলে। হজরত ঈসা (আঃ)-এর নির্দেশ ছিল 'রজম' বা 'ছঙ্গছার'—অর্থাৎ অর্ধ-প্রোথিত অবস্থায় প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া। হজরতের নির্দেশও ছিল ঠিক তাই। নিম্নের দৃষ্টান্ত হতে তা বোঝা যায়।

একদা এক বেদুইন তাঁকে জানালেন, "আমার ছেলে ঐ ব্যক্তির মজুর ছিল। সে তাহার স্ত্রীর সহিত জেনা করিয়াছে।"

হজরত উনাইসকে বললেন, "উনাইস তুমি কাল ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাও এবং সে যদি দোষ স্বীকার করে তবে তাহাকে 'রজম' কর।"[১]

কামভাবে পরস্পর আলিঙ্গন করা, পরস্পরের মধ্যে কুকথা বলা, অন্তরে কু-ভাব পোষণ করাকেও ব্যভিচার বলে হজরত গণ্য করেছেন। ইসলামের নির্দেশ এদের নির্দয়ভাবে প্রস্তরাঘাত করা। সমাজকে কলুষমুক্ত রাখতে এ ব্যাভিচারীদের কোন সতী নারী গ্রহণ করা নিষেধ। কোন ব্যভিচারিণীও কোন সৎ পুরুকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে পারবে না। ব্যভিচারীর মিলন শুধু, ব্যভিচারিণীর সঙ্গেই হতে হবে। কি সুন্দর এ নির্দেশ। সমাজকে কলুষমুক্ত করার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা। জঘন্যতম অপরাধের জন্য কেমন কঠোর শাস্তি! এ ব্যবস্থা না থাকলে ইসলাম কি করে সর্ব ধর্মের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে? বিশ্বমানবের কাছে এ বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক কি করে 'জগৎগুরু' বলে আখ্যায়িত হবেন? কোরআনের কাঠোর বাণী ঘোষণা করে তিনি জানিয়ে দিলেন, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ইহাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। এবং আল্লাহর আদেশ সম্বন্ধে তাহাদের প্রতি যেন তোমাদের মমতা আকৃষ্ট না হয়—যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস করিয়া থাক ; এবং বিশ্বাসীগণের মধ্যে একদল যেন উভয়ের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী অবশ্যই ব্যভিচারিণী বা অংশীবাদিনী ব্যতীত বিবাহ করিবে না এবং ব্যভিচারিণী অবশ্যই ব্যভিচারী অথবা অংশীবাদী ব্যতীত বিবাহ করিবে না; এবং ইহা বিশ্বাসীগণের প্রতি অবৈধ করা হইয়াছে এবং যাহারা সতী-সাধ্বীগণের প্রতি অপবাদ প্রদান করিয়া পরে চারিটি সাক্ষী আনয়ন না করে, তবে তাহাদিগকে আশি বেত্রাঘাত কর এবং কখনই তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না এবং তাহারাই দুষ্কার্যকারী। কিন্তু যাহারা ইহার পরে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়।"[১] (২৪ ঃ ২-৫)

ইসলামের মহাবাণী অনুসরণ করে যদি সমাজ ব্যবস্থা চালু করা যেত, নির্ভয়ে ও বিনা দ্বিধায় মমতাহীন চিত্তে যদি অত্যাচারী, অনাচারী ব্যভিচারী, মুনাফাখোর, জুয়াচোর, সুদখোর ও মদখোর ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে বিচারের ব্যবস্থা হতো তা হলে দিন-দুপুরে হাইজ্যাক হতো না, পরের ঘরে ঢুকে কেউ চুরি করার সাহস পেত না, অবলা নারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হতো না। ব্যভিচারিণীরাও সমাজকে কলুষিত করার সাহস পেত না, রাস্তাঘাটে মদ খেয়ে মারামারি করত না, মুনাফাকারী ও চোরাচালানীদের অত্যাচারে জীবন দুর্বিসহ হয়ে

টীকা ঃ ২. কোরআন : সূরা নেসা, আয়াত ১১৮ এবং ১৫-১৭।

টীকা ঃ ১. সহীহ্ বুখারী। শর্তকাণ্ড পরিচ্ছেদ তর্জমা আলহাজ্জ আব্দুর রহমান খাঁ।

টীকা ঃ ১. কোরআন, সূরা নূর। আয়াত ২-৫।

www.pathagar.com

উঠত না। সমাজে আসত শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নতি, প্রেম-ভক্তি, মায়া-মমতা, সহানুভূতি ও সহৃদয়তা। মুখে ফুটত হাসি, হৃদয়ে আসত অপার আনন্দ আর চোখে আসত চিন্তাহীন নিদ্রা। শাসকগোষ্ঠী ইসলামের এই বিধান অনুযায়ী শাসন করবেন কি? আল্লাহ্ কিন্তু ন্যায়ের শাসককে ভালবাসেন। ন্যায় বিচারই কিন্তু তিনি পছন্দ করেন। ন্যায়ের মর্যাদাই কিন্তু তিনি দিয়ে থাকেন।

নারী নির্যাতন

যুগে যুগে শোনা গেছে নারীদের নির্যাতনের কাহিনী ও বঞ্চনার ইতিহাস। অভিশপ্ত এ নারী জাতি যুগ যুগ ধরেই ছিল অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। এরা শুধু ভোগের সামগ্রী ছিল। ভোগ করার অধিকার ছিল না। উপরন্তু এদের জ্যান্ত কবর দেওয়া হতো। দেব-দেবীর নামে বলি দেওয়া হতো। সহমরণের জন্য স্বামীর চিতায় জোর করে তুলে দেওয়া হতো। পুরুষ ইচ্ছা করে এদের যদৃচ্ছা ব্যবহার করত। আবার ইচ্ছানুযায়ী তালাক দিত। আইনের কোন শাসন এদের জন্য ছিল না। একই পিতার ঔরসে জন্ম নিয়েও পৈত্রিক সম্পত্তির কোন অধিকার ছিল না। যুগ যুগের সংস্কার সাধক ও মহাপুরুষগণ এদের জন্য কোন বিধিব্যবস্থা করে যেতে পারেন নি। উপরন্তু সমাজের নিকৃষ্ট ধরনের সৃষ্ট জীব বলে এদের মান ইজ্জত ও সম্মানকে সাধারণের চোখে আরও বেশি ছোট করে দেওয়া হতো। অনেক মহাপুরুষের এই অভিমত ছিল যে এরা শয়তানের ক্রীড়নক, বা বংশধর। তাই এরা প্রেম, ভালবাসা উপদেশ বোঝে না। কোন মন্ত্র দিয়ে, কোন ওষুধ দিয়ে এদের পবিত্র করা যায় না। এসব কথা যে অমূলক নয় নিম্নের উদ্ধৃতি তা প্রমান করে।

নারী চরিত্র সম্বন্ধে মনু স্বয়ং বলেছেন,

"নাস্তি স্ত্রীনাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি মর্মোব্যবস্থিত নিরীন্দ্রিয়া কামস্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহইত মিতি স্থিতি।"[১]

অর্থাৎ—মন্ত্রদ্বারা নারীদের সংস্কারাদির ব্যবস্থা হয় না। এজন্য তাদের অন্তকরণ নির্মল হতে পারে না।

খ্রীষ্টানগণ নারীদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। তাদের ধারণা নারীই সর্বনাশের মূল। বেহেশ্‌ত হতে এ ধরায় আগমনের কারণ বিবি হাওয়া (নারী জাতি)। বাইবেলের 'মানব জাতির পাপে পতন' শীর্ষক পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। নিম্নে এর উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

"সদা প্রভু ঈশ্বরের নির্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্প সর্বাপেক্ষা খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল, ঈশ্বর কি বাস্তবিকই বলিয়াছেন—তোমরা ঐ উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না? নারী সর্পকে কহিলেন, আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের ফল খাইতে পারি, কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে তাহার ফলের বিষয় ঈশ্বর বলিয়াছে—তোমরা তাহা ভোজন করিও না, স্পর্শ করিও না, করিলে মরিবে। তখন সর্প নারীকে কহিল, কোনক্রমে মরিবে না, কেননা ঈশ্বর জানেন—যেদিন তোমরা তাহা খাইবে সেদিন তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে; তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ্য হইয়া সদ্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। নারী যখন দেখিলেন ঐ বৃক্ষ সুখদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক, আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয়, তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন, পরে আপনার মতো নিজ স্বামীকে দিলেন, আর তিনিও ভোজন করিলেন। তাহাতে তাহাদের উভয়ের চক্ষু খুলিয়া গেল, এবং তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে তাহারা উলঙ্গ। আর ডুমুর বৃক্ষের পত্র সেলাই করিয়া ঘাগ্‌রা প্রস্তুত করিয়া লইলেন।"[১]

টীকা ঃ ১ Prof. India, The status of women in Ancient India নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বিশ্বনবী .....৩২ পৃঃ উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

সভ্যতার এ চরমযুগেও খ্রীষ্টান পাদ্রিগণ নারীদের আজও শয়তানের যন্ত্র, (Organ of the Devil) বিষাক্ত বোলতা (a Poisonous asp), কামড়ানোর জন্য প্রস্তুত বিচ্ছু (a Scorpion ever ready to sting) বলে অভিহিত করে থাকে। আর শান্তির বাহক হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বললেন,

"মায়ের পদপ্রান্তে বেহেশ্‌ত।" (মিশকাত)

কোরআনও ঘোষণা করল,

"এবং যেহেতু তিনিই পুরুষ ও নারীকে যুগলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।" ২ (৫৩ ঃ ৪৫)

"এবং আমি তোমাদিগকে যুগলরূপে সৃষ্টি করিয়াছি।"৩ (৭৮ ঃ ৮)

নারী জাতি অর্থাৎ মায়ের জাতিকে অবজ্ঞা বা লাঞ্ছনা করার মতো জঘন্যতম অপরাধ আর আছে কিনা আমরা জানি না। যার পেট থেকে জন্ম নেয়, যার বুকের দুধ খেয়ে মানুষ হতে হয়, যার স্নেহ-মমতা ও আকর্ষণে শিশু মানুষের রূপ লাভ করে—সাহস, বলবীর্য ও ক্ষমতার অধিকারী হয়—সে মাকে যারা সম্মান দিতে চায় না, সে মায়ের জাতকে যারা শুধু ভোগের সামগ্রী বলে মনে করে, তারা শুধু সমাজকে ধ্বংস করে না—প্রেম, মায়া, ভক্তি, ভালবাসা ও সহানুভূতি হারিয়ে জঘন্যতম পশু-প্রবৃত্তিতে চলে যায়। এদের ক্ষমা নেই। হজরত এ কথাও বলেছেন,

"সবচেয়ে বড় গুনাহের মধ্যে একটি এই যে কেহ অভিসম্পাত করে আপন পিতা-মাতাকে।"

অভিসম্পাত অর্থে তিনি বলেছেন, "যে গালি দেয় অপরের পিতাকে, আর সে গালি দেয় তাহার পিতাকে এবং গালি দেয় অপরের মাতাকে, আর সে গালি দেয় তাহার মাতাকে।"১

এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে সবচেয়ে বেশি সদ্ব্যবহার ও সম্মান পাবার উপযুক্ত? হজরত উত্তর দিলেন, 'তোমার মাতা।" লোকটি বললেন, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মাতা।" লোকটি আবার বললেন, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার পিতা।"২

হজরত শুধু মানবজাতিকে এ বাণী দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তিনি নিজের জীবনে প্রমাণ করেও তা দেখিয়েছেন। বাল্যকালে মাতৃহারা নবী আপন মাকে যদিও এ সম্মান দেখাবার সুযোগ পান নি, তবুও দাইমা হালিমাকে দেখিয়েছেন। একদা নবী (দঃ) সাহাবাদের নিয়ে বিশেষ এক পরামর্শে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় তাঁর দাইমা হালিমা সেখানে উপস্থিত হলে তিনি নিজ পাগড়ি বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে বসতে দেন এবং সসম্মানে তাঁর কথা শ্রবণ করেন। তাঁর আদেশ ও উপদেশকে তিনি ভক্তি সহকারে মান্য করতেন।

নারীদের প্রতি সদয় হতে, তাদের প্রতি প্রেম নিবেদন করতে তিনি কত সুন্দর উপদেশই না দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"যখন তুমি আহার কর তখন তাহাকে আহার করিতে দিবে এবং যখন বস্ত্র পরিধান কর তখন তাহাকে বস্ত্র পরিধান করিতে দিবে। তাহার মুখের উপর আঘাত করিবে না বা তাহাকে গালি দিবে না বা বিরক্ত হইয়া তাহাকে একলা ঘরে ত্যাগ করিবে না।"৩

"তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেরূপ অধিকার, তোমাদের উপরও তাহাদের তদ্রূপ অধিকার আছে। অতএব তাহাদের প্রতি ন্যায্য ও সদয় ব্যবহার প্রদর্শন কর।"

অধিকারের প্রশ্নে নারী সমাজের কোন স্থানই ছিল না। একই পিতা-মাতার সন্তান হয়েও নারীরা ছিল বিতাড়িত কুকুরের মতো। এদের তাড়িয়ে দিতে পারলেই যেন আপদ যেত। এরা স্বামীর সম্পত্তি পায় নি, পিতামাতার সম্পত্তি পায় নি। একই রক্তের ভাই তার বোনকে করুণার চোখে দেখার পরিবর্তে গলগ্রহের অভিশাপ বলে ভাবত। বিধবা হলে তো কথাই নেই। বিয়ে কপালে আর জুটত না। যৌবন উপভোগ করার সুযোগ মিলত না। কোন মহাপুরুষই এদের জন্য ওকালতি করে কোন আইন তৈরি করে এদের মুক্তি দিতে পারেন

www.pathagar.com

নি। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) সর্বপ্রথম নারীকে দিলেন মর্যাদা; নারী জাতিকে দিলেন মুক্তি। দিলেন তাদের অধিকার। আল্লাহর বাণী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,

"পুরুষের জন্য পিতামাতা ও আত্মীয়ের সম্পত্তিতে যেমন অংশ আছে, নারীর জন্যও পিতামাতা ও আত্মীয়ের সম্পত্তিতে তেমনি অংশ আছে। কমবেশি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ।"১ (৪ ঃ ৭)

"এবং নারীগণের উপর তাহাদের যেরূপ স্বত্ব আছে তাহাদের উপরও নারীগণের তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত স্বত্ব আছে। এবং তাহাদের উপর পুরুষগণের শ্রেষ্ঠত্ব আছে।"২ (২ ঃ ২২৮)

"এবং নারীগণকে তাহাদের দেয় মোহর প্রদান কর।"

কিন্তু যদি তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে উহার কিয়দংশ প্রদান করে তবে বিবেচনামত তৃপ্তির সহিত ভোগ কর।"৩ (৪ ঃ ৪)

পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীদের অংশ কতটুকু এ কথারও উল্লেখ কোরআনে আছে।

"আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানগণ সম্বন্ধে নির্দেশ করিতেছেন যে এক পুরুষের জন্য দুই নারীর অংশ তুল্য কিন্তু যদি দুইয়ের অধিক কন্যাই হয় তবে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। এবং যদি একই কন্যা হয় তবে তাহার জন্য অর্ধাংশ।"৪ (৪ ঃ ১১)

"যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মরিয়া যায় এবং তাহার ভগিনী থাকে তবে সে তাহার পরিত্যক্ত হইতে অর্ধাংশ পাইবে; এবং যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে তবে তাহার ভ্রাতাই তদীয় উত্তরাধিকারী হইবে; কিন্তু যদি দুই ভগিনী থাকে তবে তাহাদের উভয়ের জন্য পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই তৃতীয়াংশ; এবং যদি তাহারা ভ্রাতা-ভগিনী—পুরুষ ও নারীগণ থাকে, তবে পুরুষ দুই নারীর তুল্য অংশ পাইবে; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বর্ণনা করিতেছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।"১ (৪ ঃ ১৭৭)

হজরতের এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করল। দুর্নীতি ও কুসংস্কারের মাথায় কুঠারাঘাত হানল। সমাজ বিজ্ঞানে এক বিপ্লব আনল। নারীরা আজ অভিশপ্ত নয়। অত্যাচারিত নয়। স্বামীর চিতায় সহমরণের উপকরণও নয়। আজ তারা মুক্ত ও স্বাধীন। পিতামাতার আদরের সন্তান।

চুরি ও অবৈধ রক্তপাত

চুরি-ডাকাতির প্রথা আজকের নতুন নয়। পৃথিবীতে মানুষ আবির্ভাবের পর থেকেই এ কুপ্রথা শয়তান মানুষদের মধ্যে চাপিয়ে দিয়েছে। সিঁদ কেটে রাত্রিবেলায় পরের ঘরে প্রবেশ করে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়াই চুরি নয়, একের জিনিস অন্যে না বলে নিয়ে যাবার নামই চুরি। সিন্দুক ভেঙে সোনা-রূপা নিয়ে যাওয়াও চুরি, একজনের পকেট থেকে তার অনুমতি ব্যতীত এক পাই সরিয়ে নেওয়াও চুরি। ডিম চুরি, লেবু চুরি যেমন অপরাধ, হাতি চুরি করাও তেমনি অপরাধ। শিক্ষিত লোকের কলমের চুরি আর অশিক্ষিত ব্যক্তির সিঁদ কাটা চুরিতে কোন পার্থক্য নেই। পারমিট চুরি আর বউ চুরি কি এক পর্যায়ের নয়? মিথ্যা ভাউচারে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীকে ফাঁকি দেবার নামও চুরি—কাজ না করে মালিকের চোখে ধুলো দেবার নামও চুরি। এ চুরির প্রথা সর্বদেশে ও সর্বযুগেই কমবেশি প্রচলিত। এজন্যই বিভিন্ন নবী

টীকা ঃ ১. ও ৩ -৪. সূরা নেসা, আয়াত ৭, ৪, ১১, ১৭৭।
টীকা ঃ ২. সূরা বাকারাহ, আয়াত ২২৮।

www.pathagar.com

পয়গম্বর ও মহামনীষীরা চুরি করতে নিষেধ করেছেন ও চুরির ভয়াবহ শাস্তির কথাও বর্ণনা করেছেন। লোভ হতে চুরির প্রবৃত্তি আসে। একজনের একটি সুন্দর জিনিস দেখলে স্বভাবতই মনে একটি লোভ জন্মে। যারা এ লোভকে দমন করার শক্তি অর্জন করে তারা চুরির মতো ঘৃণ্য কাজ হতে বিরত হয়। আর যারা এ লোভকে দমন করতে পারে না তারাই চুরি করতে অভ্যস্ত হয়।

চুরি একটি পেশাগত অভ্যাসেরও কারণ। বাবা চোর হলে ছেলে চোর হতে বাধ্য হয়। কেননা শৈশব থেকে কোন ছেলে তার বাবাকে চুরি করতে দেখলে সে চুরি বিদ্যাকেই পেশা বলে মনে করে এবং এটাই সহজতম উপার্জনের পথ বলে মনে করে। একবার এ ধারণা জন্মালে শত উপদেশ দিয়েও তাকে চুরি করা হতে বিরত করা যায় না। এজন্যই দেখা যায় কোন চোরকে চুরির অপরাধে জেলে পুরলে জেলের অভ্যন্তরেই চুরি করে। চুরির সুযোগ যদি একান্তই না পায়, তাহলে অনর্থক একজনের একটি জিনিস অন্যত্র লুকিয়ে রাখে। এটাতেই সে আনন্দ পায়। এছাড়া এটাও দেখা যায় যে, চোদ্দ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে আসার পরও চুরি করে। পেশাগত এ অভ্যাস ছাড়ানো খুব কঠিন।

চুরির মূলে অবশ্য আরও যথেষ্ট কারণ আছে। অভাবের তাড়নায় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেকে চুরি করতে বাধ্য হয়। এজন্যই দেখা যায় দরিদ্র দেশে চুরি প্রথা বেশি। কেরানি থেকে আরম্ভ করে অফিসারগণ পর্যন্ত চুরি করে।

চুরির আর একটি বড় কারণ চরিত্রহীনতা। জুয়ারি, মদখোর, নারী পিপাসু, সিনেমা বায়োস্কোপ দেখার নেশা প্রভৃতি দোষণীয় কাজে একবার কেউ লিপ্ত হলে তা ছাড়ানো কঠিন। এসব কু-অভ্যাস যাদের গড়ে ওঠে তারা প্রথমে নিজের ঘরে সিঁদ কাটে। অর্থাৎ বাবার সিন্দুক ভাঙা, ভায়ের পকেট মারা, মায়ের গহনা চুরি করা, বোনের কানের পাশা বিক্রি করা শুরু করে। তারপর হাত পাকলে নিজ পর বা জাত-বিজাতের পরোয়া করে না। তিন তাসের জেদে পড়লে, মদের নেশায় ধরলে বা প্রেমিক নারীর কথা মনে জাগলে তারা চুরিকে কোন অপরাধ বলে মনে করে না। বরং চুরি না করে চুপ করে বসে থাকাই অপরাধ বলে মনে হয়। ভাল খাবার দিয়ে, কোন ওষুধ দিয়ে বা বিজ্ঞানের বড় থিওরী হাতে দিয়ে এদের এ মনোভাব থেকে বিরত করা যায় না। দরকার উপযুক্ত শাস্তি। কেমন উপযুক্ত? দু চারটা চড় কিল-ঘুষি দেওয়া, না টাকার জরিমানা করা? না হাজতে পুরে টেলিফোন করে ছাড়িয়ো নেওয়া? কোন্‌টা? এসব শাস্তি দিয়ে চোরকে দমন করা যায় না। সমাজের মানুষকে নিশ্চিন্তে ঘুমাবার ব্যবস্থাও করা যায় না। চোরকে দমন করতে হলে বৈজ্ঞানিক নবী হযরত (দঃ)-এর থিওরী নিতে হবে। এ থিওরী হাতে নিয়ে শাসন করলে দেশে চোর থাকবে না। প্রচার পত্র বিলি করতে হবে না। রেডিওতে লেকচার দিয়ে বড় বড় হুকুমের ভয় দেখিয়েও চোরকে হাসাতে হবে না। চুরির মহা অপরাধ থেকে নিবৃত্তি করতে হলে, দেশকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে, কঠোর হস্তে হজরতের নির্দেশ পালন করতে হবে। দেখুন কি নির্দেশ তিনি দিয়েছেন হজরত বলেছেন,

"চোরের হাত কাটা যাবে এক চতুর্থ দীনার বা তার অধিক মূল্যের চুরিতে"—

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন, "রসুল হাত কেটে দিয়েছিলেন তিন দেরহাম মূল্যের একটি ঢালের চুরিতে।"

'অন্যত্র বলেছেন, "চোরের হাত কাটা যাবে এক-চতুর্থ দীনার বা তার অধিক মূল্যের চুরিতে।" "আল্লাহ্ অভিশপ্ত করুন চোরকে। সে চুরি করে একটি ডিম আর কাটা যায় তার হাত বা চুরি করে রশি আর কাটা যায় তার হাত।"

হজরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, "নবী (দঃ)-এর সময় চোরের হাত কাটা যেত না, এক ঢালের কম মূল্যের চুরিতে।"[১]

চুরির অপরাধে আল্লাহর নির্দেশ ঠিক একইরূপ।

www.pathagar.com

"পুরুষ চোর ও নারী চোর কিছু অর্জন করলে তবে তার পরিবর্তে আল্লাহ্ হতে শাস্তিস্বরূপ তাদের হাতসমূহ কেটে দাও এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।"১ (৫ ঃ ৩৮)

অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা হজরত দিয়েছেন। এগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে চোরের শাস্তি দিলে দেশে চুরির উৎপাত থাকবে না। যাদের হাত কাটা যাবে তারা সমাজে বেঁচে থাকলেও মার্কা মারা হয়ে থাকবে। এত বড় শাস্তি কোন চোর দেখলে সে আর চুরি করবে না। চুরির বিচারে মায়া-মমতা ফেলে শাস্তির বিধান দেওয়া উচিত। অবশ্য যারা ভুলবশত চুরি করে, সংসর্গের দোষে চুরির অপরাধে জড়িত হয় বা অভাবের তাড়নায় নিজকে চোর নামে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হয় তাঁদের লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করে ক্ষমা করা চলে। কেননা, কোরআনে শাস্তির ব্যবস্থা ঘোষণা করার পর আল্লাহ্ নিজেকে করুণাময় ও ক্ষমাশীল বলেও আখ্যায়িত করেছেন। কোরআনের এ তাৎপর্য পূর্ণ বাণীর উদ্ধৃতি আমি এখানে পেশ করছি না। সুধীমণ্ডলী ও বিচারকদের খুঁজে বের করার জন্য রেখে দিলাম।

দুর্নীতি ও অনাচারের মধ্যে অবৈধ রক্তপাত অন্যতম। যে সময় হজরত মুহাম্মদ (দঃ) জন্মলাভ করেন সে সময় আরবের ঘরে-ঘরে, বংশে-বংশে, গোত্রে-গোত্রে ছিল একটা ঈর্ষা ও বিদ্বেষের ভাব। সামান্য কারণেই বিরাট একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হতো। শান্তি ও শৃঙ্খলা তিরোহিত হতো। মানুষে-মানুষে ও গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে জ্বলত হিংসার আগুন। এ হিংসার আগুন নেভাতে, প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে হজরতের বাণী। তিনি বললেন,

"মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম বিচার হবে রক্তপাতের।"২ (সহীহ্ বুখারী)

"যে অস্ত্র ধারণ করে আমাদের বিরুদ্ধে সে নহে আমাদের ।"৩ (সহীহ বুখারী)

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মন্দ তিন ব্যক্তি-(১) যে ধর্মদ্রোহিতা করে, (২) যে ইসলাম খোঁজে অজ্ঞতার যুগের রীতিতে, (৩) যে অযথা কাহারো রক্তক্ষয় চাহে।"১ (সহীহ্ বুখারী)

মানুষ নিজেকে চেনে না। নিজের আত্মাকে জানে না। নিজের সৃষ্টিকর্তার পরিচয়টুকুও নেয় না। সামান্য একটা কুনী পোকার সৃষ্টি যারা করতে জানে না, তারা যদি স্বার্থের বশে, হিংসার বশে সৃষ্টি সেরা মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করে তারা কি রেহাই পাবে? তাদের কি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? না তাদের জন্য কঠিন বিচার। মহা বিচারকের কাছে তারাই হবে সবচেয়ে ঘৃণ্য ও পাপী।

আমরা এক ভয়াবহ যুগে এসে পৌঁছেছি। ধর্ম-কর্ম ছেড়ে অধর্মের পথে পা বাড়িয়েছি। মূল্যহীন প্রাণীদের মূল্য বেড়ে চলেছে আর মূল্যবান জীবগুলির মূল্য আশাতীতভাবে কমে যাচ্ছে। ভেড়া-মুরগি, গরু-ঘোড়ার মূল্য কেমন ঊর্ধ্বগতিতে উঠেছে অথচ মানুষের মূল্য কত দ্রুতগতিতে নিম্নমুখী হচ্ছে। সামান্য দশ টাকার বিনিময়ে একটি অমূল্য জীবনের সর্বনাশ ঘটছে। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় তাকালে দেখা যায় বিশ্বের মানুষ কেমন বিবেকহীন, অন্ধ ও অবিশ্বাসী হয়ে সমাজকে পঙ্কিল সলিলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। এখনও সময় আছে। চলুন যুগ যুগের অমর বৈজ্ঞানিক হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণী অনুসরণ করে সমাজবিজ্ঞানে এক বিপ্লব আনি। দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করি। সে বাণী দিয়ে হজরত (দঃ) তাঁর প্রিয়তম অনুচরদের প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন সেই বাণী নিয়ে আমরাও চলুন দুর্নীতি, অনাচার ও অত্যাচারের মাথায় কুঠারাঘাত হানি।

"তোমরা আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কাহারো শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না ও পরস্পরের দুর্নাম বা অপবাদ প্রচার করিবে না এবং সৎকার্য পালনে অবাধ্য হইবে না।"২

টীকা ঃ ১. সূরা নেসা, আয়াত ৭, ৪, ১১, ১৭৭।

টীকা ঃ ১. কোরআন ঃ সূরা মায়েদা, আয়াত ৩৮।

টীকা ঃ ২ - ৩ সহীহ্ বুখারী। শাস্তি পরিচ্ছেদ। তর্জমা-আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ।

টীকা ঃ ১ . সহীহ বুখারী। শাস্তি পরিচ্ছেদ। তর্জমা-আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ।

২ . শায়খান। সংগৃহীত-হাদিসের আলো. ২য় খণ্ড।

www.pathagar.com

শরীর বিজ্ঞান

"হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট স্বাস্থ্য, শান্তি, বিশ্বাস, শিষ্টাচার এবং তক্‌দিরে সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি।" (হাদিস বয়হাকী)

দেহ

"হে আল্লাহ্, আমায় রক্ষা কর। আমার প্রতি দয়া কর, আমায় সুস্থ রাখ এবং রেজেক দান কর।" (সগির)

হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এ দৈনন্দিন প্রার্থনার একাংশ উপর্যুক্ত বাণীটি। তিনি ক্ষমা চেয়েছেন, দয়া চেয়েছেন, সুস্থ ও সবল শরীর চেয়েছেন এবং পরিমিত আহারের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছেন।

আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি-বৈচিত্র দেখতে বিশ্বের আনাচে-কানাচে ঘুরতে হয় না। যে-দিকে তাকাই সে-দিকেই সৃষ্টির অপরূপ লীলা চোখে পড়ে। পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-তারা, আকাশ-বাতাস, জল-স্থল, তরুরাজি ও শস্যশ্যামল পৃথিবী এ রূপের লীলাক্ষেত্র। তার চাইতেও লীলাময় স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি আমাদের এ সুন্দর দেহ। সারা বিশ্বের সৌন্দর্য নিয়ে, সারা বিশ্বের পদার্থ নিয়ে, সারা বিশ্বের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ নিয়ে গঠিত এ মানবদেহ। এ দেহে আছে অগ্নি, আছে বায়ু। জল-স্থল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মরুভূমি সবই যেন শোভা পায় এ ক্ষুদ্র দেহখানিতে। অগ্নি আছে বলে পরিপাক ক্রিয়া হয়, হিংসার সৃষ্টি হয়। বায়ু আছে বলে হৃদপিণ্ড আলোড়িত হয়। জল আছে বলে অনু-পরমাণু জীবিত আছে, রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। শিরা-উপশিরা ও ধমনীগুলি যেন খাল-বিল, নদী-নালা; লোমগুলি যেন বনজ সম্পদ, মনটি শূন্য আকাশ, নাসিকারন্ধ্র আগ্নেয়গিরির গহ্বর, চক্ষু আকাশের তারা। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন, সোনা, রূপা, তামা, লোহা সব ধাতু ও গ্যাসের সমন্বয়ে যেমন এ বিশ্ব গড়া তেমনি ঐ সব ধাতু ও গ্যাসীয় বস্তুর মিশ্রণে এ দেহ গড়া। তাই কার না মন চায় এ নিখুঁত সৌন্দর্য-মণ্ডিত দেহটিকে সুন্দর করে দেখতে, সুন্দরভাবে সাজাতে ও সুন্দরভাবে রক্ষা করতে।

রক্ত, মাংস, মজ্জা, বীর্য ও হাড় এ দেহের প্রধান উপাদান। এরা সব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটির অভাবে অন্যটির অস্তিত্ব লোপ পায়। এমন সুসমন্বয় আর কোন সৃষ্টির মধ্যে আছে বলে আমার জানা নেই। খাদ্য হতে রক্তের সৃষ্টির, রক্ত হতে মাংসের সৃষ্টি, মাংস হতে হাড়ের সৃষ্টি। হাড় থেকে আবার মজ্জা ও বীর্যের সৃষ্টি। কোরআনে কত সুন্দরভাবেই না এর বিশ্লেষণ আছে।

"তবে কি সে জরায়ুতে নিক্ষিপ্ত একবিন্দু শুক্র মাত্র নহে? তৎপর সে রক্তপিণ্ড হইয়াছিল, তৎপর তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তৎপর তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি উহা হইতে যুগলরূপে পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

(সূরা কেয়ামাহ, আয়াত ৩৭,৩৮,৩৯)

মানবদেহের উপাদানগুলির মধ্যে জল, বায়ু, মাটি, অগ্নি এগুলিই প্রধান। প্রত্যেকটি ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের উপাদান মেলে। যেমন জলের মধ্যে আছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। হাইড্রোজেন কার্বন জাতীয় উপাদানের সঙ্গে মিলে কার্বহাইড্রেটের সৃষ্টি করে, যা শরীরের জন্য অতীব প্রয়োজন। নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি। এই অক্সিজেন রক্তকে শোধন করে, ফলে বিশুদ্ধ রক্ত শরীরে প্রবাহিত হয় ও আমাদের কার্য-ক্ষমতা এনে দেয়।

www.pathagar.com

মাটি হতেই এ দেহের সৃষ্টি। মাটির কাঠামো ছাড়া কাঠ, কয়লা, অগ্নি, পাথর বা জল দিয়ে এমন কার্যোপযোগী দেহ গঠন সম্ভব নয়। কাঠের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত করা সম্ভব নয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার যোগসাধনও অসম্ভব। অগ্নি, পাথর বা শুধু জল দিয়েও এমন সুন্দর ও সুশ্রী দেহ তৈরি সম্ভব নয়। মাটিই প্রকৃত উপাদান যা দিয়ে মানবদেহ গঠন সম্ভব। শরীর-বিজ্ঞানী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এ তত্ত্বমুলক থিওরী আমাদের বহু পূর্বেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"সমস্ত মানুষ আদম সন্তান এবং আদম মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে।" (সগির)

এখান থেকে আমরা কয়েকটি রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি। প্রথমত, সাদা, কাল, বিভিন্ন বর্ণের ও আকৃতির মানুষ প্রকৃতপক্ষে একই মানব আদম হতেই আগত। আদমই সমগ্র মানবমণ্ডলীর আদি পিতা। সেখান হতে বহুরূপে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন জলবায়ু ও পরিবেশে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিতে তারা রূপ নিয়েছে। শারীরিক উপাদান এদের ভিন্ন নয়—একই। কেউ ভাত খায়, কেউ রুটি খায়। কিন্তু সবার পরিপাক যন্ত্র একইভাবে কাজ করে; একই রক্ত তৈরি করে ও একই হাড়-মাংস ও মজ্জার সৃষ্টি করে। চিন্তাধারা ভিন্ন হলেও মস্তিষ্কের উপাদান ভিন্ন নয়। খাদ্যের পার্থক্য থাকলেও রক্তকণিকার পার্থক্য নেই। শারীরিক গঠনের তারতম্য থাকলেও যৌনচেতনার পার্থক্য নেই। বর্ণ-বৈষম্য থাকলেও দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তির কোন বৈষম্য নেই। তবে বৈষম্য কোথায়? বৈষম্য শুধু আমাদের মনে। তাই মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে এত প্রভেদ। আজ সাদা চামড়ার মানুষ কাল চামড়ার মানুষকে ঘৃণা করে। হিন্দু মুসলমানকে বিদ্বেষের চোখে দেখে। মুসলমান হিন্দুদের শত্রু মনে করে। খ্রীষ্টান ইহুদীদের উৎখাত করার পরিকল্পনা করে। ইহুদীরা ষড়যন্ত্রের জাল বুনে খ্রীষ্টানদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। বৌদ্ধেরা জৈনদের নিকৃষ্ট মনে করে। জৈনরা বৌদ্ধদের অস্পৃশ্য বলে আখ্যায়িত করে হানাহানি, খুনোখুনি, ঝগড়া-বিবাদ শুধু স্বার্থের লোভে, হিংসার বশে ও বিকারগ্রস্ত মনের দুষ্ট কল্পনার ফলে সংঘটিত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলার বুকে যে তাণ্ডবলীলা বয়ে গেল তা কারো অজানা নেই। যার ফলে তিরিশ লক্ষ নরনারী পাঞ্জাবীদের নির্মম অত্যাচারে প্রাণ হারাল। সাড়ে সাত কোটি হিন্দু-মুসলমান মান-ইজ্জত দিল, সম্ভ্রম দিল। এ পাঞ্জাবীরা আদম সন্তানের পরিচয় দেয় নি। মাটির মানুষ বলেও স্বীকার করে নি। মানুষ নামের এরা কলঙ্ক। তাই হিংস্র জন্তুর ন্যায় হিংসার বশে সাড়ে সাত কোটি মানুষের বুকে বুলেট মারল।

সবাই মোরা আদম সন্তান—এ থিওরী হাতে নিলে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য থাকে না। খ্রীষ্টান-ইহুদীর প্রভেদ থাকে না। পারসিক ও সাবেইনদের মধ্যেও কোন তারতম্য থাকে না। মানুষ এবং মানবতা এ দুটো প্রশ্ন তখন সবার মস্তিষ্কে আলোড়ন এনে দিত। ক্ষেপণাস্ত্র তখন তৈরি হতো না। অ্যাটম বোমা, নেপাম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা দিয়ে একটা দেশ ও জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার শয়তানি পরিকল্পনাও মাথায় আসত না। শান্তি চুক্তির নেশায় তখন তারা উন্মাদ হয়ে উঠত। সাদা-কালো মনের মাঝে প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হতো। আর পরস্পর কল্যাণের নেশায় জীবন-মন সঁপে দিত।

দ্বিতীয়ত, মৃত্তিকার স্বভাব শান্ত ও স্থির। যারা আদম সন্তান বলে দাবি করে অর্থাৎ যারা মানুষ নামে আখ্যায়িত তাদের স্বভাব মৃত্তিকার মতোই হওয়া উচিত—অর্থাৎ শান্ত-শিষ্ট, ভদ্র ও অমায়িক। ক্রুদ্ধ অগ্নির স্বভাব তাদের মধ্যে থাকা উচিত নয়।

তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে রসুলের বাণী প্রমাণ করে আমরা দেখব যে মানুষ সত্যি মাটি হতে তৈরি কি না। এ প্রশ্নের সমাধান করতে হলে মাটির উপাদান ও মানব শরীরের উপাদান বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন পড়ে। যদি মাটি ও মানব শরীরের উপাদান একই হয়, তবে প্রমাণিত হবে যে মানুষ মাটি থেকে তৈরি।

মাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এর মধ্যে আছে—ক্যালসিয়াম,ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল, ফসফরাস প্রভৃতি উপাদান। মানব শরীরের উপাদান কি? শরীর

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীরা মানবদেহে ঠিক উপর্যুক্ত উপাদানগুলিই খুঁজে পান অর্থাৎ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস ইত্যাদি। তাহলে দেখা যায়, মাটির উপাদান ও মানবদেহের উপাদান একই। অর্থাৎ মাটিই মানবদেহের মূল উপাদান। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) কোন্ সময় কোন্ কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে মাটি ও মানবদেহের উপাদানগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করেছেন ও পরীক্ষা করে এদের সমতা দেখিয়েছেন এ সাক্ষ্য আমাদের হাতে নেই। তবুও চোদ্দ শ' বছর পরে আমরা শরীর বিজ্ঞানী ও রসায়ন-বিজ্ঞানীরা তাঁর এ পরীক্ষার সত্যতা ও ফলাফল দেখে হতবাক হই। তিনিই প্রকৃত শরীর-বিজ্ঞানী যিনি মানবদেহের মূল উপাদান নির্ভুলভাবে খুঁজে বের করেছেন ও আমাদের হাতে দিয়েছেন। তাঁর পরক্ষিায় যে কোন ভুল নেই তা প্রমাণিত হয় কোরআনের বাণী হতে। কোরআন বলে,

"তিনি মৃন্ময় পাত্রের ন্যায় বিশুষ্ক মৃত্তিকার দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন।"[১] (৫৫ ঃ ১৪)

"অনন্তর তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে উহারাই কঠিন সৃষ্টি না আমরা সেই সৃষ্টি—যাহাদিগকে আমি ঘনীভূত মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি।"[২] (৩৭ ঃ ১১)

"আমি ইহা (মাটি) হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং ইহারই মধ্যে তোমাদিগকে প্রেরণ করিব এবং ইহা হইতেই তোমাদিগকে পুনরায় সমুত্থিত করিব।"[৩] (২০ ঃ ৫৫)

শরীর-বিজ্ঞানী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণী অনুসরণ করে আমরা অগ্রসর হবো এবং দেখব তিনি আমাদের জন্য কি দান করেছেন।

"দেহের সহিত মস্তিষ্কের যেরূপ সম্বন্ধ, ঈমানের সহিত সহিষ্ণুতার তদ্রূপ সম্বন্ধ।"[৪] (সহীহ বুখারী)

এ মূল্যবাণ বাণী সম্পর্কে এবার আমরা আলোচনা করব এবং দেখব মস্তিষ্কের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ কেমন।

মস্তিষ্ক

জীবদেহের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কবিহীন দেহ মূল্যহীন। যার দেহ আছে, প্রাণ আছে, তার মস্তিষ্ক আছে। মস্তিষ্ক নেই এরূপ কোন জীব আছে বলে আমার জানা নেই। একটি মাত্র ব্যতিক্রম আমার চোখে পড়ে—যার দেহ আছে, ক্ষয়-বৃদ্ধি আছে, জীবন আছে, বংশবৃদ্ধি আছে, যৌন-চেতনা আছে অথচ মস্তিষ্ক নেই—সেটা হলো বৃক্ষরাজি ও তরুলতা। এ নিয়ে ইনশা আল্লাহ্ পরে আলোচনা করব। এখন আলোচনা করব শুধু আমাদের দেহ ও মস্তিষ্ক নিয়ে। দেহের সঙ্গে মস্তিষ্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দেহের অবস্থা ভাল না থাকলে মস্তিষ্ক ভাল থাকে না। এটা আমরা শরীর বিজ্ঞান না পড়েও বুঝতে পারি। তবু কেন দেহ সুস্থ না থাকলে মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে না, রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর এ কথাটি বিজ্ঞানের পদ্ধতিতেই প্রমাণ করে দেখতে চাই।

জীবদেহের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য স্নায়ুতন্ত্র, ইংরাজিতে যাকে বলে Nerve System—সমস্ত দেহে জালের মতো বিস্তার লাভ করেছে। বিভিন্ন তন্ত্র দেহের বিভিন্ন অংশে সন্নিবেশিত হওয়ায় এরা স্ব স্ব ধর্ম পালন করতে সক্ষম হয় এবং সমন্বয় রক্ষা করে

টীকা ঃ ১ কোরআন ঃ সূরা রহমান, আয়াত ১৪।
২. ঐ ঃ " সাফ্‌ফাত, " ১১।
৩. ঐ ঃ " তা'হা, " ৫৫।
৪. সহীহ বুখারী।

www.pathagar.com

দেহকে সচল রাখে। এক কথায় বলা চলে যে, এই স্নায়ুমণ্ডলীই জীবদেহের পরিচালক। স্নায়ুতন্ত্র দুভাগে বিভক্ত। যথা—

(১) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System)

(২) স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র (Autonomous Nervous System)।

মস্তিষ্ক কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটা অংশ। এই মস্তিষ্ক থেকে বারো জোড়া ও মেরুমজ্জা হতে একত্রিশ জোড়া শাখা স্নায়ু বের হয়েছে। দেহের অনুভূতি-বাহক স্নায়ুমণ্ডলী এই মেরু মজ্জা ও মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে সংযোগসাধন করেছে। এ জন্যই শরীরের যে কোন অঙ্গে আঘাত পেলে বা বেদনা অনুভব করলে অথবা ঠাণ্ডা, গরম স্পর্শ করলে আমরা বুঝতে পারি। গুরু মস্তিষ্কের (Cerebrum) অনুভূতি কেন্দ্রের সহিত দেহের স্নায়ুসূত্রের যোগ আছে। শরীর বিজ্ঞান পাঠ করলে এর ধারাবাহিক বর্ণনা মেলে। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম, দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কের সংযোগ কেমন নিবিড়। শরীর বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও —শরীরের বিভিন্ন অন্ত্রে-তন্ত্রে নিজ হাতে অস্ত্র চালনা করে পরীক্ষা করার সুযোগ না হলেও কি সুন্দরভাবেই না হজরত (দঃ) শরীর বিজ্ঞানের থিওরী দিয়েছেন; যে থিওরী নির্ভুল ও সচল।

দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্বন্ধ যেমন গাঢ়, ঈমানের সঙ্গেও ধৈর্য বা সহিষ্ণুতার সম্বন্ধও তেমনি গাঢ়। যার ধৈর্য আছে সেই ঈমানদার। অপরদিকে এ কথাও বলা যায় যে সেই প্রকৃত ঈমানদার, যার সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য আছে সমাজ বিজ্ঞানের জন্য এ থিওরী অমোঘ।

হজরত বলেছেন,

"মানুষের দেহে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে। অতএব সে প্রত্যেকটি গ্রন্থির জন্য একটি সৎকার্য করিবে।"

(হাদিসের আলো, ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ১৩৩)

অজানাকে জানবার ও অচেনাকে চেনবার কৌতূহল মানুষের চিরন্তন তাই যুগ যুগ ধরে মানুষ সাধনা করে এসেছে। এ সাধনার কোন বিরাম নেই। যুগ যুগ ধরে চলছে ও চলবে। তবে মহাপুরুষগণ কোন গবেষণাগারে না গিয়ে, কোন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না নিয়ে কি করে এমনসব জটিল তত্ত্ব আমাদের দিয়ে গেছেন সেটা ভেবেই আকুল হই। এতদিন আমরা হজরতকে সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ধর্মপ্রচারক হিসাবে দেখেছি। তাঁর জটিল তত্ত্বমূলক বাণী বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় বিশ্লেষণ করে দেখি নি। তাই এত বড় একজন বৈজ্ঞানিককে আমরা সীমিত গণ্ডির মধ্যেই যেন আবদ্ধ করে রেখেছিলাম। বিজ্ঞানের সামান্য একটু চিন্তাধারার মাঝে নিজেকে নিমজ্জিত করে দেখতে পাচ্ছি— অসাধারণ এক বৈজ্ঞানিককে। তাঁর ব্যাপক চিন্তাধারার সন্ধান নেবে কার সাধ্য? তাঁর সীমাহীন জ্ঞানতত্ত্ব উদ্ঘাটন করবে কার সাহস? তাই সন্ধান ও উদ্ঘাটন করার প্রচেষ্টা না করে শুধু তাঁর বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দু-একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ও জ্ঞানীদের চিন্তাধারায় আলোড়ন এনে দিতে চেষ্টা করছি।

মানবদেহ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর গঠনপ্রণালী কেমন জটিল রহস্যময় তা শরীর-বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এই মাটির দেহে সর্বমোট ২০৬ খানা অস্থি আছে। এই ছোট-বড় অস্থিগুলির মধ্যে পারস্পরিক একটা সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধের সমন্বয় সাধন করে অস্থিগ্রন্থি বা Joints। সর্বমোট ৩০৬টি গ্রন্থি এই অস্থিগুলিকে একটি অপরটি হতে প্রয়োজনবশত পৃথক করে অঙ্গ চালনার সুবিধে করে দেয়। যদি এ গ্রন্থিসমূহ না থাকত তবে পা সোজা করা যেত না, হাত দ্বারা কাজ করা চলত না, ওঠা-বসা, খাওয়া-শোওয়া কিছুই হতো না। ছোট-বড় কাঠের টুকরো দিয়ে আমরা ঘরের ফার্নিচার তৈরি করি। এ ফার্নিচারকে আমাদের শরীরের মতো বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে ছোট-বড় উঁচু-নিচু করে সুবিধামতো কাজে লাগাতে অসমর্থ হই, এর কারণ এদের গ্রন্থি নেই। যদিও বা কৃত্রিম গ্রন্থির সৃষ্টি করে শুধু ভাঁজ করানোর ব্যবস্থা করা যায় তবু গ্রন্থি মজ্জার সৃষ্টি করে যোগসাধন

www.pathagar.com

করা চলে না। হজরত একাধারে মানব শরীরের গ্রন্থি-সমূহের সংখ্যা দেখিয়ে নতুন তত্ত্ব দিয়েছেন, অন্যদিকে সৃষ্টি-রহস্য দেখিয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পন্থা বর্ণনা করেছেন।

অস্থি প্রসঙ্গে হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর এ গবেষণামূলক বাণী বৈজ্ঞানিকদের জন্য পেশ করছি। এ বাণী সাধারণ বাণী নয়। চিন্তা-জগতে বিপ্লব আনয়নকারী এ মহাবাণী। যুগ যুগের অবিশ্বাসী ও ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের জন্য এক অমোঘ বাণী। এ বাণীতে তিনি মানবগোষ্ঠীকে সতর্ক করে বলেছেন যে, মানুষ মরে গেলেও নিস্তার নেই। অস্থিমজ্জা মাটির সঙ্গে মিশে গেলেও রেহাই নেই। মহাবিচারের দাঁড়িপাল্লায় তাকে মাটির অণু-পরমাণু ভেদ করে পূর্ণ আকৃতি নিয়ে আবির্ভাব হতে হবে। আর এ জন্যই তার লেজের হাড় অর্থাৎ (Back Bone) মাটির সঙ্গে মিশবে না। এর ক্ষয় হবে না। মাটির উপাদানে মিশবেও না। এর ওপর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ইনশা আল্লাহ্ রসায়ন বিজ্ঞান পরিচ্ছেদে দেখবো। এখানে তাঁর বাণীটি উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন,

"মানুষের সব কিছুই পচিয়া যাইবে লেজের হাড় ছাড়া—উহা হইতেই জোড়া হইবে সমস্ত অঙ্গ।" (সহীহ বুখারী)

শরীর-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের তিনটি জিনিসের ওপর দৃষ্টি পড়ে। প্রথম—দেহ, দ্বিতীয়—মন, আর তৃতীয় —আত্মা। এ তিনটিকে নিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ শরীর গঠিত হয়।

দেহকে নিয়েই সামান্য কিছু আলোচনা করে আমরা দেখতে পেলাম মাটি, বায়ু, অগ্নি ও জল—এ কয়টিই এর আসল উপাদান। মূলবস্তু হিসাবে দেহ অভ্যন্তরে আছে অস্থি, মজ্জা, রক্ত ও মাংস। এ সব দিয়েই গড়া আমাদের এ সুন্দর দেহ। দেহগঠন প্রণালীতে দেখা যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ। ইট দিয়ে যেমন দালান গাঁথা হয়, তেমনি এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমন্বয়ে গঠিত হয় জীবদেহ। এ কোষগুলিকে জীবকোষ (Cell) বলে। শরীর-বিজ্ঞানে এসব জীবকোষ, অস্থি, মজ্জা, রক্ত ও মাংসের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও এদের কার্যকারিতার বিষয় বর্ণিত আছে। এ নিয়ে আমার এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করছি। তাই শুধু 'মন' ও 'আত্মার' ওপর কিছুটা আলোকপাত করে দেহ রক্ষার বিবিধ উপায় ও হজরতের মূল্যবান নির্দেশ সমূহের ওপর যুক্তিযুক্ত আলোচনা করে শরীর বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

মন

মস্তিষ্ক দেহের একটি প্রধান অঙ্গ। এই মস্তিষ্ককে যে অদৃশ্য শক্তি পরিচালনা করে সেটাই মন। এর প্রকৃত সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। আমি **'বিজ্ঞান না কোরআন'** পুস্তকে **'মনের বিকাশ'** পরিচ্ছেদে কিছুটা আলোচনা করেছি। সেখানে মনের যে সংজ্ঞা দিয়েছি তা নিম্নরূপ ঃ

"স্পর্শ দ্বারা যা অনুভব করা যায় না অথচ যার অস্তিত্ব আছে, যার ক্রিয়া আছে, যার বিকাশ আছে তা-ই আমাদের মন। এর শক্তি অসাধারণ। এর শক্তি আমাদের কল্পনার বহু ঊর্ধ্বে। একে ধরবার মতো কোন কৌশলই আজ পর্যন্ত আমরা বের করতে পারি নি।"

মন পরিকল্পনা দেয়। বুদ্ধি ও বিবেকের সঙ্গে পরিচালিত হয়। মন স্থিতিশীল নয়। মুহূর্তেই সাগর মরু পার হয়ে সপ্ত আকাশে আরোহণ করে— মুহূর্তের মধ্যেই আবার নিকট হতে নিকটতম প্রান্তে এসে পৌছায়। এ অদৃশ্য জগৎকে বুঝবার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই। সমস্ত দেহরাজ্যের ওপর এই মনের প্রভাবই বিস্তার লাভ করে। কিছু দেখতে ও উপভোগ করতে চাইলে চোখ সে দিকেই দৃষ্টি দেয়, শুনতে চাইলে কান সক্রিয় হয়, কাজ করতে চাইলে হাত তৈরি থাকে। মন যা কিছুই পরিকল্পনা করে মস্তিষ্ক সেটাকে ত্বরিত

www.pathagar.com

গতিতে রূপ দেয় এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তৈরি থাকতে আদেশ করে। হিংসা বা অহঙ্কারের ভাব এলে দেহে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। শিরা-উপশিরা স্ফীত হয়ে ওঠে, ক্ষতি সাধনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি হয়। আবার শোক বা সহানুভূতির মনোবৃত্তি হলে এক প্রকার করুণ রসের সৃষ্টি হয় এবং মস্তিষ্কে আলোড়ন এনে দেয়; ফলে চক্ষু হতে অশ্রু ঝরে।

যে দেহে মন নেই সে দেহ অচল, অসাড় ও অকর্মণ্য। মাটির পুতুল হাসতে জানে না, কাঁদতে জানে না, প্রেম নিবেদন করে না। কারণ এতে মন নেই, আত্মা নেই। দেহে মন আছে। তাই এর মূল্য অত্যধিক। মনকে কলুষিত করা যায়। মনকে আবার পবিত্রও করা যায়। সৎ চিন্তা, সৎ সঙ্গ, সদালাপ ও সৎকার্যে মন পবিত্র হয়। এক অনাবিল শান্তি মনের মাঝে বিরাজ করে। কুচিন্তা, অসৎ সঙ্গ ও পাপকার্যে মন কলুষিত হয়ে যায়। হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তি আসে ও অমঙ্গল চিন্তায় বিভোর থাকে। এ হীন প্রবৃত্তিকে দমন করাই প্রকৃত বীরত্ব। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) পবিত্র মন ও পবিত্র রসনাকে কামনা করে তাই আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন—"হে আল্লাহ্! তোমার নিকট সত্যবাদী রসনা ও সুস্থ হৃদয় কামনা করিতেছি এবং যাহা তুমি অবগত আছো সেই অকল্যাণ হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি এবং যে কল্যাণ তুমি অবগত আছো তাহা কামনা করিতেছি এবং যাহা তুমি জ্ঞাত আছো সে পাপের মার্জনা চাহিতেছি। নিশ্চয়ই তুমি সকল গুপ্ত বিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (তিরমিজি) "প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই করাকেই প্রকৃত জেহাদ বলে।" (সৌভাগ্যের পরশমণি)

মন যদি বিষাক্ত হয়ে যায়, মন যদি কলুষিত হয়, মন যদি তার ইচ্ছামতো আকাশ-পাতাল ভ্রমণ করে তবে সে মন দিয়ে দেহকে পবিত্র রাখা যায় না। সে মন দিয়া সাধনা হয় না। সে মন দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না। এ মনের সংস্কার করতেই এসেছিলেন যুগেযুগে নবী, পয়গম্বর ও মহাপুরুষগণ। তাঁহারা মন ও মুখ এক করে আত্মাকে শুদ্ধ করেছেন, ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছেন বৃহত্তর সামাজিকতার ভিত্তি দিয়েছেন ও সুষ্ঠু মানবতার বিকাশ করেছেন। বিভিন্ন ধর্মের মনীষীদের আদর্শ, চরিত্র ও বাণী তাই প্রমাণ করে মনের ওপর কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ যা যুগে যুগে মনীষীরা দিয়েছেন তাঁর উদ্বৃত্তি দিয়ে এর সত্যাসত্য বিচার করছি—

"মন হইতে সমস্ত কুচিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, লাম্পট্য, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য ও নিন্দা বাহির হইয়া আসে। এই সকলই মানুষকে অপবিত্র করে। অধৌত হস্তে ভোজন ততটুকু মানুষকে অপবিত্র করে না।"[১]

"যে মন দিয়ে সাধনা করবে তা-ই যদি বিষাক্ত হয়ে পড়ে তাহলে সাধনা অসম্ভব।"[২]

"মন চঞ্চল থাকাতে কিংবা বিষয়াসক্ত হওয়াতে সদুপদেশ, সাধু সঙ্গাদি সকলি বিফল হয়।"[৩]

"মানুষের দেহটা যেন হাড়ি আর মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলো যেন জল, চাল ও আলু।"[৪]

আমি প্রথমেই লিখেছি যে এ অসাড় দেহকে পরিচালনা করে মন। যদিও মন এবং দেহ ভিন্ন তবুও বলতে হয় যে মন ছাড়া দেহ অকর্মণ্য। এ মনকে সুন্দর করার যে পন্থা হজরত মুহাম্মদ (দঃ) আমাদের দেখিয়েছেন তার মধ্যে আরাধনা সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা আল্লাহর প্রতি ভয়, ভক্তি ও বিশ্বাস থাকলে মন কেন্দ্রীভূত ও পবিত্র থাকতে বাধ্য। যার মন পবিত্র হয়, সে-ই বেহেশ্‌তের অধিকারী হয়। হজরতের বাণী এ কথারও সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেন—

"প্রত্যেক দ্রব্যেরই সৌন্দর্য আছে এবং মনের সৌন্দর্য আল্লাহর আরাধনা।"[৫] (বায়হাকী)

"আল্লাহর আরাধনা ব্যতীত বাহুল্য বাক্য অন্তরের আবর্জনা স্বরূপ এবং অবিশুদ্ধ অন্তর বিশিষ্ট লোকই আল্লাহর অপ্রিয়।"[৬] (মিশকাত)

টীকা ঃ ১. বাইবেল মথি—১৫,২০।
২ —৪. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ। কৃত—সুরেশচন্দ্র দত্ত। পৃষ্ঠা—৯২।
৫ —৮ হাদিস। সংগৃহীত হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড। পৃষ্ঠা—১১-১২।

www.pathagar.com

"সেই ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট যাহার রসনা সর্বদা আল্লাহর আরাধনা করে এবং যাহার হৃদয় নিয়ত তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যাহার সহধর্মিণী স্বয়ং বিশ্বাসিনী এবং সতত তাহাকে ঈমানের পথে সাহায্য করে।"[৭] (তিরমিজি)

"রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্ বলিলেন— যে ব্যক্তি একদিনও আমার আরাধনা করিয়াছে বা কখনও আমাকে ভয় করিয়াছে—তাহাকে দোজখ হইতে বাহির কর।"[৮] (তিরমিজি, বায়হাকী ও মিশকাত)

দুঃখ-দৈন্যে, অভাব-অনটনে মন অনেক সময় বিষাক্ত হয়ে ওঠে। তাই চুরি, ডাকাতি, খুন-খারপি প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি মনে জাগে মনের এ অবস্থা পরিবর্তনে প্রয়োজন ধৈর্য অবলম্বন করা ও আল্লাহর আরাধনা করা। এছাড়া অনেক সময় দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, রোগ শোক প্রভৃতি কারণে মন দুর্বল হয়ে পড়ে। এরূপ মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখতে হলে খেলাধুলা, হাসি-রহস্য ও প্রিয়জনদের পরিবেশে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলে শরীর ও মন সুস্থ হয়।

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) -এর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি শুধু পর্বত গুহায় বসে বসে ধ্যান করেন নি, অথবা সমস্ত রাত্রি জেগে আল্লাহর উপাসনাই করেন নি। আরাধনার সময় তিনি আরাধনাই করতেন— ঘুমাতেন না। ঘুমের সময় আরাধনা করতেন না। জ্ঞানীগুণী ভক্তবৃন্দের মধ্যে যখন বসতেন তখন তাঁদের নিয়ে সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও পরজগতের তত্ত্ব আলোচনা করতেন। কল্যাণমূলক উদ্দেশ দিয়ে যেমন তাঁদের মনকে পবিত্র করতেন, তেমনি উৎসাহব্যঞ্জক ও রহস্যপূর্ণ বাণী পরিবেশন করে ভয়, ভীতি ও ভেদা-ভেদের ভারসাম্য লাঘব করতেন। তাঁর মহামূল্য কার্যপদ্ধতি যেমন সমাজগঠন, ধর্মগঠন ও রাষ্ট্রগঠনে সহায়তা করত, তেমনি মনের অনাবিল দুঃখ, দারিদ্র্য ও হতাশাকেও সমূলে ধ্বংস করত। বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে কেন্দ্রীভূত করে মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্গঠন করত।

দেহের ওপর মনের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। এটা আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রমাণ করছি। দুঃসংবাদ পেলে, রাগান্বিত হলে অথবা ভীতিজনক কোন অবস্থার মধ্যে পড়লে হৃদয় তোলপাড় করতে থাকে, শ্বাসকার্য দ্রুতগতিতে চলে, নাড়ির গতিও অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করে। যে মনের স্থিতি নেই, যে মনের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ নেই, যে মনের ওজন নেই— সে মন বিষধর সর্পের ছোবলের ন্যায় যেমন ক্রিয়া করে তেমনি আবার অমৃতের ন্যায় অনাবিল শান্তিধারা দিয়ে মানবদেহ সুন্দর, সতেজ ও শক্তিশালী করে তোলে। এই মনের ক্রিয়ার ফলেই কেউ হয় উন্মাদ, কেউ হয় মহাজ্ঞানী, কেউ ঋষি, কেউ পাজি, কেউ বদমেজাজি, কেউ শান্ত ও কেউ হয় ভদ্র।

এ মন নিয়ে বিচার করা কঠিন। দেহের ওপর মনের যেমন প্রভাব, মনের ওপরও আবার তেমনি দেহের প্রভাব বিরাজমান করে যেন এক মায়ের দুটি ছেলে—একই রক্ত যেন এদের ধমনীতে প্রবাহিত। একই পরিবেশে ও একই খাদ্যে যেন এরা পুষ্ট। কোন সুস্থ ব্যক্তি মনের উল্লাসে হয়তো বসে বসে গান-বাজনা করছে, প্রিয়জনকে নিয়ে হাসি-তামাসার কথা বলছে, সুস্থ দেহের সুস্থ মনের ক্রিয়ায় চোখে-মুখে আনন্দের লহরী ছুটছে আর এমনি সময়ে যদি তার শত্রু এসে পেছন থেকে আঘাত করে অথবা বিষধর সর্প এসে অকস্মাৎ ছোবল দেয় তাহলে সুস্থ মন নিমেষেই অসুস্থ হয়ে ওঠে। ভয়-ভীতি, রাগ ও অভিমানে চোখে-মুখে তার আগুন ঝরতে থাকে। যে ব্যক্তি মাথার বেদনায় অস্থির তার পক্ষে পড়াশুনা করা, কবিতা লেখা বা অফিস-আদালতের কাজ পরিচালনা করা কঠিন। দেহের যন্ত্রণা মনকেও যন্ত্রণা দিতে থাকে। দেহের কঠোর আঘাত মনকেও আঘাত দিতে থাকে।

শৈশব কাল থেকে যার মন যেভাবে গড়ে ওঠে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেভাবেই থাকে। অবশ্য শিক্ষা, জ্ঞান ও বয়সের সঙ্গে কিছুটা স্থিতিশীল ও মার্জিত হয়। শৈশবে যাদের মনে ধর্মের ভীতি আসে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আসে, কুকর্মে ঘৃণা আসে তাদের পরিণত বয়সেও ঠিক সেই ভাবই আসে। মন তাদের সেভাবেই গঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ বাণীগুলি স্মরণীয়। তিনি বলেছেনঃ "মন যেন সাদা কাপড়। যে রঙে ছাপাবে সেই রঙই হবে।"[১]

টীকা ঃ ১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ। কৃত—সুরেশচন্দ্র দত্ত। পৃষ্ঠা ১৩৪।

www.pathagar.com

মনের স্থিরতা ও অস্থিরতা সম্বন্ধে তিনি যে চমকপ্রদ উপদেশ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ। হিন্দু, মুসলমান যে কোন জাতিই সাদরে এ উপদেশ গ্রহণ করলে শুধু ভাগ্যবানই হবে না, পরকালের জন্যও বেহেশ্ত রচনা করবে।

"মানুষের মন যেন সরষের পুঁটলি।"

সরষের পুঁটলি একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়ান ভার হয়ে ওঠে, মানুষের মন সেই রকম, একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে স্থির করা কঠিন হয়ে ওঠে। বালকের মন ছড়ায় নি, এ জন্য সহজে স্থির হয় কিন্তু বুড়োদের মন সংসারে ছড়িয়ে গেছে, এ জন্য স্থির হওয়া ভার।"[১]

যাদু যেমন মানুষের মন কেড়ে নেয়, সংসার আসক্তি তেমনি মানুষের মনকে কলুষিত ও অপবিত্র করে চিরস্থায়ী ও চিরসুখের বেহেশ্ত কেড়ে নেয়। সংসারে একবার মন ঢুকলে সে মন দিয়ে আল্লাহ্‌কে পাওয়া কঠিন। জটিল মায়াবিনী সংসারে—নারী, ধন, বাড়ি, গাড়ি, বিলাসপ্রিয় উপকরণের দিকে মানুষকে যাদু করে ফেলে। এ জন্যই জ্ঞানী-মহাজ্ঞানী নবী-পয়গম্বরগণ সংসারের মায়া ত্যাগ করে মনের সংস্কার করেন। মনোবিজ্ঞানী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এ জন্যই বলেছেন—

"সংসার অভিশপ্ত এবং সংসারে যা কিছু আছে তাও অভিশপ্ত, কিন্তু যা আল্লাহর জন্য আছে তা প্রশংসিত।"[২]

"যে ব্যক্তি সংসারকে ভালবাসে সে তার পরকালের অনিষ্ট করে। আর যে ব্যক্তি পরকালকে ভালবাসে সে তার সংসারের অনিষ্ট করে। অতএব অস্থায়ী বস্তু বর্জনপূর্বক স্থায়ী বস্তু গ্রহণ কর।"[৩]

"দুনিয়াকে বর্জন কর; এটি হারূত ও মারূত অপেক্ষা যাদুকর।"[৪]

মুসলিম গৌরব হাসান বসরী মনের ওপর প্রভাব খাটাতে যে পরামর্শ দিয়েছেন তা ছিল এই— "নিতান্ত অবাধ্য ও দুর্দমনীয় পশুকে যেমন সুদৃঢ় লাগাম দিয়া রাখিতে হয়, তদপেক্ষা মজবুত ও কঠিন লাগাম দ্বারা মানুষের মনকে সর্বদা রাখা কর্তব্য।"[৫]

শরীর-বিজ্ঞানের একটি অঙ্গ মন। তাই মন নিয়ে আলোচনা করতে মনের স্থিতি, মনের ক্রিয়া, মনের প্রভাব ও মনের গঠন সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখতে হলো। মনোবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম না। ছিলাম অঙ্ক, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের একজন অতি মূর্খ্য ছাত্র। তাই মন নিয়ে আলোচনা করার মতো জ্ঞান এ সব বিষয়ের মাঝে খুঁজে পেলাম না। মনোবিজ্ঞান পড়ে মনকে গঠন করুন। তবেই সুস্থ মনের সুস্থ দেহ পাবেন।

আত্মা

আত্মা নিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে সামান্য কিছু আলোচনা করেছি। আমার **'বিজ্ঞান না কোরআন'** পুস্তকেও এ আত্মার ওপর কিছুটা আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি। জানি সে চেষ্টা আমার সফল হয় নি। কেননা আত্মাকে জানবার মতো জ্ঞান অর্জন করি নি। একে তো আত্মার মতো পবিত্র ও শক্তিশালী পদার্থকে রূপদান করে শরীর বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসাবে বোঝান কঠিন। যারা আত্মাকে চিনেছে তারাই মানুষ হয়েছে, যারা আত্মাকে বুঝেছে তারাই আল্লাহকে পেয়েছে।

এতদিন জ্ঞানী-মহাজ্ঞানীরা আত্মার বিশ্লেষণ দিয়েছেন। বিশ্বাসীদের জন্য সে বিশ্লেষণ অত্যন্ত ফলবতী ছিল। যারা এতে বিশ্বাস করে আত্মার সাধনা করেছে, নিজ আত্মার পরিচয়

টীকা ঃ ১ . শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ। কৃত—সুরেশচন্দ্র দত্ত। পৃষ্ঠা—৭৬।

২ —৫. সংগৃহীত, সৌভাগ্যের পরশমণি (ইমাম গাজজালী) প্রথমার্ধ। পৃষ্ঠা ৩০০ এবং (তর্জমা মোঃ আবদুল খালেক বি. এ. অনার্স) পৃষ্ঠা ৫২।

www.pathagar.com

পেয়েছে তারাই মহামানব হয়েছে। জগৎকেও ঋণী করেছে।

বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করতে পারলে আশা করি যাদের মনে কিছুটা সন্দেহ বিরাজ করে তাদের এ সন্দেহ ঘুচবে। সবার ঘরেই প্রায় রেডিও আছে। বিশেষ গুণবিশিষ্ট ধাতব পদার্থের সমন্বয়ে এ রেডিও তৈরি। ওপরের কেসটাও বেশ রং ঢঙে সাজান। ভেতরের ছোট-বড় অংশ গুলি পৃথক হলেও সবার সঙ্গেই সবারই একটা যোগ আছে। যোগসূত্র ছাড়া একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসাবে কোন পদার্থ বা কোন অংশই এতে দেখা যায় না। বহির্ভাগে এতে থাকে একটি সুইচ। টিউন করার জন্য একটি পৃথক হুইল। এছাড়া ফাইন টিউনিং ও টোন লেভেল আয়ত্তকারী আরও পৃথক কয়েকটি ব্যবস্থা।

প্রধান সুইচটির কাজ 'অন-অফ' করা। 'অন' করলে রেডিও সক্রিয় হয়। নিমেষে এর অভ্যন্তরীণ অংশে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ প্রতিটি পদার্থের ইলেকট্রন ও প্রোটন সজীব হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। এরপর তাদের নিজস্ব গতিপথে অবিরামভাবে কাজ করে চলে।

এবারে প্রশ্ন হলো রেডিও 'অন' করা হয় কেন? পদার্থ বিজ্ঞানে যার জ্ঞান সীমাবদ্ধ সেও বলবে রেডিওতে 'Power' না দিলে বাজবে কিরূপে? অর্থাৎ রেডিওকে কথা বলাতে হলে সুইচ 'On' করে 'Power' দিতে হবে। Power না দিলে জড়বস্তুর তৈরি রেডিও চিরদিন জড় হয়েই থাকবে। ভুলক্রমেও কোনদিন বাজবে না।

রেডিওর প্রাণ Power, এই Power বলতে আমরা ইলেকট্রিক কারেন্ট ও ভোল্টেজকে বুঝি। Physics- এর সংজ্ঞা অনুযায়ী—

Power = Voltage× Current

অর্থাৎ P = V ×1

যে অদৃশ্য শক্তি বাইরে থেকে রেডিও অভ্যন্তরে প্রবেশ করান হয়—সেটাকেই ইংরেজিতে Power বলে। Power ভিন্ন রেডিও অচল। গান-বাজনা, কথা ও বক্তৃতা যা কিছু আমরা শুনতে পাই—জড়বস্তুগুলি যার জন্য সজীব হয়ে ওঠে সেই অদৃশ্য শক্তিই 'Power'। এই Power switch-টিই রেডিওর প্রধান অঙ্গ। 'ON' করলে রেডিও জীবন পায়। 'OFF' করলে মৃত হয়ে যায়।

'হুইল' দিয়ে রেডিওকে ইচ্ছামতো 'Tune' করে সারা পৃথিবীর রেডিও কেন্দ্রগুলির কথা ধরা হয়। একে ইচ্ছামতো Fix up করা যায়। 'Fine tunning knob' দিয়ে কথাগুলি সুস্পষ্ট করা যায়।

এবার আসি 'Band Switch'-এর কথায়। medium, Short-1, Short-2-কে ধরার জন্য Band Switch ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ নিকটতর, দূরতর ও অধিক দূরতর রেডিও স্টেশনগুলিকে ধরার একটা ব্যবস্থা করে দেয় এ Band Switch।

জীবদেহকে ঠিক একটি রেডিও বলা যায়। বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সমন্বয়ে যেমন রেডিওর সৃষ্টি, তেমনি বিভিন্ন পদার্থসমূহের সংমিশ্রণে জীবদেহ তৈরি। Power দিলে রেডিও যেমন কথা বলে 'আত্মা' দিলেও জীবদেহ তেমনি কথা বলে।

অর্থাৎ 'আত্মা' একটি Power যা দিয়ে জীবদেহ প্রান পায়, শক্তিশালী হয়। এই আত্মা ভিন্ন জীবদেহ অচল, অসাড় ও অকর্মণ্য।

এই 'আত্মা' বা Power অদৃশ্য। অদৃশ্য বস্তুকে অনুভব করা যায়, দেখা যায় না। দেখা যায় না বলেই যে এর অস্তিত্ব থাকবে না এ কথা জড়বাদীরা বিশ্বাস করলেও যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করতে পারেন না। কেননা বৈজ্ঞানিকগণ অদৃশ্য বস্তুকে নিয়েই বেশি কাজে লাগাচ্ছেন। দৃশ্য বস্তুর অভ্যন্তরে অদৃশ্য বস্তু প্রবেশ করিয়ে জটিল সমস্যারও সমাধান করছেন। ইলেকট্রিক কারেন্ট বা ইলেকট্রিক পাওয়ার এর প্রমাণ। মিটার দিয়ে এ কারেন্ট, ভোল্টেজ এবং পাওয়ার মাপা যায়। যে বস্তু অদৃশ্য অথচ যার শক্তিকে বোঝা যায়, মাপা যায়,

www.pathagar.com

অনুভব করা যায় সেই বস্তুরই স্থিতি আছে, ক্রিয়া আছে, রূপ আছে ও গুণ আছে। বাতাস, মন, আত্মা, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, চিন্তা, সবকিছুই অদৃশ্য অথচ এদের ক্রিয়া কেমন প্রবল। দৃশ্যবস্তু, এদের প্রভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়, লীন হয়ে যায়, ক্ষীণ হয়ে যায়, চিরতরে মুছে যায়। ১৯৭০ সালে এই অদৃশ্য শক্তি বাতাসের তাণ্ডবলীলায় বাংলাদেশের বুক হতে কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশ লক্ষ লোক প্রাণ দিল। যারা অদৃশ্য হস্তের ক্রিয়া বিশ্বাস করত না—অদৃশ্য আল্লাহকে স্বীকার করত না তারা বুঝতে পারল এ অদৃশ্য শক্তির ধ্বংসলীলা কেমন ভয়ানক! দুনিয়ার মানুষ অবিশ্বাস করলেও, জড়বাদী ও বস্তুবাদীরা ঘৃণাভরে উপেক্ষা করলেও বাংলার মানুষ আর কোনদিন অবিশ্বাস করতে পারবে না যে সৃষ্টি ধ্বংসকারী কোন অদৃশ্য শক্তি নেই। বিশ্বাস তাদের করতেই হবে যে মুহূর্তের প্রলয়ে যে মহাশক্তি বিশ লক্ষ নর-নারীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে সে শক্তি 'কার' নাম নিয়ে সমগ্র বিশ্ব চোখের পলকে তছনছ করে দিতে পারে। এই অদৃশ্য মহাশক্তিশালীই আল্লাহ্—যিনি অদৃশ্য আত্মাকে জীবদেহে সংস্থাপন করেছেন। কোরআন এর সাক্ষ্য দেয়—

"এবং তাহারা তোমাকে আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তুমি বল, আত্মা আমার প্রতিপালকেরই আদেশ এবং তোমাকে জ্ঞান হইতে অত্যল্প ব্যতীত প্রদান করা হয় নাই।"[১] (কোরআন—১৭ ঃ ৩৫)

"যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলেন যে নিশ্চয় আমি মৃত্তিকা হইতে মানব সৃষ্টি করিব। অনন্তর যখন আমি ইহার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম এবং তন্মধ্যে স্বীয় আত্মা ফুৎকার করিয়াছিলাম তখন তদুদ্দেশ্যে প্রণতভাবে পতিত হও।"[২] (কোরআন—৩৮ ঃ ৭১-৭২)

কোরআনের এ গুরুত্বপূর্ণ বাণী হতে বোঝা যায় যে 'আত্মা' শরীরের কোন অঙ্গ নয়। শরীর হতে বিচ্ছিন্ন। মানবদেহ নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করার পরে (কোরআন যা বলছে) আল্লাহ্ অদৃশ্য শক্তি ফুৎকার করে দেহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেন। তাই মৃতদেহ জ্যান্ত হয়ে ওঠে। বাইবেলেও ঠিক একই প্রকার বাণী দেখতে পাই (আদিপুস্তক—২/৭) এবং জানতে পারি শরীরের কোন অঙ্গের মাধ্যমে এ আত্মা দেহে প্রবেশ করানো হয়েছে। নিম্নে এ অমূল্য বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধুলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুষ্যকে) নির্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রান বায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।"

মহাপুরুষদের মতেও আত্মা শরীরের অংশ নয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, "সাপ যেমন সাপের খোলস হতে আলাদা তেমনি আত্মা শরীর হতে আলাদা।"[১]

রেডিও 'অন-অফ' সুইচটির সঙ্গেই কেবল এ আত্মার তুলনা চলে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ 'আত্মা' সুইচটি 'অন' থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জীব বেঁচে থাকে ও বিভিন্ন কার্য করে। 'অফ' হবার সঙ্গে সঙ্গেই রেডিওর মতো অসাড় পদার্থে পরিণত হয়।

রেডিও-এর টিউনিং হুইলটি যেন জীবের মন। সামান্য ৬/৭ ইঞ্চি জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যেমন হুইলটি সারা পৃথিবীর কথা, গান-বাজনা প্রভৃতি টেনে আনে তেমনি সীমাবদ্ধ ৬/৭ ইঞ্চি বক্ষ অভ্যন্তরে আসন লাভ করে মন সারা বিশ্বকে মস্তিষ্কে টেনে আনে। স্থির হয়ে এ মন একটি বিষয়ের ওপর চিন্তা করতে যেমন সক্ষম তেমনি দূরে বহুদূরে গিয়েও কল্পনারাজ্যে সাঁতার কাটতেও সক্ষম। রেডিওর হুইল ঘুরিয়ে যেমন হাসি, কান্না, প্রেম, মায়া, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি শোনা যায়, তেমনি মানব মনের এ হুইলটি ঘুরিয়েও অনুরূপ আশা-

---

টীকা ঃ ১. কোরআন ঃ সূরা বনি ইসরাইল আয়াত ৮৫।

২. ঐ ঃ সূরা সাদ, আয়াত ৭১–৭২।

টীকা ঃ ১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ। কৃত-সুরেশ দত্ত পৃষ্ঠা১১৭।

www.pathagar.com

ভরসা, দুঃখ-দৈন্য, প্রেম ও মায়ার বাস্তব রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। অদ্ভুত এ মন। অদ্ভুত এ আত্মা!

'Band Switch'-টি যেন আত্মার বিভিন্ন Stage; যেমন জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মার সাহায্যে মানুষ কর্মশক্তি পায়, বেঁচে থাকে। ঘুমের ঘোরেও এ আত্মা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয় না। পরমাত্মা বিশ্ব ঘুরে আসে। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মাধ্যমে বেহেশ্‌ত-দোজখ, আরশ-কুরসী, জানা-অজানা, চেনা-অচেনা, দেখা-অদেখা প্রভৃতি স্থানে ঘুরে আসে। স্বপ্নে ভবিষ্যতের চিত্র এঁকে দেয়। জ্ঞানতত্ত্ব উদ্ভাসিত করে দেয়। সঠিক ও নির্ভুল পথের সন্ধান দেয় যা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় মেলে না।

'Medium Wave'-কে আমরা সাধারণত ব্যবহার করি স্থানীয় ও নিকটতম স্টেশনগুলি ধরতে। এ Wave-কে বহন করে আমাদের এ পৃথিবী। Earth Carries Its Frequency. It is the Best Conductor. আমাদের এ পৃথিবী বাহন হিসাবে আমাদের কথা বা শব্দ হাজার হাজার মাইল বহন করে নিয়ে যেতে পারে। Short-1 and Short-2 এর যে Frequency তা মহাশূন্যের বিভিন্ন স্তর (যেমন Hemisphere, tropsphere, stratosphere) তাই আমরা এই রেডিও frequency-এর মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান বা আকাশের স্তর থেকেও সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারি। আকাশের এ স্তরগুলি Reflector-এর কাজ করে। এ জন্যই নভোচারীরা চন্দ্রে গমন করেও সংবাদ পাঠাতে বা গ্রহণ করতে পেরেছেন। শুধু চাঁদ কেন, যে কোন গ্রহ বা আকাশের কোন কঠিন স্তরকে Reflector হিসেবে ব্যবহার করে সারা বিশ্বের খবর নিতেও হয়তো একদিন আমরা সমর্থ হবো।

Short-1 এবং Short-2 frequency দিয়ে যেমন আকাশ-পাতালের সংবাদ নেওয়া যায় তেমনি পরমাত্মার সাহায্যেও দূরতম, নিকটতম, দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুর সন্ধান লাভ করা যায়। এই পরমাত্মার সাহায্যেই নবী, পয়গম্বর ও মহাপুরুষগন চেতন ও অচেতন অবস্থায় বিশ্বের দরবারে হাজির হন।

অনেকের মতে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নভোভ্রমণ বা মিরাজ পরমাত্মার উৎকর্ষ সাধনেরই ফল।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাধনাযোগেই যে মহাপুরুষগণ অদ্ভুত ক্ষমতা পান এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নিম্নের উদ্ধৃতি তা প্রমাণ করে।

"যোগীরা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করতে চেষ্টা করেন—উদ্দেশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মা-যোগ। যোগীরা বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে নেন ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করেন। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির হয়ে অনন্য মনে ধ্যান চিন্তা করেন।"[১]

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগসাধন কিভাবে হয় সে প্রশ্নের উত্তর মেলে মনীষীদের বাণীতে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন—

"ঘড়ির ছোট কাঁটা ও বড় কাঁটা যেমন দুপুরবেলা এক হয়ে যায়—
সেই রকম।"[২]

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এই আত্মার সাধনা করেছেন—একদিন নয়, দুদিন নয়, সারা জীবনব্যাপী। তাঁর অসাধারন সংযম, সাধনা ও কার্যের মাধ্যমেই আত্মাকে পবিত্র করেছেন। এ আত্মার অস্তিত্বকে তিনি অনুভব করতেন, এর সংস্কারের পদ্ধতি জানতেন। তাঁর মহামূল্যবান বাণী এর সাক্ষ্য দেয়।

"পার্থিব বিষয়ের সংযম আত্মা ও দেহের সৌরভ বৃদ্ধি করে এবং পার্থিব বিষয়ে মোহ দুঃখ ও বিপদ বৃদ্ধি করে।" (সগির)

"হে আল্লাহ্! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। তুমি আমাকে পরিচালিত করিবার পর আমার

টীকা ঃ ১— ২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ। কৃত — শ্রীসুরেশ দত্ত, পৃষ্ঠা ১৪১-৮৭।

www.pathagar.com

'আত্মাকে' বিপথগামী করিও না। তোমার অনুগ্রহ দান কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।" (আবু দাউদ)

হজরতের মহাবাণীতে এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে দেহ ও আত্মা এক নয়। যদি এক হতো তাহলে নিশ্চয়ই বলতেন না—'পার্থিব বিষয়ের সংযম 'দেহ ও আত্মার' সৌরভ বৃদ্ধি করে।'

দ্বিতীয়ত, এ আত্মাকে পবিত্র করার প্রধান ওষুধ সংযম। যে যত বেশি সংযমী সে-ই তত বেশি আত্মার উৎকর্ষসাধন করতে পারে। যার সংযম নেই তার ত্যাগ নেই, পরিশ্রম নেই, সন্তুষ্টি নেই, সহানুভূতি নেই, উদ্দেশ্য নেই, মাধুর্য নেই, মঙ্গলচিন্তা নেই, আল্লাহকে পাবার একাগ্রতা নেই। অর্থাৎ এক কথায় বলতে হয় তার কিছুই নেই।

যে ব্যক্তি তার আত্মাব পরিপূর্ণতা লাভ করেছে সে সবকিছুই পেয়েছে—প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, ইহকাল, পরকাল, ধন-মান, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অদৃশ্য জগতের সন্ধান।

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এর এ বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তার প্রমাণ দেয় কোরআন ও বাইবেল।

"নিশ্চয় রাত্রে গাত্রোত্থা করা একান্ত আত্মসংযম ও বাক্য শোধনকারী।"[১] (৭৩ ঃ ৬)

"আত্মাতে পরিপূর্ণ হও ' (বাইবেল ঃ ইঞ্জিল)

"আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘ সহিষ্ণুতা, মাধুর্য মঙ্গলভাব বিশ্বস্ততা মৃদুতা, ইন্দ্রিয় দমন। এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেই।" (বাইবেল, ইঞ্জিল, গালাতীয় ৫/২)

সত্য সত্যই হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যে পবিত্র আত্মার অধিকারী ছিলেন ও মানবাত্মার সংস্কার করে শরীরবিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করতে এসেছিলেন তার সাক্ষ্য দেয় হজরত ঈসা (আঃ)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী। তিনি বলেছেন ঃ

"তিনি সত্যের আত্মা; জগৎ তাঁহাকে গ্রহন করিতে পারে না— কেননা সে তাহাকে দেখে না, তাহাকে জানেও না। তোমরা তাহাকে জান। কারণ তিনি তোমাদের নিকট অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।" (বাইবেল)

"সেই সহায় পবিত্র আত্মা—যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দেবেন।"

(বাইবেল ঃ ইঞ্জিল যোহন ৪/২০)

মহামনীষী ইমাম গাজ্জালী সাহেব আত্মার সম্বন্ধে আরও একটি ধারণা আমাদের দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ মানবদেহ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মানবাত্মা চিরস্থায়ী।"[২]

"দেহ ত্যাগের পরও জ্ঞান আত্মার সঙ্গে থাকিবে।"[৩]

আত্মা যে সত্যি একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, দেহ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এতে কোন সন্দেহ নেই। পদার্থবিজ্ঞান পরিচ্ছেদে এ নিয়ে ইনশা-আল্লাহ আরও কিছু আলোচনা করব। আত্মার অস্তিত্ব পদার্থবিজ্ঞানে ধরা পড়ে কিনা দেখব।

রসুলের বাণী যে কথা প্রমাণ করে পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী মহামনীষীদের বাক্যও সে কথারই সাক্ষ্য দেয়।

আমাদের এ দেহ নশ্বর কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। অর্থাৎ এ দেহ মাটি হতে তৈরি, মাটিতেই রূপান্তরিত হয়। এ সুন্দর দেহের কোন স্থায়িত্ব নেই। অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যায়। স্বল্পতম কালের জন্য এ দেহ টিকে থাকে। কিন্তু আত্মার স্বভাব তা নয়। আত্মার ক্ষয় নেই। স্বল্পতম কালের জন্য মানবদেহে অবস্থান করলেও স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব তার স্বল্পতম নয়।

এ আত্মার বিশ্লেষণ দেওয়া কঠিন। কোন্ বস্তু হতে সৃষ্ট, কোথায় এর অবস্থান, কোথায় আবার চলে যায় এর সমাধান আমরা জানি না। মহাপুরুষগন যাঁহারা এর সাধনা করেন,

---

টীকা ঃ ১. কোরআন ঃ সূরা মোজাম্মেল, আয়াত ৬।

২ —৩. ইমামা গাজ্জালী। কিমিয়ারে সা'আদাত। পৃষ্ঠা ২৪৪ ও ২৪৫।

www.pathagar.com

আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরা হয়তো জানেন, তবুও এর স্বরূপ বর্ণনা করে কেউ বিশ্লেষণ দেন নি। বৈজ্ঞানিক নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) -কে এই আত্মার পরিচয় জানতে কতিপয় সহচর জিজ্ঞাসা করলে তিনি কিছুক্ষণ মৌন থাকেন। এরপর ওহি নাজেল হয়। তাঁর মুখ থেকে তখন এ কথাই বের হয়—

"মানুষ তোমাকে আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল—'আত্মা' আমার প্রভুর নির্দেশ।" (বনি-ইসরাইল)

আত্মা যে একটি সৃষ্ট বস্তু, এর যে অস্তিত্ব আছে, ক্রিয়া আছে, বিকাশ আছে এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কোরআনের বাণী, রসুলের বাণী ও মহাপুরুষদের বাণী তার সাক্ষ্য বহন করে ইসলাম জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র মহাজ্ঞানী হজরত আলীর একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে আবার আমরা রেডিও-র দিকে ফিরে যাব। তিনি বলেছেন,

"কসম তাঁহার যিনি বিদীর্ণ করিয়াছেন শস্যকণা ও সৃষ্টি করিয়াছেন আত্মা।"[১]

আমার সম্মুখে অবিস্থত রেডিওটির সুইচ 'অন' করার সঙ্গে সঙ্গেই যখন বাজতে আরম্ভ করল তখন সংবাদ, গান সবই শুনলাম। 'অফ' করার সঙ্গে সঙ্গেই নিস্পন্দ হয়ে গেল। অমনি আমার দেহটি এবং এর সুইচ সম্বন্ধে চিন্তা করেই এ অপরূপ আত্মার যে পরিচয়টুকু পেলাম তাই লিখলাম। এ বিশ্লেষণে ভুল থাকলে আমি অনুরোধ করব পবিত্র আত্মার অধিকারী ব্যক্তিগণ বিজ্ঞান-জগতে এর চাইতে সুন্দর উপমা ও বিশ্লেষণ দিয়ে পরবর্তী বংশধরদের বোঝাতে, যেন তারা আত্মার সন্ধান পায় এবং পরমাত্মা যোগে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

এ পরিচ্ছেদ শেষ করার পূর্বে আর দু' একজন মহামনীষীর বাণী উদ্ধৃত করে আত্মার গতি সম্বন্ধে সামান্য একটু ধারণা দিচ্ছি।

মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী সাহেব বলেছেন,

"দেহ-অশ্বে আরোহণ করিয়া আত্মা এই 'আসফালা সাফেলিন' বা নিম্নজগৎ হইতে 'আলা ইল্লিন' বা সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জগতের দিকে ক্রমশ উত্থিত হইতে থাকে।"[১]

গোঁড়ামিকে আমি কোনদিন পছন্দ করি নি। আজও করি না। তাই যে কোন ধর্মের যে কোন পয়গম্বর বা মহাপুরুষের বাক্যকেই আমি ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করি। না করে উপায় কি? তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে স্বার্থের কোন সংঘাত দেখি না— দেখি আল্লাহকে পাবার একই নেশা, একই জ্ঞানলাভের বিভিন্ন পদ্ধতি। তাই এ চিন্তার মাঝে রয়েছে অদ্ভুত সমন্বয়। ইমাম গাজ্জালী সাহেব দেখালেন যে আত্মার গতি নিম্নমুখী নয়, ঊর্ধ্বমুখী; আর হিন্দুশাস্ত্রবিদ মহামনীষী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বললেন, "নদীর গতি সাগরের দিকে। কিন্তু মানুষ খাল কাটিয়া অন্যদিকে লইয়া যায়। আত্মার গতি ভগবানের দিকে কিন্তু জীব কামকাঞ্চনরূপ খাল কাটিয়া তাহাকে অন্যদিকে লইয়া যায়।"[২]

"অশুচি আত্মা মানুষ হইতে বাহির হইবার পর জলবিহীন স্থানে ভ্রমন করিয়া বিশ্রামের অন্বেষণ করে কিন্তু তাহা পায় না। তখন সে বলে আমি যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছিলাম আবার সেই গৃহে ফিরিয়া যাইব। সে আসিয়া তাহা শূন্য, মার্জিত ও সুসজ্জিত দেখিতে পায়।"[১]

টীকা ঃ ১ . সহীহ বুখারী। তর্জমা পূর্বে বর্ণিত।

টীকা ঃ ১ . কিমিয়ায়ে সা'য়াদাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২।

২ . সুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ পুস্তক। পৃষ্ঠা ২৩৫।

টীকা ঃ ১ . বাইবেল, মথি পরিচ্ছেদ।

www.pathagar.com

এ সম্বন্ধে হজরত (দঃ)-এর একটি বাণী নিম্নরূপ। যখন তিনি প্রার্থনা করতেন তখন বলতেন ঃ

"তোমারই নামে যিনি আমার প্রভু, আমি স্থাপন করিলাম আমার পার্শ্ব এবং তোমারই নামে তুলিব উহা। যদি তুমি রাখিয়া দাও আমার আত্মাকে তবে দয়া কর উহার প্রতি এবং যদি ফেরত দাও উহাকে তবে রক্ষা কর উহাকে যাহা দ্বারা তুমি রক্ষা কর তোমার পূণ্যবান ভৃত্যদের।"[২]

হজরত (দঃ)-এর ওপরে বর্ণিত প্রার্থনার মধ্যে রিসার্চ করার বিষয়বস্তু রয়েছে।

প্রথমত, দেহ ও আত্মা এক নয়। ভিন্ন উপাদানের ভিন্ন বস্তু। দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। আত্মা ভিন্ন দেহ অচল। কিন্তু দেহ ভিন্ন আত্মা অচল নয়। দেহ ছেড়ে আত্মা বিচ্ছিন্ন হলেও আত্মা অচল হয় না। এর কোন ক্ষতি বা ধ্বংস নেই।

দ্বিতীয়ত, আত্মার সংরক্ষণ হয় এক নির্দিষ্ট কক্ষে। এক মহান বৈজ্ঞানিকের নির্দেশে তা বের হয়ে আসে এবং মানবদেহে প্রবেশ করে। আবার তাঁরই বৈজ্ঞানিক কৌশলে এ মানব দেহ হতে তা বের করা হয়। একবার মৃত্যুকালে আর একবার ঘুমের ঘোরে বা অচৈতন্য অবস্থায়। এ দুই অবস্থায় দেহের কোন শক্তি থাকে না। বোধশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও শারীরিক শক্তি বিলীন হয়। ঘুমের ঘোরে আত্মা থাকে না অথচ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ির গতি কিভাবে ঠিক থাকে তার ব্যাখ্যা আমরা দিতে জানি না।

রসুল (দঃ)-এর প্রার্থনা হতে আমরা দেখতে পাই এ দুই সঙ্কটময় মুহূর্তেই আত্মা দেহ হতে দূরে থাকে। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে ফিরিয়ে দিতে পারেন। অন্যথায় তা আবদ্ধ করে রাখা হয় যা আর দেহে ফিরে আসে না। তাই তিনি তাঁর বিনীত প্রার্থনায় তা ব্যক্ত করেছেন।

কথাটি যে খেয়ালি নয়, অবাস্তব নয়, অর্থহীন নয় তার প্রমাণ কোরআন—আল্লাহরই মহাবাণী যা নিম্নরূপ ঃ

"আল্লাহ্ আত্মাসমূহ পরিগ্রহণ করেন —মৃত্যুকালে এবং যাহাদের মৃত্যু হয় না তাহাদের নিদ্রার সময়; অনন্তর তিনি উহাকে আবদ্ধ রাখেন— যাহার উপর মৃত্যু অবধারিত হইয়াছে এবং অন্যান্যকে এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত প্রমুক্ত করেন; নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।"[১] (৩০ ঃ ৪২)

সৎকার্যে আত্মা, দেহ ও মন পবিত্র হয়। অসৎকার্যে আত্মা মরিচাপ্রাপ্ত হয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, ফলে দৃশ্য ও অদৃশ্য জ্ঞানলাভ হতে মানুষ বঞ্চিত হয়। মনের অবস্থাও ঠিক তাই। সৎকার্যে মনে যেমন বল আসে, আনন্দ আসে, চোখে-মুখে ও দেহের সর্বাঙ্গেও তেমনি কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও আনন্দের লহরী ছুটতে থাকে। আত্মা ও মনের সঙ্গেই দেহের সুস্থতা নির্ভর করে। এ নিয়ে পূর্বে অনেকটা বিশ্লেষণ করেছি। এবারে দেখব আত্মা ও মনের পবিত্রতা এনে কিভাবে শরীরকে সুস্থ ও সবল করা যায়।

যুগে যুগে মনীষীরা আত্মা ও মনের সাধনা করেছেন ও যে সব পন্থা দেখিয়েছেন বৈজ্ঞানিক নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ), সে সব পন্থা ছাড়াও ভিন্নতর পথ দেখিয়েছেন যা সর্বযুগে সর্বকালে, সর্বদেশ ও সর্বজাতির জন্য উপযোগী এবং বিজ্ঞানসম্মত। এসব পন্থা শুধু আত্মা ও মনের উৎকর্ষই সাধন করে না, দেহেরও প্রভূত উন্নতি এনে দেয়। এদের মধ্যে নামাজ ও রোজা অন্যতম। কিভাবে এ নামাজ ও রোজা সমাজবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, ধর্মবিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে বিপ্লব বয়ে নিয়ে এসেছে, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে পরে দেহরক্ষার উপায় উপকরন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর উল্লেখ করব।

---

২ , সহীহ বুখারী, হাদীস।

টীকা ঃ ১ . কোরআন ঃ সূরা জোমর, আয়াত ৪২।

www.pathagar.com

নামাজ

ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি মুসলমানকে দৈনিক পাঁচবার[১] নামাজ পড়তে হয়। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় নির্দিষ্ট করা আছে। প্রথম 'ফজরের' নামাজ। রাত্রি শেষ হবার সময় থেকে অর্থাৎ পূর্বাকাশ পরিষ্কার হবার সময় থেকে সূর্য্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যে নামাজ পালন করা হয়, তাকেই ফজরের নামাজ বলে। বেলা একটা থেকে বিকেল চারটের মধ্যে যে নামাজ পালন করা হয় তাকে 'যোহরের' নামাজ বলে। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই 'মাগরেব' ও রাত্রি আটটার পর থেকে বারটার পূর্ব পর্যন্ত যে নামাজ পালন করা হয় তাকে 'এশার' নামাজ বলে। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় সম্বন্ধে হজরত (দঃ) যা বলেছেন তা নিম্নরূপ।

"যোহরের" ওয়াক্ত হয় সূর্য যখন অবনত হয় এবং যে পর্যন্ত মানুষের ছায়া তাহার দৈর্ঘ্যের সমান থাকে সে পর্যন্ত 'আসর হয় না এবং 'আসরের' সময় থাকে সূর্য হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এবং মাগরেবের সময় থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত লালবর্ণ লুপ্ত না হয় এবং এশার সময় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত থাকে এবং ফজরের নামাজের সময় প্রত্যুষ হতে সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।" (মুসলিম)

আত্মার সংস্কার সাধনে এ নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম। এ নিয়ে হজরত (দঃ)-এর দু-একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"ফজরের নামাজ আলোকের মধ্যে পড়; যেহেতু উহা পুরস্কারে সর্বশ্রেষ্ঠ।" (তিরমিজি, আবু দাউদ)

"যে ব্যক্তি আসরের নামাজ হারাইয়াছে সে যেন তাহার মালপত্র ও পরিজনদিগকে হারাইয়াছে।" (শায়খান)

"আমার উম্মতগণ সতত সৌভাগ্যশালী রহিবে যদি তাহারা তারকাগুলি জানালা দিয়া উঁকি মারিবার পূর্বেই বিলম্ব না করিয়া মাগরেবের নামাজ পড়ে।" (আবু দাউদ)

"এই নামাজ (এশা) দেরি করিয়া পড় যেহেতু ইহার জন্য তোমাদিগকে সমস্ত জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে। তোমাদের পূর্বে এই নামাজ আর কোন জাতি পড়ে নাই।" (আবু দাউদ)

"নামাজ অন্তঃকরণকে আনন্দ দান করে এবং যাকাত ঈমানের চিহ্ন এবং পাপ হইতে সংযমই পূর্ণগৌরব।" (সগির)

"যে ব্যক্তি মনোযোগের সহিত দুইটি সেজদা করে আল্লাহ্ তাহার পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করেন।" (মিশকাত)

আল্লাহ্ বলেন—"হে মানব সন্তান! সমস্ত চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া আমার এবাদত কর। আমি তোমাদের অন্তরকে চিন্তাশূন্য করিব এবং তোমার অভাব দূর করিব নতুবা আমি তোমার উভয় হস্তকে সাংসারিক কার্যে লিপ্ত রাখিব এবং তোমার অভাব দূর করিব না।" (তিরমিজি)

টীকা ঃ ১. নামাজ—নিবিষ্ট মনে আল্লাহর উপাসনা। মুসলমানের জন্য এটা ফরজ অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য, যা পালন না করলে মুসলমান নামে প্রকৃত পরিচয় দেওয়া যাবে না। নামাজ আল্লাহ্ ও রসুলের নির্দেশ। নামাজ সম্বন্ধে কোরআনে যতবার নির্দেশ দেওয়া আছে এত অধিক সংখ্যক নির্দেশ অন্যান্য ফরজ বিষয়গুলির ওপর নেই। হজ্ব, যাকাত, রোজার পর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। সাধ্যানুযায়ী এগুলি পালনের নির্দেশ আছে। শর্তানুযায়ী আবার মাফেরও ব্যবস্থা আছে কিন্তু নামাজকে কারো জন্যই মাফ করা হয় নি উন্মাদ ও অজ্ঞান ব্যক্তি ছাড়া। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এ নামাজ।

www.pathagar.com

কোরআন এ কথারই সাক্ষ্য দেয়,

"নিশ্চয় রাত্রে গাত্রোত্থান করা একান্ত আত্মসংযম ও বাক্য শোধনকারী।" (সূরা মোজাম্মেল, আয়াত ৬)

নামাজ ইহকাল ও পরকালের সম্বল। নামাজ ঈমানের অঙ্গ। নামাজ আধ্যাত্মিক যোগসাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। নামাজ হৃদয়রোগ আরোগ্যকারী, আত্মার বিকাশকারী, দেহ-মনের সুস্থতা বিধানকারী প্রকৃত মহৌষধ।

কোরআন এ কথার সাক্ষী দেয়—

"তোমার প্রতি গ্রন্থ হইতে যাহা প্রত্যাদেশ করা হইযাছে, তাহা আবৃত্তি কর; নিশ্চয় নামাজ অশ্লীলতা ও অপকৃষ্টতা হইতে নিরোধ করিয়া থাকে; এবং নিশ্চয় আল্লাহর স্মরণই শ্রেষ্ঠতর; এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন।" (২৯ ঃ ৪৫)

যে ব্যক্তি প্রতিদিন আল্লাহর ভয়ে পাঁচ বার নামাজ পালন করে সে-ই প্রকৃত মুসলমান, সে-ই সৎকার্যকারী ঈমানদার। কেননা হৃদয় মন সে-ই আল্লাহর কাছে সঁপে দেয়। আমিত্ব বলতে তার কিছুই থাকে না। ধনের গর্ব, পদের লোভ, মণি-মুক্তা, গাড়ি-বাড়ি ও নারী সবকিছুই ভুলে ঐ একটি মাত্র সময়ে সে নিজকে হারিয়ে ফেলে আল্লাহর ভয়ে। বিশ্বাসে হৃদয় তার হয়ে ওঠে ভরপুর। ভক্তি, ভালবাসা, প্রেম, ভয় সবকিছু মিলে তার হৃদয় হয় পবিত্র। ভয়ে চক্ষু হতে যেমন অশ্রু ঝরে, ভক্তি ও বিশ্বাসেও তেমনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। দুনিয়ার লোভ, মোহ, মায়া সে সময় তার থাকে না। সৃষ্টিকর্তার অপরিসীম শক্তির কাছে সে করে আত্মসমর্পণ আর বার বার নিজের জন্য চায় ক্ষমা।

যে মানুষ নিজের ভয়ে ভীত সে অন্যের কোন অপকার করতে পারে না। যে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী, সে সৃষ্ট জীবকে ভাল না বেসে পারে না। যে আত্মার মুক্তি-প্রার্থনায় রত সে অন্যের আত্মার ওপর জুলুম করতে পারে না। তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র কুনীপোকা যেমন হাতির বিরুদ্ধে লড়াই করে আধিপত্য বিস্তারের প্রায়স পায় না তেমনি ক্ষুদ্র জীব মানব মহান শক্তিশালী সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে কোন কৌশল অবলম্বন করে টিকে থাকতে পারে না, এ মহান উপলব্ধি একমাত্র নামাজী ব্যক্তির হৃদয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই তারা হয় মহৎ, সজ্জন, দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন মহাজ্ঞানী। নামাজে দাঁড়িয়ে যখন কোন ব্যক্তি ভীতি বিহ্বল চিত্তে বলে—

"সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিসমূহের প্রভু কৃপাময় ও প্রতিদান দিবসের স্বামী আল্লাহর জন্য। আমরা তোমারই এবাদত করিতেছি ও তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আমাদিগকে সরল ও সুপথে চালনা কর, যে পথে তোমার প্রিয়জন অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছে। তাহাদের পথে নহে যাহারা অভিশপ্ত ও পথভ্রান্ত।"[১] (১ ঃ ১-৭)

টীকা ঃ১ . কোরআন— সূরা ফাতেহা। এ সূরাকে উম্মূল কোরআন বা কোরআনের জননী বলা হয়।

উক্ত সূরা দিয়েই পবিত্র কোরআন আরম্ভ হয়েছে এজন্য একে 'ফাতেহাতুল কেতাব'ও বলা হয়। ফাতেহা অর্থ—আরম্ভ, উপক্রমণিকা, উদ্ঘাটন, অবতরণিকা। রসুলুল্লাহ (দঃ) সূরা ফাতেহাকে 'উম্মুল কোরআন' বলে আখ্যায়িত করেছেন কেননা সমগ্র কোরআনের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, ব্যক্ত ও গুপ্ত সারমর্ম এর মধ্যেই নিহিত।

উক্ত সূরাকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন —সুরাতুল হামদ' বা প্রশংসাসূচক সূরা। আল্লাহর প্রশংসা করার মতো এমন ভাষা, ভাব ও অর্থের অন্য কোন বাণী আর মেলে না। এর প্রতিটি শব্দের যে গূঢ় তাৎপর্য, ব্যাপক অর্থ ও মাধুর্যের সমাবেশ রয়েছে তা অন্য কোন ভাষা বা শব্দের নেই। যেমন ঃ **'রাব্বিল আলামিন'**। রব অর্থ প্রভু, প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক, উপাস্য ইত্যাদি।

আলামিন ঃ সমগ্র বিশ্বজগৎ অর্থাৎ যে জগতের বাইরে আর কোন বস্তু বা প্রাণী নেই। দৃশ্য, অদৃশ্য, চেতন, অচেতন যা কিছু আছে তা নিয়ে মহাজগৎ গঠিত।

মালেকে ইয়াও মেদ্দিন ঃ প্রতিফল, প্রতিদান বা কর্মের হিসাব গ্রহণকারী প্রভু বা বিচার দিবসের মালিক।

এ সূরার অন্য নামগুলির মধ্যে **'সূরাতুস্ সালাত'** অর্থাৎ নামাজের সূরা—যে সূরা প্রতি রাকাতের প্রারম্ভে পাঠ না করলে নামাজ সিদ্ধ হয় না।

www.pathagar.com

তখন সৃষ্টিকর্তা খুশি না হয়ে পারেন না। মানুষের কোন সাহায্য তিনি চান না। তিনি শুধু চান তাঁর অন্তরের ভক্তি, শ্রদ্ধা, আকুল আবেদন ও কৃতজ্ঞতা। অকৃতজ্ঞ মানুষকে তিনি ভালবাসেন না।

যে ব্যক্তি তার আত্মসত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে গর্ব, অহঙ্কার ও আস্ফালনকে পদদলিত করে এমন মিনতির সুরে দৈনিক পাঁচবার নামাজের মাধ্যমে সেই সৃষ্টিকর্তার অশেষ প্রশংসায় নিজেকে নিমজ্জিত রাখে তাঁর চাইতে মহান, আদর্শবান ও পুণ্যবান আর কে হতে পারে? এমন অভিব্যক্তি শুধু মানুষের পক্ষেই সম্ভব। তাই, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে 'আশরাফুল মখলুকাত' উপাধি দিলেন। এ নামাজ কি শুধু মুসলমানের জন্যই ফরজ? হিন্দু, খ্রীষ্টান, জৈন-বৌদ্ধের জন্য কি এ নামাজ সিদ্ধ নয়? যারা মানুষ তাদের জন্যই অর্থাৎ সর্বজাতি ও সর্বধর্মের জন্য এ অমিয় সুধা। নামাজ আল্লাহকে নিকটে পাবার এক পরম কৌশল।

শরীর-বিজ্ঞানে নামাজের প্রয়োজনীয়তা কেন এত অধিক এ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব।

নামাজ মানুষের জীবনে একটা শৃঙ্খলা এনে দেয়। এমন অপূর্ব কৌশল অন্য কোন পন্থায় মেলে না। যারা নামাজী তাদেরকে অসময়ে ঘুম, অসময়ে খাওয়া ও বিভিন্ন অনিয়মের হাত থেকে রক্ষা করে। যেমন—প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করা, নির্মল বায়ু সেবন করা ও কিছু ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অপিরহার্য। সূর্য উদয়ের একঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা পূর্বে যে নির্মল ও পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হয় তা মস্তিষ্ককে সবল করে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে, মনে আনন্দ দান করে এবং এর বিশুদ্ধ অক্সিজেন ফুসফুসকে সতেজ করে। এছাড়া অলসতা, অকর্মণ্যতা ও পুষ্টিহীনতার হাত থেকেও রক্ষা করে। তই মনীষীরা তা যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন এ সুন্দর সময়টির সদ্ব্যবহার করেন। তাঁরা নামাজ না পড়লেও চলাফেরা করেন, ভ্রমণ করেন, অঙ্গ চালনা করে অথবা পুলিশ বা মিলিটারী কায়দায় দৌড়াদৌড়ি করেন। এর উদ্দেশ্য একই-শরীরকে সুস্থ রাখা।

অন্যতম বিশিষ্ট নাম 'সাবওল মাসানী' অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিকারী আয়াতসমূহ। নামাজে বার বার এই একটি মাত্র সূরারই পুনরুক্তি করা হয়।

সূরা ফাতেহার অমিয় আয়াতসমূহ এবং ভাবগত অর্থ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দেখা যায় যে ইহলোক, পরলোক, আত্ম, মন, বিশ্বাস প্রভৃতির কল্যাণকামনায়, এমন প্রার্থনার বাণী আর কোন গ্রন্থ বা মহাপুরুষের বাক্যে মেলে না। হৃদয়ের সবটুকু উজাড় করে অর্ঘ্য দান করা হয় একটি মাত্র শক্তির কাছে যিনি সৃষ্টি, ধ্বংস, প্রতিদান প্রতিফল ও বিচার দিবসের মালিক। এ সূরা যে যত বেশি পাঠ করবে ততই তার হৃদয়মন শুদ্ধ হতে থাকবে ও এক অনাবিল শান্তির মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে।

সূরা ফাতেহার প্রতিটি শব্দের বিশ্লেষণ দিতে গেলে এর উপরই বই লিখতে হয়। তাই শুধু এর গৌরব-মাহাত্ম্য বর্ণনা করে আসল আলোচনায় হাত দিচ্ছি।

সূরা ফাতেহার মাহাত্ম্য ঃ হজরত বলেছেন, "যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা না পড়িয়া নামাজ পড়িল তাহার নামাজ অসম্পূর্ণ।"

"সূরা ফাতেহা কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা। তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিলে ইহার তুল্য কোন সূরাই অবতীর্ণ হয় নাই।

"কোরআন শরীফ সমস্ত স্বর্গীয় গ্রন্থের সার এবং সূরা ফাতেহা সমগ্র কোরআন শরীফের সার।"

"যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করিল সে যেন সমগ্র তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন শরীফ পাঠ করিল।"

সূরা ফাতেহাতে প্রত্যেক রোগের নিরাময় আছে।"

(উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ কোরআনের তফসির ও আজহারউদ্দিন, এম. এ. কর্তৃক হাদিসের আলো হতে সংগৃহীত।)

www.pathagar.com

আমি পূর্বেই লিখেছি শরীরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আত্মা ও মন। নামাজকে বাদ দিয়ে শরীর গঠন করার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেটা দেহকে সুস্থ রাখে সত্য কথা, কিন্তু মন বা আত্মার ওপর এর বিশেষ ক্রিয়া হয় না। নামাজ আত্মা ও মনের ওপর ক্রিয়াশীল। এর কিছুটা বিশ্লেষণ দিয়েছি। এবারে আরও কিছুটা দিতে চেষ্টা করছি।

কয়েক ঘণ্টা ঘুমানোর পর শরীর অনেকটা জড়রূপ ধারণ করে। যারা নামাজ পড়তে অভ্যস্ত তাদের এ জড়তা ভেঙে যায়। তাই একশ' বছর বয়স্ক বৃদ্ধও এই নামাজের নেশায় শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে প্রভাতের সুশীতল আবহাওয়ায় সুনিদ্রাকে ত্যাগ করে উঠে পড়ে। ভরা যৌবন শরীরে যখন ঢেউ খেলে, প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ যখন প্রিয়াকে বুকে জড়িয়ে নেবার ইঙ্গিত দেয় তখন আল্লাহর প্রেমিক কোন যুবককে বিছানা আকৃষ্ট করতে পারে না। মনের বিরুদ্ধে জেহাদ করে উঠে পড়ে নামাজ পড়তে। তাহলে দেখা যায় দুর্বার গতিশলি মন নামাজীর সম্পূর্ণ আয়ত্তে।

ওজু

নামাজীর জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিধান আছে। এ বিধানগুলির মধ্যে 'ওজু' অন্যতম। 'ওজু'র অর্থ দেহকে পবিত্র করা অর্থাৎ হাত, পা, চোখ, মুখ, নাক, কান প্রভৃতি অঙ্গগুলি পানি দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করা। কোন অঙ্গ কিরূপে পরিষ্কার করতে হয়, কতটুকু পরিমাণ ধৌত করতে হয়, কতবার ধৌত করতে হয়, এসব নিয়ম হজরত সুন্দর পন্থায় দেখিয়েছেন। তাই এগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করছি। এখানে শুধু বিশ্লেষণ দিতে চাই ওজুর প্রয়োজনীয়তা কি? কিভাবে ওজু দেহকে পবিত্র করে।

ওজুর প্রয়োজনীয়তা—হজরতের একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি। তিনি বলেছেনঃ

"দেখ, যদি তোমাদের কাহারও বাড়ির দরজায় একটি নদী থাকে এবং যদি সে তাহাতে রোজ পাঁচবার গোসল করে তবে তাহার শরীরে কি ময়লা থাকে? তাহারা বলিল, না। তিনি বলিলেন, ইহাই পাঁচবার নামাজ পালনের দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি পাঁচবার নামাজ কায়েম করে আল্লাহ্ তাহার গুনাহ মুছিয়া দেন।"[১]

কত সুন্দর উপমা। দৈনিক পাঁচবার কোন ব্যক্তি গোসল করলে তার শরীরে ময়লা থাকবার কোন প্রশ্নই আসে না। কেননা কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে যতটুকু ময়লাই শরীরে লাগুক না কেন পরবর্তী গোসলেই তা পরিষ্কার হয়ে যায় পাঁচবার নামাজের জন্য নামাজীকে পাঁচবার ওজু করতে হয়। ওজুর পরে হাত, পা, নাক, জিহ্বা ও দাঁতে কোথাও কোন ময়লা আটকে থাকতে পারে না। কেননা ওজুর প্রধান লক্ষ্যই অঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

আল্লাহ্ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালবাসেন। কদর্য মলিনতাকে তিনি পছন্দ করেন না। মানুষের সুন্দর চালচলন, সুন্দর বেশভুষা ও পবিত্রতাকেই তিনি পছন্দ করেন। কোরআন এ কথা সাক্ষ্য দেয়।

টীকা ঃ ১. আবু দাউদ ও অন্য পাঁচজন। সংগৃহীত, মুহাম্মদ আজাহারউদ্দিন, এম. এ. হাদিসের আলো। নামাজ পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ৫। হাঃ নং ২৮৭।

www.pathagar.com

এবং তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র কর এবং মলিনতা দূরীভূত কর।"[২] (৭৪ ঃ ৪-৫)

"হে আদম বংশধরগণ, প্রত্যেক নামাজের সময়ে তোমরা সুসজ্জিত হও এবং ভোজন ও পান কর এবং অপব্যয় করিও না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীদিগকে ভালবাসেন না।"[৩] (৭ ঃ ৩১)

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে শরীরকে সুস্থ রাখবার যে সব পন্থা শরীর বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তাদের মধ্যে অন্যতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। অপরিষ্কার দেহ সুস্থ থাকতে পারে না। কেননা দৈহিক পরিশ্রমের ফলে শরীরের অভ্যন্তর ভাগ হতে নানা প্রকার দূষিত পদার্থ চোখ, ত্বক, কান, জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ হতে প্রতিনিয়ত বের হয়। খাদ্যদ্রব্যের উচ্ছিষ্ট ও অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিপাক ক্রিয়ার পর মল-মূত্রের মাধ্যমে বের হয়ে আসে। এগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা না করলে যে কোন সময় যে কোন রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, মিল-ফ্যাক্টরি, অফিস-আদালতের কাজ করার সময় হাত, পা, নাক, চোখ প্রতিটি অঙ্গই অপরিষ্কার হয়ে যায়। প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় গোসল করা সম্ভব নয়। শীতের দিনে অনেকে দু এক সপ্তাহ পরও গোসল করে। অথচ এত পরিশ্রমের পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার না করলেও দেহ-মন সুস্থ থাকে না, এ জন্য ওজুর ব্যবস্থা সব চাইতে বেশি কার্যকরী। ওজুর ধারণা মুসলমানদের নিশ্চয়ই আছে। অন্যান্য জাতির এ সম্বন্ধে ভাল ধারণা নেই। তাই সামান্য দু-একটা কথার মাধ্যমে ওজু কি এটা বুঝিয়ে দিয়ে আবার আলোচনায় মন দিচ্ছি। আমি পূর্বে লিখেছি যে, শরীরের বিশিষ্ট অংশগুলি যেমন হাত, পা, মুখ, দাঁত, জিহ্বা, নাক, কান, ঘাড় ও মাথা সুন্দররূপে পরিষ্কার করার নাম ওজু। এর প্রথম শর্ত, পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন হলে সেরে নেওয়া। দ্বিতীয়ত, দন্ত মার্জন, তৃতীয়ত, ওজুর নিয়মানুযায়ী বিশিষ্ট অঙ্গগুলি উত্তমরূপে ধৌত করা।[১]

এটা প্রতিটি মানুষের কাছেই স্পষ্ট যে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার রাখলে রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মন পবিত্র হয়। শরীর সুস্থ হয়। এদিক থেকে ওজুর গুরুত্ব অপরিসীম। পানি সর্বরোগের মহৌষধ। আগুনকে যেমন পানি দ্বারা নির্বাপিত করা যায় তেমনি রোগজীবাণুকেও পানি দ্বারা অপসারিত করা যায়। চোখে ময়লা ঢুকলে, জিহ্বা, দাঁত ও মুখে ময়লা জমলে, নাক-কানের ছিদ্রপথ বন্ধ হলে, হাত-পায়ে কালি লাগলে, চুলের অভ্যন্তরে ধুলা-বালি আটকে থাকলে কোন পেনিসিলিন বা কমবাইওটিক ইনজকশন পুশ করে ময়লা দূরীভূত করা যায় না। কোন দেশী বা বিদেশী নামকরা শক্তিশালী টনিক সেবন করিয়েও এসব পরিষ্কার করা চলে না। পরিষ্কারের জন্য পানিরই প্রয়োজন। এই পানিই ওজুর উপকরণ।

একটি উত্তপ্ত লোহার কাঠির একপ্রান্ত বা দু'প্রান্ত পানিতে ডোবালে যেমন আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ রডটি ঠাণ্ডা হয়ে আসে তেমনি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পানি দ্বারা ধৌত করলে

---

২ , কোরআন ঃ সূরা মোদ্দাসর, আয়াত ৪-৫।

৩ .কোরআন ঃ সূরা আরাফ্, আয়াত ৩১।

টীকা ঃ ১ . ওজুতে ৪টি ফরজ ঃ (১) সমস্ত মুখমণ্ডল চুলের গোড়ালি হতে ধোওয়া। (২) দুই হাতে কনুই পর্যন্ত পরিষ্কার করা। (৩) মাথার একচতুর্থাংশ মুছে ফেলা। (৪) পায়ের নিচের গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করা। এছাড়া ১৫টি সুন্নত আছে। এগুলিও সম্পূর্ণ না করলে ওজু সম্পন্ন হয় না।

www.pathagar.com

শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী শীতল হয়ে আসে। ফলে ক্রোধ, অভিমান, অহঙ্কার, বিতৃষ্ণা, ঘৃণা মন থেকে দূরীভূত হয়ে এক অনাবিল শান্তি অনুভূত হয়। যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে দেহ গঠিত হয়, সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই যদি সুস্থ, সবল ও পরিষ্কার রাখা যায় তবে দেহও অটুট ও সুন্দর হতে বাধ্য। পানি সৌন্দর্যের টনিক পরিষ্কারের উপকরণ ও বিশুদ্ধতার মহৌষধ। এই পানি দ্বারা যে ব্যক্তি নিয়মিতরূপে ওজু করে সে দীর্ঘজীবী, শক্তিশালী ও সুন্দর হয়। তার পাকস্থলী সক্রিয় থাকে, দৃষ্টিশক্তি প্রখর থাকে, মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে, ত্বক মসৃণ হয় ও দাঁত অক্ষুণ্ন থাকে। এককথায় বলতে গেলে, পঞ্চেন্দ্রিয় বার্ধক্যজনিত ক্ষয় ছাড়া অন্য কোন ক্ষয়ে নিষ্ক্রিয় হয় না। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বৃদ্ধ নামাজী—যিনি নামাজের জন্য দৈনিক পাঁচবার ওজু করেন। পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ ব্যক্তি যেখানে হাঁটতে পারে না, চোখে দেখে না—হজম শক্তির অভাবে লঘু পথ্য আহার করে, সেখানে একশ' বছরের বৃদ্ধ সুন্দর চেহারা, অটুট স্বাস্থ্য ও ভাল দৃষ্টিশক্তি নিয়ে চলাফেরা করেন। কেন, তার কারণ রসুলের বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করছি।

"দন্তমার্জন মৃত্যু ব্যতীত সমস্ত রোগের প্রতিষেধক।" (সগির)

আমি পূর্বেই লিখেছি ওজুর পূর্ব-শর্তের মধ্যে দন্তমার্জন অন্যতম। রসুল (দঃ)-এর বাণী হতে আমরা জানতে পারি যে, মিসওয়াক বা দন্তমার্জন করার পর ওজু করে নামাজ পড়লে সত্তর গুণ বেশি পুণ্যলাভ হয়। এর তাৎপর্য আমাদের জানা উচিত ও বোঝা উচিত যে কেন রসুল (দঃ) দন্তমার্জনের ওপর এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মুমেন ব্যক্তি মাত্রই রসুলের বাণীকে ভক্তিভরে গ্রহণ করেন। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) সর্বকাল ও সর্বযুগের একজন অমর বৈজ্ঞানিক। আর অমর অক্ষয় ও অদৃশ্য জগতের এক সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। আমাদের মতো অজ্ঞান ও মুর্খ বিশ্বাসীর দৃষ্টিতেও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক, বেহেশ্‌ত-দোজখের পার্থক্য ও স্বরূপ বর্ণনাকারী এবং আল্লাহর গুণমুগ্ধ প্রেমিক। জ্ঞানী-অজ্ঞানীর দৃষ্টিকে একত্রিত করে আমরা অমর বৈজ্ঞানিক ও গুণমুগ্ধ প্রেমিকের বাণী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই আলোচনা করে এর সার্থকতা প্রমাণ করব।

আল্লাহর অফুরন্ত করুণার দান হিসাবে আমরা যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেয়েছি, মুখের দাঁত তার মধ্যে অন্যতম। শুধু মুখের শ্রী বৃদ্ধি করতেই নয়, পাকস্থলীয় হজম ক্রিয়া সম্পাদন করতে দাঁত যে ভূমিকা পালন করে তা অবর্ণনীয় ও অতুলনীয়।

শিশু তার প্রাথমিক দাঁত দিয়ে শৈশবকাল থেকেই খাদ্যদ্রব্য নিষ্পেষণের পন্থা শিক্ষা করে। এরপর যখন সে কঠিন খাদ্য খাবার প্রয়োজন অনুভব করে তখন অলক্ষ্য থেকে এক বৈজ্ঞানিক প্রাথমিক দাঁত বিদায় দিয়ে শক্তিশালী দাঁত দু-পাটিতে ধীরে ধীরে সংস্থাপন করতে থাকেন। কয়েক বছরে সুন্দর চকচকে এনামেলে ভরা সুসজ্জিত বত্রিশটি দাঁত মানুষের মুখে শোভা পায়। এর সৌন্দর্যে যেমন কবি, লেখক ও প্রেমিকা মুগ্ধ হয়, এর নিখুঁত পেষাই-শক্তি দেখে দেহের রসায়ন পরীক্ষাগার পাকস্থলীও তেমনি তুষ্ট হয়।

কথায় বলে, 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না'—কথাটি যে কত সত্য ও খাঁটি তা বুঝতে একমাত্র সেই ব্যক্তিই সক্ষম যার এ মুল্যবান দাঁত নেই। অরুচি, অকাল বার্ধক্য, দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার মূলে অপরিষ্কার দাঁত বা দাঁতহীন মুখ। যতদিন দাঁত ভাল থাকে ততদিনই পাকস্থলী সবল থাকে। পাকস্থলী সবল থাকার অর্থ দেহ সুস্থ থাকা ও যৌবন অক্ষুণ্ন

www.pathagar.com

থাকা। দাঁতের অভাবে ইচ্ছামতো আহার থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। তাই আস্তে আস্তে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। কেননা প্রয়োজনীয় খাদ্য সুন্দরভাবে পেষাই করে পাকস্থলীতে দিতে পারে না। হজম ক্রিয়ার প্রাথমিক ব্যবস্থা দাঁত। তাই দাঁতের ওপর এত বেশি গুরুত্ব হজরত (দঃ) দিয়েছেন।

অযত্নে দাঁতের জীবনীশক্তি নষ্ট হয়। কেননা আহার করার পর খাদ্যের কিয়দংশ দাঁতের ফাঁকে আটকা পড়ে। সেগুলি সময়মতো পরিষ্কার না করলে পচে দুর্গন্ধ হয় ও রোগজীবাণুর সৃষ্টি করে। এ ছাড়া যে Gum বা মাংসপিণ্ডের সঙ্গে দাঁত সংযুক্ত হয় তা পচে এমন অবস্তার সৃষ্টি করে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতাই থাকে না। যে রোগে দাঁতের এ গুরুতর অবস্থা হয় তাকে পাইওরিয়া বলে। এ সাংঘাতিক রোগ হতে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় শৈশবকাল থেকেই দাঁতের যত্ন করা। দাঁত যেন অপরিষ্কার না হয়, খাদ্যদ্রব্যের কোন অংশই যেন দাঁতের ফাঁকে আটকা না থাকে এর প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। এ জন্যই খাবার পর খিলাল করা ও ওজু করার নির্দেশ হজরত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "খাদ্যের বরকত পূর্বে ও পরে ওজু করা।" (সগির)

অবশ্য ওপরে বর্ণিত হাদিসের নিগূঢ় তত্ত্ব আরও অনেক আছে যেগুলির বিশ্লেষণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

দাঁতের ক্ষয়রোগের ফলে মাংসপিণ্ডে গর্ত হয়, যাকে ডাক্তারি ভাষায় **'ক্যারিস'** বলে। আমরা অবশ্য এ ভাষায় না বলে সোজা বুদ্ধিতে 'পোকা লাগা' বলে থাকি। আসলে কথাটা ঠিক নয়। দাঁতের পেশী বা মাংসপিণ্ড পচে যাওয়ার ফলে হয়তো পোকার সৃষ্টি হয়। দাঁত গবেষকদের মতে, দাঁতের অভ্যন্তরে আটকে থাকা খাদ্যবস্তুর ওপর এক শ্রেণীর অম্ল সৃষ্টিকারী জীবাণুর ক্রিয়ার ফলেই এ 'ক্যারিস' রোগের উৎপত্তি। এই রোগজীবাণু অম্লজাতীয় পদার্থ বা অ্যাসিডের সৃষ্টি করে যা দাঁতের এনামেল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। এছাড়া অন্যান্যদের মতে, 'প্লেক' নামক এক প্রকার আঠাল পদার্থ দাঁতের ওপর যখন জমা হয় তখন রোগজীবাণু এর ওপর আটকা পড়ে। এর মূল কারণ দাঁতের অযত্ন। মুখ থেকে যে লালা নির্গত হয় খাদ্যকণার ওপর তার ক্রিয়ার ফলে (Due to chemical reaction) হলুদ বর্ণের যে পদার্থের সৃষ্টি করে ইংরাজিতে তাকে টার্টার বলে। এসব রোগের মূলে যে দাঁতের অযত্ন তা প্রমাণিত।

শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেছে, রসুলের বাণী নিয়ে আমরা গবেষণায় নামিনি। তাঁর বাণীকে পবিত্র মনে করে চুমো খেয়েছি, কেউ বা ভক্তিভরে স্মৃতিপটে জাগরূপ রেখেছি, কেউ তা পালন করে ধন্য হয়েছি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ল্যাবরেটরিতে প্রমান করে এর সারবত্তা প্রমাণ করি নি। সাধারন একজন মানুষ আরবের এক এতিম শিশু অসহায় ও দরিদ্র এক চিন্তাবিদ রাখাল বালক কোন ল্যাবরেটরিতে গিয়ে সবার অজান্তে দাঁত নিয়ে গবেষণা করেছেন? রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে "Tarter form" করে দাঁতকে নষ্ট করে দিয়ে এ Result কোন সময়ে পেয়েছেন কেউ তা দেখেন নি। অথচ আজ প্রত্যেক শরীর বিজ্ঞানীকেই স্বীকার করতে হচ্ছে যে দাঁতে যে সাংঘাতিক রোগের সৃষ্টি হয় তার মূলে এর অযত্ন, অবহেলা ও নিয়মলঙ্ঘন করা। দাঁতের সুস্থতা সম্বন্ধে হজরত (দঃ) তাঁর বিশাল গবেষণাগার হেরা পর্বতের গুহা থেকে যে থিওরী দিয়েছেন ও প্রমাণ করেছেন তা নিখুঁত সত্য ও যুগ যুগের চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এক যুগের এক বৈজ্ঞানিক পরবর্তী এক বৈজ্ঞানিকের

www.pathagar.com

থিওরী ও প্রমাণকে মিথ্যা ও অসত্য বলে প্রমাণ করে যুগ যুগের ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর কোন থিওরী ও প্রমাণকে আজও কেউ চ্যালেঞ্জ দিতে পারে নি ও অসত্য বলে প্রমাণ করতেও সাহস পায়নি, বরং তাঁর থিওরী মাথা পেতে নিয়ে চলছে গবেষণা ও অভিযান। এ অভিযান ও গবেষণায় মুসলমান পিছপা থাকলেও বিধর্মী জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা পিছপা নন। তাঁরা বুঝেছেন যে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) শুধু মুসলমানের নবীই নন, তিনি বিশ্বের নবী, মানুষের নবী, জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের নবী, সর্ব যুগের, সর্ব ধর্মের, সর্ব সম্প্রদায়ের নবী। কোরআন সত্যি বলেছে—

"তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ও ভয় প্রদর্শনকারী ব্যতীত নও।" (সুরা রাদ)

হজরতের বাণীও এ কথারই সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেন,

"আমি সমগ্র বিশ্বজগতের নবীরূপে প্রেরিত ও মনোনীত হয়েছি।" (তফসিরে হক্কানী)

দাঁতের গুরুত্ব ও রসুলের বাণীর তাৎপর্য ধীরে ধীরে প্রতিটি জাতিই আজ উপলব্ধি করছে। সেদিন খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় এরূপ সংবাদ দেখে আমি যেমন আনন্দিত হলাম তেমনি খুশি হয়ে রসুলের বাণী স্মরণ করলাম। সংবাদটি পাঠকবৃন্দের জন্য পরিবেশন করলাম—

এবারে দাঁত পরিষ্কার অভিযান"

['দৈনিক বাংলা' ঢাকা, বুধবার (মফঃস্বল বৃহস্পতিবার) ২০ সেপ্টেম্বর, ১৩৮৩ বাংলা]

ব্যাংকক —১৮ সেপেটম্বর (এ. এফ. পি)

"ব্যাংকক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ব্যাংকক শহরে দুমাসব্যাপী দাঁত পরিষ্কার অভিযান শুরু করেছেন। আগামী পয়লা অক্টোবর থেকে এ অভিযান শুরু হচ্ছে।"

এই অভিযান শুরু হচ্ছে প্রায় পাঁচ লাখ ছাত্রের বিরুদ্ধে। রাতে আহারের পর দাঁত মাজা নিরর্থক ও সময়ের অপচয় বলে এদের ধারণা।

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের জনৈক কর্মকর্তা বলেন, পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রদেশগুলোর চেয়ে ব্যাংকক শহরে শিশুদের সংখ্যাই বেশি যাদের দাঁত রুগ্ন।

থাইল্যাণ্ড ডেন্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এই অভিযানের প্রস্তাব করেছেন। প্রস্তাব অনুযায়ী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে স্কুলসমূহে দন্ত চিকিৎসক স্বেচ্ছাসেবকদের পাঠানো হবে। **"দাঁত মাজাই যথাযথ পন্থা"**—ছাত্রদের এ ব্যাপারে বোঝানো হবে।

ইতিমধ্যে চুলালংকন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেন্টিস্ট ফ্যাকালটিতে ২০ দিনব্যাপী স্বাস্থ্যবিষয়ক এক সেমিনার শুরু হয়েছে। প্রায় দেড় হাজার স্কুল শিক্ষক এতে যোগ দিয়েছেন।

উক্ত কর্মকর্তা জানিয়েছেন, "দাঁত পরিষ্কার অভিযানে স্কুল শিক্ষকগণও বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন।"

খাদ্যের পুর্বে ও পরে ওজুর কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। এ প্রসঙ্গে দাঁত পরিষ্কার সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করেছি। আর সামান্য একটু আলোচনা করে 'ওজুর' তৃতীয় পর্যায়ের কথা বলব।

www.pathagar.com

দৈনিক পাঁচবার ওজুর পূর্বে যে ব্যক্তি দাঁত পরিষ্কার করে তার দাঁতে পোকা ধরা, পাইওরিয়া হওয়া, ব্যথা হওয়া বা গাম পচে যাবার প্রশ্নই আসে না। দাঁতের মতো অমূল্য সম্পদ সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে যদি রসুলের এরূপ মূল্যবান হাদিসগুলি স্মরণ রাখে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে।

অকালে দাঁত নষ্ট হবার আর একটি কারণ থাকে যেটাকে আমরা প্রায় লোকই জানি না। পায়খানা বা প্রস্রাব করার সময় মুখ বন্ধ রাখা উচিত। পায়খানা-প্রস্রাবের সময় কথা বলা বিড়ি-সিগারেট খাওয়া অনুচিত। কেননা পায়খানা ও প্রস্রাব হতে দূষিত গ্যাস নির্গত হয়। এ গ্যাসের মধ্যে অ্যামোনিয়া অন্যতম। এই অ্যামোনিয়া গ্যাস দাঁতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এ সব তত্ত্বমূলক উপদেশ হজরতের বাণীতে মেলে।

ওজুর তৃতীয় পর্যায় নিয়মানুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে ধৌত করা। এ নিয়ে পূর্বে অনেকটা আলোচনা করেছি। আর সামান্য একটু আলোচনা করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

ধুলা-বালি ও গ্যাসে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দূষিত হয়। নাক, কান ও চোখের ভ্রূতে অসংখ্য ময়লা জমে থাকে। এগুলিতে রোগ-জীবাণুও থাকে। দৈনিক পাঁচবার ওজু করলে শরীর পরিষ্কার হয়, রোগজীবাণুর হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। তাহলে দেখা যায় যে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য 'ওজু' অপরিহার্য। ওজু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

ওজুর পূর্ব শর্তের অন্যতম শর্ত ছিল পায়খানা প্রস্রাব সেরে নেওয়া। পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য যে সব নিয়ম-কানুন তিনি দিয়েছেন তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান। শরীরের অপ্রয়োজনীয় ও অপবিত্র পদার্থগুলি পায়খানা ও প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয় বলে আমরা বেঁচে থাকি। নইলে বাঁচবার কোন উপায় ছিল না। এসব দূষিত পদার্থ নির্গমনের সময় কোটি কোটি রোগজীবাণু শরীর থেকে বের হয়। সে সব শরীরে অথবা কাপড়-চোপড়ে লাগলে সহজেই রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্যই সতর্কতা অবলম্বন করে শরীরকে রোগজীবাণু থেকে মুক্ত রাখতে হয়। পায়খানার পর তিনি ঢিলা কুলুক ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। মাটির ঢিলা উত্তম কুলুক। কেননা মাটি দ্বারা গুহ্যদ্বার পরিষ্কার করা যেমন আরামদায়ক তেমনি ফলদায়ক। কেননা নরম Rectum -এ মাটি ব্যবহার করলে আঘাতের সম্ভাবনা থাকে না। রোগজীবাণু ও ঢুকতে পারে না। কেননা মাটিতে কোন রোগজীবাণু থাকে না। যার Rectum আক্রান্ত, পায়খানার সময় রক্ত পড়ে তার একমাত্র ওষুধ মাটি। এজন্যই দেখা যায় মাটি গরম করে সেঁক দিলে ব্যথা দূর হয় ও রক্ত বন্ধ হয়। মাটি জীবাণু ধ্বংসকারী অদ্বিতীয় প্রতিষেধক। সম্ভবত এ কারণেই রসুল ন্যাকড়া বা কাগজ ব্যবহারের চাইতে মাটির ব্যবস্থাই দিয়েছেন। হাত পরিষ্কারের জন্যও এই মাটির কথাই বলেছেন। তিনি নিজে পায়খানা-প্রস্রাবের পর তিনটি বা পাঁচটি কুলুক ব্যবহার করতেন এবং সবাইকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

"বাহ্য প্রস্রাবের পর পাথর কিংবা মাটি দ্বারা কুলুক ব্যবহার করা দরকার।" (মকছুদুল মোমেনিন)

কুলুক ব্যবহারকারীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণী এ কথা প্রমাণ করে।

"হুয়া-জাকা ফায়ালার সুমুহু" অর্থাৎ "তোমরা খুব ভাল কাজ করিতেছ এবং সর্বদাই ঐরূপ করিতে থাক।" (মকছুদুল মোমেনিন)

www.pathagar.com

কথাটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করলে সবার নিকট এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ নিজে পবিত্র। তাই পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তিনি ভালবাসেন। যখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর কোরআনের এ বাণীটি অবতীর্ণ হয়—

"তাহাদের মধ্যে কতক লোক আছে যাহারা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসেন এবং আল্লাহও পবিত্রদিগকে অত্যন্ত ভালবাসেন।"[১] (৯ ঃ ১০৮)

তখন হজরত মসজিদে উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের দ্বারা ঐরূপ কোন কার্য সম্পাদিত হচ্ছে?"

তাঁহাদের মধ্য হতে অনেকেই বললেন, আমরা সর্বদাই পায়খানা ও প্রস্রাবের পর তিনটি করে কুলুক ব্যবহার করে থাকি। তৎপর উক্ত স্থান উত্তমরূপে পানি দ্বারা ধৌত করি। এ শুনে হজরত খুশি হয়ে বললেন, "তোমরা খুব ভালো কাজ করিতেছ এবং সর্বদাই ঐরূপ করিতে থাক।"

হজরত যখন পায়খানায় যেতেন তখন বলতেন, "হে আমার আল্লাহ্ কদর্যতা ও অপবিত্রতা হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।" (তিরমিজি)

পায়খানা হতে ফিরে আবার বলতেন, "হে আল্লাহ্। তোমারই মার্জনা ভিক্ষা করি।" (শায়খান)

কুলুক ব্যবহার যে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একথা স্বজাতি-বিজাতি, আস্তিক-নাস্তিক প্রতিটি জ্ঞানী ব্যক্তিই স্বীকার করেন এবং রসুলের বাণীর প্রাধান্য দেবেন এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আমি নিজে শরীরবিজ্ঞানী নই। কোন ডাক্তারি, কবিরাজি হোমিওপ্যাথ বা আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্র পাঠ করার অবকাশ পাইনি। বিজ্ঞানের একজন ছাত্র ছিলাম, বিজ্ঞান বিভাগেই চাকরি করি। তাই তার, বেতার ও ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির ওপরই যা কিছু চিন্তা ও গবেষণা করি। সাধারণ একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ডাক্তারি শাস্ত্র লিখলে মানুষের কাছে মনঃপূত হবে না এবং নিছক হাস্যাস্পদ হবো এতেও কোন সন্দেহ নেই। তবু নিজের সাধারণ চিন্তাধারা ও জ্ঞানীদের মন্তব্যের ওপর বিশ্বাস ও ভরসা রেখেই দু-এক কলম লিখি। তাই ভুল বিশ্লেষণ স্বাভাবিক। একজন মহাজ্ঞানীর নিকট শুনেছিলাম,

পায়খানার পর মাটির ঢিলা দ্বারা Rectum পরিষ্কার করলে সে কোনদিন অর্শরোগে আক্রান্ত হয় না। দ্বিতীয়ত, Rectum-এর সংকোচন ও প্রসারণের সঙ্গে বীর্য স্তম্ভন ঘটে এমন তত্ত্বমূলক বাণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে বোঝাতে আমি অক্ষম। তবে Rectum -এর সঙ্গে মাটির সংযোগ ও তার কার্যকারিতার কিছুটা বিশ্লেষণ আমি পূর্বে দিয়েছি। বাকিটুকু শরীরবিজ্ঞানীদের জন্য রেখে দিলাম।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেও ওজুর গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে রসুল (দঃ)-এর দু একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেছেন,

"ওজু ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না এবং চুরি করা জিনিস দ্বারা সাদকা হয় না।" (তিরমিজি)

টীকা ঃ ১ .কোরআন ঃ সূরা তওবা, আয়াত ১০৮।

www.pathagar.com

"যখন কোন মুসলিম বান্দা অথবা মুমেন ওজু করে এবং মুখ ধোয় তখন তাহার চক্ষু দ্বারা যে পাপের দিকে সে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, তাহা উহার পানির সঙ্গে বা শেষ ফোটার সহিত তাহার মুখ হইতে দূরীভূত হয়। অতঃপর যখন সে তাহার হাত দুইখানি ধোয় তখন হাত দিয়া যাহাকিছু পাপ স্পর্শ করিয়াছে সমস্তই উহার পানির সঙ্গে বা শেষ বিন্দুর সহিত দূরীভূত হয়। যখন সে তাহার পা দুইখানি ধোয় তখন তাহার পা দিয়া যে পাপ সে স্পর্শ করিয়াছে সকলই সেই পানির সঙ্গে বা উহার শেষ বিন্দুর সহিত দূরীভূতি হয়, ইহাতে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।" (মুসলিম)

"রোজ কিয়ামতে আমিই সর্ব প্রথমে সেজদা করিতে আদিষ্ট হইব এবং আমিই সর্বপ্রথমে মাথা তুলিতে হুকুম পাইব। তখন আমার সম্মুখে যাহা আছে সবই দেখিব। সকল মানুষের মধ্য হইতে আমি আমার উম্মতদিগকে চিনিতে পারিব। তাহাদের মধ্যে একদল আমার পশ্চাতে একদল আমার দক্ষিণে ও বামে থাকিবে।" (মিশকাত)

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—"হে রসুলুল্লাহ (সঃ)। কিরূপে আপনি হজরত নুহ ও আপনার উম্মতদিগকে চিনতে পারিবেন? তিনি বলিলেন, **ওজুর ফলে তাহাদের উজ্জ্বল ললাট হইবে**। তাহারা ব্যতীত আর কেহই তাহাদের মতো হইবে না। তাহাদিগকে চিনিতে পারিব যেহেতু তাহারা তাহাদের আমলনামা ডান হাতে ধারণ করিবে এবং আমি চিনিতে পারিব যেহেতু তাহাদের ছেলেমেয়েরা তাহাদের সম্মুখে দৌড়াইতে থাকিবে।" (সগির)

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর আল্লাহর নির্দেশ স্মরণীয় ঃ

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, যখন তোমরা নামাজে দণ্ডায়মান হও তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং তোমাদের মস্তকসমূহ মুছিয়া ফেল এবং পদ-সমূহ গুলফ-গ্রন্থি পর্যন্ত; এবং যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে অবগাহন (গোসল) কর এবং যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা প্রবাসে অবস্থান কর কিংবা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা হইতে প্রত্যাগত হয় অথবা তোমরা স্ত্রী-সংসর্গ কর এবং তখন যদি পানি না পাও তবে বিশুদ্ধ ভূমির আকাঙ্ক্ষা কর, অতঃপর তদ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হস্তসমূহ মুছিয়া ফেল। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কোন কঠোরতা ইচ্ছা করেন না; কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে এবং তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" (৫ ঃ৬)

নামাজের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ওজুর সম্বন্ধে আলোচনা করলাম।ওজুর প্রয়োজন কি, শরীরবিজ্ঞানে ওজুর গুরুত্ব এত অধিক কেন— কিছুটা আলোচনা করেছি। এবার নামাজের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

www.pathagar.com

নামাজের প্রয়োজনীয়তা

দেহ ও মন পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যই নামাজ। নামাজ ভিন্ন একই সঙ্গে দেহ ও মনের সাধনা হয় না। ধনী-গরিব, যুবক-বৃদ্ধ সবাইকে নামাজ পবিত্র করে, সুস্থ করে। বৃহত্তম সামাজিক জীবন গড়ে তুলবার কৌশল শিক্ষা দেয়। লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি হিংসাত্মক পন্থা থেকে রক্ষা করে। রোগজীবাণুর হাত থেকে মুক্ত করে। শারীরিক, মানসিক ও অন্তরব্যাধি হতে দূরে রাখে। নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়। উপরন্তু নামাজ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও অসীম ক্ষমতাকে স্বীকার করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা নির্দেশ করে ইহজগৎ ও পরজগতের মঙ্গল এনে দেয়। হজরত (দঃ)-এর দু-একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রমাণ করছি।

"আল্লাহ্ বলেন—আমি নামাজকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি। অর্ধেক আমার জন্য—অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য।" (মুসলিম)

"নিশ্চয় প্রতি রাত্রিতে এমন একটি সময় আসে যখন যে কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য কিছু প্রার্থনা করে—সে সমস্তই প্রাপ্ত হয়।" (মুসলিম)

"এমন কোন লোক নাই যে, যখন সে কোন পাপ কাজ করে অতঃপর অনুতপ্ত হয়, তৎপর ওজু করে নামাজ পড়ে, অতঃপর আল্লাহর মার্জনা ভিক্ষা করে কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করেন না।" (তিরমিজি)

নামাজ বা উপাসনা প্রতিটি জাতির জন্যই অবশ্য কর্তব্য। প্রতিটি ধর্মের প্রতিটি নবী-পয়গম্বরদের ওপরই এ উপাসনার নির্দেশ ছিল। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করে এ সত্যে আমরা উপনীত হয়েছি। হজরত ইব্রাহিম (আঃ), হজরত মুসা (আঃ), হজরত ঈসা (আঃ) প্রত্যেকেই নিয়মিতভাবে এ উপাসনা করেছেন। তবে পদ্ধতি ভিন্নতর ছিল। আল্লাহর নিকটবর্তী হবার জন্য হৃদয়মনকে পবিত্র করার জন্য, শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, সমাজের আদর্শ মানব হবার জন্য, প্রেম-প্রীতি ও সহানুভূতির জন্য, হৃদয়ের কলুষ কালিমা মুছে ফেলার জন্য, ইহকাল ও পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য—এ নামাজ বা উপাসনা অপরিহার্য। সৃষ্টিকর্তা—মহান আল্লাহ্ প্রতিটি জাতির প্রতিটি মানুষকে উদ্দেশ্য করে তাই বলেছেন—

"এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তাহারই জন্য: **এবং যাহারা তাহার সন্নিকটে আছে তাহারা তদীয় উপাসনা সম্বন্ধে** অহঙ্কার করে না। তাহারাই রজনী ও দিবসে মহিমা বর্ণনা করিয়া থাকে এবং কখনও ক্লান্ত হয় না।[১] (২১ ঃ ১৯)

"নিশ্চয় ইহাতে উপাসনাকারী সম্প্রদায়ের জন্য সুসংবাদ রহিয়াছে।"[২] (২১ ঃ ১০৬)

"এবং নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে রসুল সমুদ্ভব করিয়াছি যে তোমরা আল্লাহর আরাধনা কর এবং শয়তানকে বর্জন কর।"[৩] (১৬ ঃ ৩৬)

টীকা ঃ ১. কোরআন ঃ সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১৯।

২. কোরআন ঃ সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৬।

৩. কোরআন ঃ সূরা নহল, আয়াত ৩৬।

www.pathagar.com

রোজা

"নিশ্চয় প্রত্যেক জিনিসের জন্য যাকাত আছে। শরীরের যাকাত রোজা।" (ইবনে মাজা)

রোজার অর্থ কি? সূর্য উদয়ের একঘণ্টা পূর্ব হতে সূর্য অস্তমিত হবার পর পর্যন্ত সময়ে পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম রোজা। এ রোজা দু প্রকার। একটি বাধ্যতামূলক, যেমন রমজানের রোজা, আর একটি ইচ্ছামূলক, যেমন নফল রোজা–মাসের যে কোন সময়। ইসলামের দৃষ্টিতে এ রোজার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি মুসলমানই এ বিষয়ে অবগত আছে। তাই এদিকটার ওপর বিশেষ আলোচনা না করে রোজার সঙ্গে শরীর-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ কি সেটা নিয়েই একটু আলোচনা করব।

চাঁদের বার মাসের মধ্যে এক মাসের নাম রমজান। এই রমজান মাসের রোজা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ।[২] রমজান শব্দটি আরবীর 'রমজ' ধাতু হতে আগত। রমজ অর্থ–পোড়ান, জ্বালান বা দহন করা। মানুষের দেহকে পোড়ান দরকার কেন? এ পোড়ান অর্থ কি আগুন দিয়ে জ্বালান? না আগুন জ্বালিয়ে তার অভ্যন্তরে মানুষকে ফেলে দিয়ে পোড়ান? এ অর্থে রমজ বা রমজান শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। হয়েছে ভাবগত অর্থে।

খনিজ দ্রব্য ভূ-পৃষ্ঠ হতে উত্তোলন করেই কাজে লাগান যায় না। কেননা এর সাথে মিশ্রিত থাকে বিভিন্ন ধাতু। লোহাকে ধারাল ছুরিতে রূপান্তরিত করতে হলে আগুনে পোড়াতে হয়। এরপর পিটিয়ে একে সুন্দর চকচকে ও ধারাল করা হয়। খাঁটি সোনা পেতে হলেও আগুনে পুড়িয়ে খাদ বের করতে হয়। নইলে সোজা খনি হতে তুলেই ইচ্ছামতো ব্যবহার করা চলে না। সোনার প্রকৃত রং তখনি হয়, যখন আগুনে নানাভাবে জ্বালিয়ে তামা, সিসা ইত্যাদি খাদ অপসারিত করা হয়। কয়লা থেকেই হীরার জন্ম হয়। কয়লার জন্মের কথা সবাই জানে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বন-জঙ্গল মাটিতে চাপা থাকলে অর্থাৎ ভূ-গর্ভে প্রচণ্ড উত্তাপে সেগুলি পুড়ে কয়লার খনি হয়। এই কয়লা আবার পুড়েই হীরকের সৃষ্টি করে।

আর্দ্র ভূমিতে ফসল উৎপন্ন হয় না। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসের তপ্ত কিরণে যখন মাটি জলশূন্য হয় অর্থাৎ ভাং ভাজার রূপ ধারণ করে তখন আকাশের বারিবর্ষণ তাকে সরস ও সজীব করে তোলে। এই উত্তপ্ত মাটি পানির সংস্পর্শে এসেই সারের সৃষ্টি করে ও সোনার ফসল ফলায়। যে মাটিতে সূর্যকিরণ পড়ে না, যে মাটি দহনক্রিয়ায় উত্তপ্ত হয় না, সে মাটি অকেজো, রোগজীবাণুর ঘাঁটি।

আমি পূর্বেই লিখেছি মানবদেহ মাটি হতে সৃষ্টি। মাটির বৈশিষ্ট্যই এতে বিদ্যমান। মাটির রূপে রূপায়িত। মাটির গুণে গুণান্বিত। মাটিকে উত্তপ্ত করে যদি এতে সোনা ফলান যায়, দহন ক্রিয়ার ফলে যদি একে সারে রূপান্তরিত করা যায় তবে মাটির দেহকে উত্তপ্ত করে, দহনজ্বালায় এর ইন্দ্রিয়সমূহ দমন করে কেন এতে সৃষ্টি বৈচিত্রের রূপ দেখা যাবে না? 'যাবে' নিশ্চয়ই যাবে। এর পরীক্ষা মহামনীষীরা তাঁহাদের জীবনে করেছেন বলেই ধন্য হয়েছেন মাটির দেহ খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত করে জগৎকে মুগ্ধ করেছেন। এজন্যই হজরত বলেছে, "শরীরের যাকাত রোজা।"

---

২. ফরজ-অবশ্য কর্তব্য। বাধ্যতামূলক আল্লাহর নির্দেশ। এটা পালন না করলে পাপী হতে হবে। মুসলমানরূপে আখ্যায়িত হবে না।

www.pathagar.com

দেহকে পোড়াতে হলে দহন ক্রিয়ায় এর ইন্দ্রিয় শক্তিগুলিকে ধারাল ও শক্তিশালী করতে হলে প্রয়োজন রোজা বা উপবাস। বিভিন্ন ধর্মের মনীষীরা উপবাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন, শরীর বিজ্ঞানীরা উপবাসকে শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলেন। যোগসাধনকারীরা একে ধারাল অস্ত্র বলেন। পয়গম্বরগণ আল্লাহর দর্শনলাভের কৌশল বলেন। আর বৈজ্ঞানিক নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ভাষায় রোজা, সংযম, সাধনা, ঈমান, দেহ ও মনের মহৌষধ। এ ওষুধ ছাড়া মানব জীবন অবাস্তব। কেন, তার বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করছি।

সংযম অর্থ ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা। এর ওপর আমার সামান্য জ্ঞানের মাধ্যমে চরিত্র পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। এর ওপর আলোচনা করার মতো আর কিছু আমার জ্ঞানে আসে না। তবুও সংযমের সঙ্গে শরীরবিজ্ঞানের ও সমাজবিজ্ঞানের কি সম্বন্ধ আছে এর একটু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।

সহিষ্ণুতা, সংযম বা ধৈর্য ছাড়া দেহ ও মনকে সুস্থ রাখা যায় না। যখন যা খুশি তাই যদি কেউ করতে চায় তাহলে সে লাগামহীন ঘোড়ার বৈশিষ্ট্য লাভ করে। রোগীদের অনেক কিছুই খেতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ডাক্তারগণ রোগীর ইচ্ছানুযায়ী পথ্যের ব্যবস্থা করেন না। কেননা তাঁরা জানেন যে রোগীর ইচ্ছামতো খাদ্যের পরামর্শ দিলে চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে না। কেননা সে চিকিৎসায় রোগীকে আরোগ্য করা সম্ভব নয়। কলেরা রোগী পানি পান করার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে, পেটের অসুখের রোগী মাংস, ডিম, দুধ, ঘি, পোলাও, কোরমা খাবার জন্য পাগল হয়ে যায়। জরাক্রান্ত ব্যক্তি ভাতের নেশায় অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু ডাক্তার তাদের বাধ্য করে বিরত থাকতে সেইসব খাদ্য ও পানীয় হতে যা রোগজীবাণু ধ্বংসের পরিবর্তে বিস্তার লাভে সহায়তা করে। রোগীরা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ধৈর্য ধরে কষ্ট করে বলেই নিরাময় হয়।

যৌবনের প্রাণচাঞ্চল্য দেহ ও মনের ওপর এমন প্রচণ্ড আঘাত দিতে থাকে যে নারীর সঙ্গও নারীর সঙ্গে যৌনমিলন ছাড়া বসন, ভূষণ, ধন, মান, রাজ্য ও সিংহাসন কোন কিছুই পুরুষকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না। যৌনকামনা ও যৌনবাসনা পরিতৃপ্ত করতে অনেক যুবককে কঠোর, নিষ্ঠুর অত্যাচারী ও ব্যভিচারী হতে দেখা যায়। খাওয়া, ঘুম, পড়াশুনা, নিয়ম-কানুন সব পরিত্যাগ করে ফেরে এই নারীর পেছনে। ফলে শরীরের ওপর তাদের এমন কঠিন আঘাত পড়ে যে অকালে বার্ধক্য এসে দেহ-মনের সমস্ত সুখ কেড়ে নেয়। পাপের কথা বাদ দিলেও, পরজগতের চিরসুখের কথা ছেড়ে দিলেও ইহজগতের আনন্দ, শান্তি ও সুখ তাদের জন্য হারাম হয়ে পড়ে। কারণ সংযমের অভাব।

যারা সংযমী নয়, ধৈর্য ধরতে যারা জানে না, সামান্য কথাতেই তারা ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। ফলে শরীরের শিরা-উপশিরা স্ফীত হয়ে ওঠে। ক্রোধের আগুন তাদের শরীরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। ক্রোধান্বিত ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের পীড়া, পেটের পীড়া, চোখের পীড়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। অল্প বয়সেই কাঁচা চুল সোনালী পাটের রূপ ধারণ করে। চোখে ভূত, প্রেত ও সরিষার ফুল দেখতে পায়। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী, সব তার চোখে পর হয়ে দাঁড়ায়। অসংযমী ব্যক্তিদের ক্রোধ তাদের জন্য কবর রচনা করে।

তৃতীয়ত, জিহ্বার সংযম। অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায় তাদের জিহ্বাকে সংযত করতে পারে না। যা কিছু খাবার দেখতে পায় তাতেই তাদের লোভ হয়। ফলে ভাল মন্দের বিচার না করে, পাকস্থলীর Capacity বিচার না করে,টাকা-পয়সার হিসাব না করে জিহ্বাকে সন্তুষ্ট করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে; ফলে অম্লশূল, পিত্তশূল, বদহজম, ডাইরিয়া, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। এ সব ভয়াবহ রোগের উৎপত্তি হয় শুধু সংযমের অভাবে। সংযম নিয়ে বিশ্লেষণ করলে এরূপ হাজার হাজার দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে।

www.pathagar.com

সংযম শরীর-বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। সংযমী ব্যক্তিদের ওষুধের প্রয়োজন হয় না। তাদের মস্তিষ্ক শীতল রাখতে মহাভৃঙ্গরাজ, হিমসাগর বা কদুর তেল ব্যাবহার করতে হয় না। চোখের দৃষ্টিবর্ধন করতে শক্তিশালী চশমা নিতে হয় না। সংযমী ব্যক্তি চিরদিন সুস্থ থাকে।

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সংযমের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি সে কথা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। এই সংযম শিক্ষা দিতেই হজরত (দঃ) রমজানের রোজা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। ধনী, দরিদ্র, নারী, পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ, রাজা, মহারাজা সবার জন্যই নির্দেশ দিয়েছেন সংযমের সঙ্গে রমজানের রোজাপালন করতে। ধনীগোষ্ঠী কোনদিনই গরিবের ব্যথা বুঝত না। জঠরজ্বালা কোনদিনই তারা অনুভব করত না, শীত-গ্রীষ্মের রাতে সুখের নিদ্রা ভেঙে 'সেহেরি'[১] খেতে উঠত না। পরমাসুন্দরী স্ত্রীর পার্শ্বে বসেও তসবি তেলওয়াত করত না, ভোগবিলাসের সামগ্রী প্রস্তুত দেখেও বার বার থুথু ফেলে রসনা শুষ্ক করতো না যদি রমজানের রোজা তাদের জন্য ফরজ না হতো। রমজান ধৈর্যের শিক্ষা দেয়, রমজান কামরিপু সংযমের ওষুধ দেয়, রমজান দীন-দরিদ্রের ব্যথার জ্বালা অনুভব করার সুযোগ দেয়। এই রমজান পালনকারী সংযমীরা সামাজিক শৃঙ্খলার বীজ বপন করে, শরীরবিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করে, ব্যথিত প্রানে অমৃত ধারা এনে দেয়। হজরত (দঃ)-এর বাণী এ সাক্ষ্য দেয়–

"রোজা রাখ, তাহা হইলে সুস্থ থাকিতে পারিবে।"[২]

রমজানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনা। এ সাধনার ওপর একটু আলোচনা করছি।

সাধনা ঃ

মানুষ যে কোন সাধনাই করুক না কেন ভরা পেটে তা সম্ভব নয়। কেননা পেট ভর্তি হলে দুটি রোগ তৎক্ষণাৎ পেয়ে বসে। একটি কাম উদ্দীপনা, দ্বিতীয় ঘুম। কাম উদ্দীপনা জাগলে জ্ঞানীর জ্ঞান সাধনা লোপ পায়। মুনির ধ্যান ভেঙে যায়। ঋষির তপস্যা নষ্ট হয়ে যায়। এ কাম রিপুকে দমন করার একমাত্র পন্থা একাধারে রোজা রাখা। মহামনীষীরা এই জন্যই বলেছেন–

"যে ব্যক্তি একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত কিছুই আহার না করিয়া থাকিতে পারিবে সে ব্যক্তি অদৃশ্য জগতের বিচিত্র দৃশ্যাবলীর কিছু না কিছু অবশ্যই দেখিতে পাইবে।"[১]

দ্বিতীয়ত, ঘুমরোগ যাকে পায় তার দ্বারা সাধনা চলে না। পেট ভর্তি হলে ঘুম ধরবেই। একে রোধ করার উপায় নেই। চোখ যখন ঢুলু ঢুল করে তখন সাধনার চাইতে ঘুমকেই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। যারা সাধক, সাধনাই যাদের তপস্যা, তাদের জন্যই হজরত (দঃ)বলেছেন,

"নামাজ ও জেকেরের জন্যই শুধু আহার করিবে। আহারের পর শয়ন করিবে না। অন্যথায় তোমার অন্তর অন্ধকার ও কালিমাময় হইয়া যাইবে।"[২]

হজরত (দঃ)-এর বাণীর মধ্যে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক থিওরী নিহিত রয়েছে। **"আহারের পর শয়ন করিবে না।"** কথাটি শরীরবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাত্রিতে আহারের পরক্ষণেই শয়ন করাকে এ বাণী ইঙ্গিত দিচ্ছে। কেননা দ্বিপ্রহরের

টীকা ঃ ১. সেহেরি-পূর্ব আকাশ ফর্সা হবার পূর্ব পর্যন্ত পান-ভোজনকে সেহেরি বলে। রোজা পালনের উদ্দেশ্যই মুসলমানগণ শেষ রাত্রিতে ঐ সেহেরি খান।

২. হাদিস। সংগৃহীত-কিমিয়ায়ে সা'আদত কৃত ইমাম গাজ্জালী।

টীকা ঃ ১__২. হাদিস। সংগৃহীত- কিমিয়ায়ে সা'আদত কৃত পূর্বে বর্ণিত।

www.pathagar.com

আহারের পর হজরত (দঃ) বিশ্রামের উপদেশ দিয়েছেন। শরীরবিজ্ঞানীদের মতে, রাত্রিতে আহারের পর কিছুক্ষণ পরিশ্রম করা দরকার। তাঁদের মতে মধ্যাহ্নে ভোজনের পর বিশ্রাম ও রাত্রিতে ভোজনের পর অন্ততপক্ষে এক মাইল হাঁটা প্রয়োজন। এতে হজম-ক্রিয়া সহজ হয়।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, নীরব নিঃস্তব্ধ অন্ধকার রজনী সাধনার শ্রেষ্ঠতম সময়। সারাদিন কর্মক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেহে, অসুস্থ মনে আল্লাহর ধ্যান হয় না। কেননা মানুষ দিনে তার জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যস্ত থাকে। রাত্রিই উপযুক্ত সময়। এ সময়ের প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করেন। কেননা এ নীরব সাধনা শুধু আল্লাহর ভয়ে বিশ্বাসী ব্যক্তিরাই করে থাকেন। বন্ধু-বান্ধবের কাছে বাহবা কুড়াতে নয়, সমাজের কাছে ধার্মিক বলে পরিচিত হতে নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই হল তার চরম ও পরম কামনা।

সাধনার জন্য ধৈর্য ও ঈমান দুটিই প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজন মেটাতে পারে রোজা। রসুল (দঃ)-এর বাণী তারও সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেন,

"ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক আর রোজা ধৈর্যের অর্ধেক।" (হাদিসের আলো)

কোন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তার তার রোগের কারণ নির্ণয় করে রোগজীবাণু ধ্বংস করার ওষুধ প্রয়োগ করেন। এরপর রোগীকে সবল করার জন্য টনিক জাতীয় ওষুধ দেন। রোগজীবাণুকে ধ্বংস করতে যেমন ওষুধের প্রয়োজন, অন্তরব্যাধি নিরাময়ের জন্যও তেমনি রোজার প্রয়োজন। টনিক বা ভিটামিন ব্যবহার করে যেমন দুর্বল রোগী সবল হয়, তেমনি ব্যাধিযুক্ত আত্মা ও মনকেও সাধনা বা রোজার দ্বারাই সবল করতে হয়।

নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত এ কয়টিই ঈমানের অঙ্গ। কোনটিকে বাদ দিয়ে ঈমান বা বিশ্বাস পূর্ণ হয় না। আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস, প্রেম ও ভালবাসা এনে দিতে রোজার গুরুত্ব অপরিসীম। কেন তার বিশ্লেষণ সংযম পরিচ্ছেদে দিয়েছি। **ইন্দ্রিয় শক্তিকে জোরপূর্বক দমন করে ক্ষুধার জ্বালা হাসিমুখে সহ্য করে কাম রিপুকে কোণঠাসা করে যে সাধনা করা হয় সেটাই শ্রেষ্ঠতম ঈমানের পরিচয়।** যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিজের এ পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয় তার জন্য হজরত (দঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোজা রাখে, আল্লাহ তাহাকে দোজখের আগুন হইতে ৭০ বৎসরের পথ দূরে রাখেন।"[১]

অন্যত্র বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোজা রাখে, আল্লাহ্ তাহার ও দোজখের মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী ব্যবধানের তুল্য দূরত্ব স্থাপন করেন।"[২]

দেহ ও মনের ওপর রোজার ক্রিয়া কি এ নিয়ে প্রথমাংশেই আলোচনা করেছি এবং দেখিয়েছি যে দেহকে রোজার মাধ্যমে না পোড়ালে আত্মাকে নির্মল করা যায় না। খাঁটি সোনার মতো ও স্বচ্ছ আয়নার মতোও করা যায় না। আত্মা শুদ্ধ হলেই মন পবিত্র হয়। মন পবিত্র হলেই দেহ সুস্থ ও সবল থাকে। **রোজাকে তাহলে বলা যায় দেহ, মন ও আত্মার ওষুধ।**

রোজা আল্লাহর নির্দেশ। কোরআন এর সাক্ষ্য দেয়–

টীকা ঃ ১__২. হাদিস। শায়খান ও তিরমিজি।

www.pathagar.com

"এবং প্রত্যূষে কৃষ্ণ সূত্র হইতে শুভ্র সূত্র প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা ভোজন ও পান কর। অতঃপর রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা রোজা পূর্ণ কর।"[১] (২ঃ১৮৭)

খাদ্য ও পানীয়

হজরত বলেছেন–

"অতিরিক্ত ভোজন দুর্ভাগ্যসূচক।"[২]

"অধিক পানাহার দ্বারা তোমার অন্তর নির্জীব করিও না। অন্তর শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতিরিক্ত হইলে যেমন ইহার শস্যনষ্ট হইয়া যায়, তেমনি অতিরিক্ত পানাহারে অন্তর প্রাণহীন হইয়া যায়।"[৩]

খাদ্য ও পানীয় ছাড়া দেহরক্ষা হয় না। দেহকে সুস্থ, সবল ও বর্ধিষ্ণু করতে খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন যে কত বেশি তা বলার অপেক্ষা করে না। আমরা দৈনন্দিন যা আহার ও পান করে থাকি তার মধ্যে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন থাকে। এই ভিটামিন শরীরকে বর্ধিষ্ণু করে, শক্তিশালী করে ও কর্মপ্রেরণা দেয়। সুতরাং খাদ্য ও পানীয় উপযুক্ত কি না, কোন্ ধরনের খাদ্য শরীরের পক্ষে উপযোগী, কোন্‌টি ক্ষতিকর, কোন্ অংশ বর্জনীয়, কি পরিমান খাদ্য দেহকে পুষ্ট করে এগুলির জ্ঞান থাকা দরকার। শরীরবিজ্ঞানীরা বলেন,

(১) প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে আহার করিবে।

(২) অতিরিক্ত ভোজন করিবে না।

(৩) খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্বন করিবে।

(৪) তড়াতাড়ি ভোজন করিবে না।

(৫) আহারের সময় কথা বলিবে না।

(৬) আহারের সময় পানি পান করিবে না। অধঘন্টা পরে করিবে।

(৭) আহারের পুর্বে ও পরে উত্তমরূপে হাত ও মুখ ধৌত করিবে।

(৮) রাস্তার ধারে, হোটেলের তৈরি বা ভেজাল দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না ইত্যাদি।

এবারে আমরা হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণী বিশ্লেষণ করব এবং দেখব শরীরবিজ্ঞানীদের মতবাদের সঙ্গে মিল এবং গরমিল কতটুকু। তাঁর বাণীগুলো বিজ্ঞানসম্মত কি না।

'অতিরিক্ত ভোজন দুর্ভাগ্যসূচক'–হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর এই গুরুত্বপুর্ণ বাণী আমরা এ পরিচ্ছেদে আরম্ভ করছি।

টীকা ঃ ১. কোরআন ঃ সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৮৭।

২. হাদিস-বায়হাকী।

৩. হাদিস। সংগৃহীত-সৌভাগ্যের পরমশমণি। পৃষ্ঠা ৯৮।

www.pathagar.com

দেহের ক্ষয় পূরণ, বৃদ্ধি ও জীবন ধারণের জন্যই মানুষ পান, ভোজন করে। যে ভোজন ছাড়া জীবন রক্ষা হয় না, সে ভোজন অতিরিক্ত হলে ক্ষতি কি? এটা সবারই ধারণা। তাই মা-বাবা আদর করে ছেলে-মেয়েদের এমনভাবে খাওয়ায় যে লাভের পরিবর্তে ক্ষতিই হয় বেশি। অল্প আহারে মানুষ মরে না কিন্তু অতিরিক্ত ভোজনে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি। কেননা যা হজম করতে পারে না তা শেষে বিষের ক্রিয়া করে। এ বিষই হয় তার মৃত্যুর কারণ। এছাড়া অতিরিক্ত ভোজনের ফলে অগ্নিমন্দা, পেট ফাঁপা, বদহজম, ডাইরিয়া, আমাশয় প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। ফলে অকালেই বার্ধক্য এসে মৃত্যুর কোলে তুলে দেয়। যে খাদ্য শরীরের পুষ্টি সাধন করে, শরীরের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণ করে, কর্মশক্তি ও তাপ উৎপাদন করে, রোগ প্রতিষেধক ওষুধ সৃষ্টি করে, সে খাদ্যই আবার উল্টো ক্রিয়া করে মানব জীবনের জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। রসুল (দঃ)-এর এ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শরীরবিজ্ঞানীদের জন্য এ থিওরী নিয়ে আসে এক যুগান্তকারী আলোড়ন। কেন, সে জবাব তাঁদের বিশ্লেষণের মাঝেই মেলে।

আহারের পর খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। এখান থেকেই খাদ্যের সারাংশ বিভিন্ন উপায়ে শরীরের ক্ষয় পূরণ করে। দেহের এ সর্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক ল্যাবরেটরির কার্য কি? কিভাবে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হয় এবং সুষ্ঠু পদ্ধতিতে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিচালনা করে তার সামান্যতম কিছু জ্ঞান থাকলেই মানুষ তার খাদ্যদ্রব্যের প্রতি উদাসীন হতো না এবং অতিরিক্ত ভোজনের লোভ করত না। এবার আমরা এই রাসায়নিক পরীক্ষাগারের একটু বিবরণ দিচ্ছি।

পাকস্থলী দেখতে ভিস্তির মশকের মতো। এর দৈর্ঘ্য ১২ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৫ ইঞ্চি। মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত। এর বাইরের অংশ **Peritonium** পর্দায় এবং ভেতরের অংশ **'শ্লেষ্মাঝিল্লি'** দ্বারা আবৃত। এই ঝিল্লিগাত্রে পাচকরস সৃষ্টিকারী অসংখ্য গ্রন্থি আছে। এদের **Peptic glands** বলা হয়।

খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় এর কার্যকারিতা। ঘন ঘন সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যদ্রব্য ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। এরপর পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ গ্রন্থিগুলি হতে পাচকরস নির্গত হয়, যা মথিত খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এই পাচকরসে তিনটি উপাদান থাকে। একটিকে Pepsin. একটিকে Hydrochloric acid ও অন্যটিকে Renin বলে। Pepsin–একটি জারক রস যা আমিষ জাতীয় খাদ্যকে Peptone ও Proteoses-এ পরিণত করে। Hydrochloric acid–হজম ক্রিয়ায় সাহায্য করে ও খাদ্যদ্রব্যে রোগজীবাণু থাকলে ধ্বংস করে। Renin–দুগ্ধকে জমাট করে দধিতে পরিণত করে। এরপর খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্রান্ত হতে এক প্রকার পাচক রস নির্গত হয় এবং খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এই রসকে ক্লোমরস বা Pancreatic Juice বলে। এই রসও তিন প্রকার–(১) Trypsin. (২) Amylase, (৩) Lypase।

ট্রিপসিন–আমিষ জাতীয় খাদ্যকে সম্পূর্ণরূপে Amino acid এ পরিনত করে। Amino acid -ই শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে।

www.pathagar.com

এমিলেজ–শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে গ্লুকোজ নামক শর্করায় পরিনত করে। এই গ্লুকোজই দেহে শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে।

লাইপেজ–চর্বি জাতীয় খাদ্যকে Fatty acid ও Glycerine-এ পরিণত করে। এছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে যকৃত হতে পিত্তরস ডিউডিনামে পৌঁছায় এবং খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। পিত্তরস চর্বি জাতীয় খাদ্যকে সূক্ষ্মতম পর্যায়ে নিয়ে আসে। এরপর Lypase একে Fatty acis ও Glycerine–এ convert করে।

ক্ষুদ্রান্ত্র হতে আর এক প্রকার রস নির্গত হয়ে পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে। এ রসকে আন্ত্রিক রস বলে যা পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের অসমাপ্ত হজম-ক্রিয়া সম্পন্ন করে ও আমিষ জাতীয় খাদ্যকে সম্পূর্ণরূপে হজম করার জন্য ট্রিপসিনকে শক্তিশালী করে।

ওপরের এ সামান্যতম বিশ্লেষণের মাঝে আমরা পাকস্থলীর ক্রিয়া কিছুটা বুঝতে সক্ষম হলাম। অতিরিক্ত খাদ্য পাকস্থলীর সঙ্কোচন ও প্রসারণে বাধা দেয়। ফলে কোন পাচকরস নির্গত হতে পারে না। খাদ্যও হজম হয় না। আমিষ জাতীয় খাদ্য ও শর্করা জাতীয় খাদ্যকে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও গ্লুকোজে পরিণত করতে পারে না। চর্বি জাতীয় খাদ্যও গ্লিসারিনে রূপান্তরিত হয় না। উপর্যুক্ত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হতে না পারলে পাকস্থলী রোগজীবাণুর ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এছাড়া অতিরিক্ত চাপ পড়ে। ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের স্নায়ুমণ্ডলীতেও আঘাত পড়ে। ফলে রক্তক্ষরণ হবার সম্ভবনা থাকে। স্নেহ জাতীয় পদার্থ ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য বেশি পরিমাণে আহার করলে ডিসপেপ্‌সিয়া ও বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়। অর্থাৎ দুর্ভাগ্য চতুর্দিক থেকে এসে মাথায় করাঘাত করতে থাকে।

পাকস্থলীর ক্রিয়া সহজ করার জন্য, শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য, দেহে তাপ ও শক্তি আনয়নের জন্য হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যে পন্থা আমাদের শিখিয়েছেন তা নিম্নরূপ–

"উদরের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা, এক-তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ জেকেরের জন্য খালি রাখিবে।"[১]

যারা হজরত (দঃ)-এর মূল্যবান বাণীটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে পালন করবে তারা কোনদিনই পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হবে না।

অতিরিক্ত ভোজন দুর্ভাগ্যসূচক–এ বাণীটির ওপর ব্যাপক আলোচনা চলে। লোভ-লালসার মধ্যে ভোজন অন্যতম। এ লোভে যারা আক্রান্ত হয় তাদের পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করার ক্ষমতা থাকে না। খাবার লোভ নারীর লোভের মতোই ভয়ানক। এ লোভের ফলেই চাকরিজীবীরা ঘুষ খায়। ব্যবসায়ী, কালোবাজারী ও মুনাফাখোররা অসৎ পন্থা অবলম্বন করে। ধনী ব্যক্তিরা সুদ খায়। খাবার লোভে না পড়লে ধনের লোভে মানুষ সাধারণত আকৃষ্ট হয় না। ধনের লোভে আকৃষ্ট না হলে কেউ চরিত্র হারায় না, কলুষিত হয় না, নির্মম হয় না, পাষাণ হয় না। এক কথায় বলা যায়, দুর্ভাগ্যকে টেনে আনে না। এ ভোজনের লোভই ধনী দরিদ্র হয়, জমিদার ফকির হয়, বাদশা কাঙাল হয়, ভাল মানুষ চোর ও ডাকাত হয়। এ জন্যই সাধু-সন্ন্যাসী, ওলি-গাউস, কুতুব-ফকির ও নবী-পয়গম্বরগণ ভোজনের লোভ পরিহার করে উপবাস করে সংযমী হন ও রিপুকে দমন করেন। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, হিংসা-রাগ-অভিমান হতে নিজেকে দূরে রাখেন।

টীকা ঃ ১. হাদিস। সংগৃহীত- সৌভাগ্যের পরশমণি, পৃষ্ঠা ১১৪।

www.pathagar.com

অতিরিক্ত ভোজনই অপব্যয়। অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। অপব্যয়কারীর পরিণাম দরিদ্রতা। কোরআনে অতিরিক্ত ভোজনকারীদের সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে,

"হে আদম বংশধরগণ! প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সুসজ্জিত হও এবং ভোজন ও পান কর এবং অপব্যয় করিও না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীকে ভালবাসেন না।"[১] (৭ ঃ ৩১)

খাদ্যের নির্ধারিত কোন নিয়ম নেই। তবে এ কথাই শরীরবিজ্ঞানী ও মহাপুরুষগণ বলে থাকেন যে, যে পরিমাণ খাদ্য দেহের পক্ষে প্রয়োজন, সে পরিমাণ খাদ্যই গ্রহণ করা উচিত, এর অধিক নয়। হজরতের মতে, কয়েক গ্রাস ভোজনই যথেষ্ট। এতে দেখা যায় যে এক পোয়া আটা অথবা চাল দশ গ্রাস বা এর কিছু কম হয়। স্থান-কাল-পাত্র ও পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে মানুষের আহার। কেউ এক ছটাক, কেউ দু ছটাক, কেউ চার ছটাক, কেউ বা এক সের পর্যন্ত চাল বা আটা খেতে অভ্যস্ত।

পূর্ণ বয়স্ক একজন পরিশ্রমী লোকের জন্য দৈনিক সুষম খাদ্যের যে তালিকা শরীরবিজ্ঞানীরা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

দৈনিক খাদ্যের বিবরণ	পরিমাণ						
চাল এক পোয়া (৪ ছটাক)	আমিষ	স্নেহ	শ্বেতসার	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	ক্যালরি
আটা ৩ ছটাক ডাল ২ ছটাক তেল ১$\frac{১}{২}$ ছটাক দুধ ৬ ছটাক শাকসবজি-ফলমূল ৩ ছটাক	১১১.৯	১০৭.৮	৪১৩.০	০৯৮৬	১৪৬১	২৬.২	৩০০০

খাদ্যের নির্ধারিত নিয়ম বেধে দিয়ে হজরত কারো ওপর কোন গুরুভার চাপিয়ে দেন নি বা কাউকে সীমাহীন কষ্টের মধ্যে ফেলে দেন নি। তাঁর উপদেশ এখানেই সীমাবদ্ধ যে, যে অবস্থায়ই কেউ আহার করুক না কেন, সে যেন তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ ভর্তি করে। এর বেশি নয়।

মানুষ শুধু তার খাদ্যের জন্য যে টাকা-পয়সা ব্যয় করে অন্য কোন কিছুতেই তা করে না। কেউ নিজের আভিজাত্য দেখাতে, কেউবা ভোজনবিলাসী হিসেবে সার্টিফিকেট নিতে, কেউবা অন্যকে খুশি করতে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে, যার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় দশগুণ বেশি খরচ হয়। এই অতিরিক্ত খরচ দিয়ে সে অন্য দশজন অভুক্ত, দরিদ্র মানুষের পেটের জ্বালা মেটাতে পারে অথবা অন্য যে কোন সৎ কাজে ব্যয় করতে পারে যা দিয়ে সৃষ্টজীব তথা সমাজ উপকৃত হয়। এ প্রসঙ্গে রসুল (দঃ)-এর একটি বাণী পেশ করছি–

একদা হজরত (দঃ) এক ভুড়িওয়ালা ব্যক্তিকে দেখে বললেন,

'যা তুমি উদরে ভর্তি করেছ তা অন্যত্র ব্যয় করলে উত্তম হতো।'[১]

টীকা ঃ ১. কোরআন ঃ সূরা আরাফ, আয়াত ৩১।

টীকা ১. হাদিস। সংগৃহীত- ইমাম গাজ্জালী সাহেবের কিমিয়ায়ে সা'আদত। ক্ষুধার উপকারিতা পরিচ্ছেদ।

www.pathagar.com

অতিরিক্ত ভোজনের আর একটি কুফল আছে যা দেহের জন্য ও সমাজের জন্য মারাত্মক। তা হলো কামরিপু। অতিরিক্ত ভোজনে মানুষের কামরিপু বৃদ্ধি পায়। তাই উন্মাদ হয়ে ওঠে নারীর সংস্পর্শ পেতে ও যৌনমিলনে তৃপ্ত হতে। বিবাহিত পুরুষদের জন্য এতে বিশেষ ক্ষতি না হলেও অবিবাহিত ছেলেদের জন্য ক্ষতিকারক। কেননা কাম উদ্দীপনার ফলে তারা হস্তমৈথুন করতে বাধ্য হয় অথবা স্বপ্নদোষে আক্রান্ত হয়। অনেকে আবার সহ্য করতে না পেরে অবলা নারীর সর্বনাশ ঘটায়। এতে শরীরের দিক থেকে যেমন অনিষ্ট হয়, মানসিক, সামাজিক ও সম্মানের দিক থেকেও তেমনি অনিষ্ট হয়। অতিরিক্ত ভোজনের কুফল পদে পদে। অথচ অল্প ভোজনের সুফল প্রতিটি ক্ষেত্রে। এ জন্যই মহাত্মাগণ বলে থাকেন, "অল্প ভোজন ব্যতীত এমন কোন বিষয় নাই যাহাতে নিরন্তর উপকার রহিয়াছে এবং কোন অপকারের লেশমাত্র নাই।"[২]

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের জন্য এমন গুরুত্বপূর্ণ আর কোন থিওরী আছে বলে আমার জানা নেই।

হজরত (দঃ) নিজের জীবনের জন্য যা করেন নি অন্যের জন্য সে নির্দেশ দেন নি। যে প্রমাণ তিনি নিজ হাতে করে এর ফলাফল যাচাই করেছেন, সেটাই মানব সমাজের জন্য দিয়ে গেছেন আমাদের প্রমাণ করার জন্য অবশিষ্ট কিছুই রাখেন নি।

অল্প ভোজনের গুণাগুণ তিনি নিজেই দেখেছেন। কতদিন না খেয়ে কাটিয়েছেন, কতদিন পেটে পাথর বেঁধে হাসিমুখে আল্লাহর শুকুর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর নিম্নোক্ত বাণী তা প্রমাণ করে। [এ বাণীটি হজরত (দঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন]

"খবরদার! কখনও অপব্যয় করিও না। দিনে দুইবার ভোজন করা অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য।"[৩]

হজরত (দঃ) যে প্রায়ই অনাহারে থাকতেন তার সাক্ষ্য মেলে হজরত আয়েশা (রাঃ)-এর উক্তি হতে। তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ (দঃ)-এর পরিজন মদিনা আসা অবধি তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত কখনও গমের রুটি পেট ভরিয়া খান নাই একাদিক্রমে তিনদিন।"[১]

অল্পভোজীর স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়। পেটের পীড়া হতে মুক্ত থাকে। কামরিপু ও ভোগবিলাসের মোহ হতে পরিত্রাণ পায়। সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়াশীল হয়। আল্লাহর প্রেমে আকৃষ্ট হয়। এজন্যেই হজরত (দঃ) বলেছেন—

"উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করিও না, কেননা তোমার অন্তরে আল্লাহর আলো নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে।"[২]

এবারে আমরা খাদ্য ও পানীয়ের উপযুক্ততা যাচাই করব এবং হজরত (দঃ)-এর বাণীগুলি বিশ্লেষণ করব।

হালাল ও হারাম—হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যে খাদ্যকে আমাদের জন্য উপকারী ও বিধিসম্মত বলে ঘোষণা করেছেন তাকেই হালাল বলা হয়। আর যেগুলি বিধিসম্মত নয় অর্থাৎ শরীরের জন্য ক্ষতিকর সেগুলি তিনি গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এই নিষিদ্ধ খাদ্যবস্তুকেই ইসলামী মতে 'হারাম' বলা হয়। এর ব্যাপক তালিকা আছে যা তুলে ধরা এখানে সম্ভব নয়। আমরা শুধু এখানে আলোচনা করব যে হালাল বস্তুগুলি কতটুকু উপকারী

২—৩. সৌভাগ্যের পরমশমণি, পৃঃ ১২০।

টীকা ঃ ১. সৌভাগ্যের পরশমণি, পৃ ঃ ১০৪।

২. সহীহ বুখারী।

www.pathagar.com

আর হারাম বস্তুগুলি কতটুকু অপকারী। এ বিষয়ে কোরআনের একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সেখানে বলা হয়েছে—

"তোমাদের জন্য অবৈধ করা হইয়াছে মৃত জীব, শোণিত ও শূকরের মাংস এবং যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য নামে আহুত হয় এবং যাহা, কণ্ঠরোধ, লগুড়াঘাত ভূপতন ও শৃঙ্গাঘাতে নিহত হয় এবং হিংস্র জীবের ভক্ষিত যে সকল পশু জবেহ্ ব্যতীত মারা যায় এবং যাহা সংস্থাপিত প্রস্তরে নিহত ও যাহা ভাগ্য নির্দেশক শরসমূহে বিভক্ত হয়। ইহা তোমাদের জন্য দুষ্কার্য।"[৩] (৫ ঃ ৩১)

"তিনি কেবল তোমাদের জন্য মৃতজীব, শোণিত ও শূকর মাংস এবং যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের উদ্দেশে নিবেদিত—তদ্ব্যতীত অবৈধ করেন নাই। বস্তুত যে ব্যক্তি নিরুপায়, উচ্ছৃঙ্খল বা সীমা লঙ্ঘনকারী নহে তাহার জন্য পাপ নাই। এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়।"[১] (২ ঃ ১৭৩)

পবিত্র বাইবেলেও আমরা এরূপ বাণী দেখতে পাই। যেমন–

"তুমি কোন ঘৃণার্হ দ্রব্য ভোজন করিবে না। এই সকল পশু ভোজন করিতে পার–গরু, মেষ এবং ছাগল, হরিণ, কৃষ্ণসার এবং বনগরু বনছাগল, বাতপ্রমী পৃষত এবং সম্বর। আর পশুগণের মধ্যে যত পশু সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড খুর বিশিষ্ট ও জাওর কাটে, সেই সকল তোমরা ভোজন করিতে পার। কিন্তু যাহারা জাওর কাটে, কিংবা দ্বি-খণ্ড বিশিষ্ট, তাহাদের মধ্যে এইগুলি ভোজন করিবে না–উষ্ট্র, শশক ও শাফন; কেননা তাহারা জাওর কাটে বটে কিন্তু দ্বি-খণ্ড খুর বিশিষ্ট নহে তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি; আর শুকর দ্বি-খণ্ড খুর বিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাওর কাটে না, **সে তোমাদের পক্ষে অশুচি; তাহাদের মাংস ভোজন করিবে না, তাহাদের শব স্পর্শও করিবে না।"**

"রক্ত ভোজন হইতে অতি সাবধান থাকিও, কেননা রক্তই প্রাণ; তুমি মাংসের সহিত প্রাণ ভোজন করিবে না।" (বাইবেল; দ্বিতীয় বিবরণ ১৪/৩-৮)

"তুমি তাহা ভোজন করিবে না, জলের ন্যায় ভূমিতে ঢালিয়া ফেলিবে। তুমি তাহা ভোজন করিবে না; যেন সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহা করিলে তোমার ও তোমার ভাবি সন্তানের মঙ্গল হয়।"২৪ (বাইবেল; তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ১২/২৩-২৪)

রসুল (দঃ)-এর বাণীতেও একইরূপ কথার উল্লেখ আছে। মাংস ছাড়া পশু ও পক্ষী যা রোগে অথবা ভূপতন, হিংস্র জীবের দংশনে মৃত্যুপ্রাপ্ত তা মুসলমানদের জন্য হারাম। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে এসব মৃত জীবের দেহে রোগজীবাণু থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কুকুর, শৃগাল, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি বিষাক্ত প্রাণী দংশনে অথবা উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে তাদের লালা থেকে নির্গত যে বিষ সে সব মৃত জীবের দেহে থাকবে এতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। এসব হিংস্র প্রাণী মানুষকে দংশন করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এদের স্পর্শেই খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত হয়ে যায়, ভক্ষণ করলে মানুষ তৎক্ষণাৎ মারা যায়–এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। শহরের হাসপাতালগুলিতে এর তথ্য নিলে দেখা যায়, বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে বছরে কত শয়ে শয়ে লোক মারা যায়। তাই মৃত জীব ভক্ষণ করা হারাম।

দ্বিতীয়ত, শোণিত বা রক্ত। প্রবাহিত বা জমাট যে কোন রক্তই মানুষের খাদ্য হতে পারে না। শরীরবিজ্ঞানে যাদের কোন জ্ঞান নেই তারা হয়তো এ রক্তকে খাদ্য হিসাবে

---

৩. কোরআন ঃ সূরা মায়েদা, আয়াত ৩১।

টীকা ঃ ১. কোরআন ঃ সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৭৩।

www.pathagar.com

ব্যবহার করে। হজরত (দঃ)-এর সময় আরববাসীদের অনেকেই নিহত পশুর জমাট রক্ত ভেজে খেত।

রক্ত রোগজীবাণু বাহক। রক্তের অভ্যন্তরে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে না পারলে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। রোগজীবাণু রক্তে প্রবেশ করে রক্তকে জমাট করে দেয়, ফলে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তীরবিদ্ধ, শরবিদ্ধ, বন্দুকের গুলি বা অস্ত্রাঘাতে নিহত পশু-পক্ষীর রক্তে বিষ মিশ্রিত হয়। এ রক্ত খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে শরীরে বিষের ক্রিয়া হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যেসব পশু-পক্ষী পরিষ্কার অস্ত্র দ্বারা জবেহ করা হয় তাদের রক্তও খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা শরীরবিজ্ঞানীদের মতে ও ধর্মীয় শাস্ত্র মতে নিষিদ্ধ।

তৃতীয়ত, শূকর মাংস–রসুল (দঃ)-এর মতে শূকরের মাংস ভক্ষণ করা হারাম। কেন এ শূকরের মাংস অবৈধ করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে-এর একটু আলোচনা করা দরকার।

খাদ্যের ওপরই নির্ভর করে শরীর ও মন। যে খাদ্যের যে উপাদান ও বৈশিষ্ট্য আছে সেই উপাদানই শরীরে সরবরাহ হয় ও সেই চরিত্রেই গড়ে ওঠে দেহ ও মন। মাংসাশী প্রাণী মাত্রই শক্তিশালী ও সাহসী হয়। দেহে শক্তি ও সাহস থাকলে কর্মক্ষমতা বাড়ে, অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি পশু এজন্যই এত শক্তিশালী ও সাহসী, যদিও আকৃতিতে অনেক পশুর চাইতে ছোট। যেসব প্রাণী উদ্ভিজ্জ, তরুলতা অথবা ফলমূল প্রভৃতি খেয়ে জীবনধারণ করে তারা সিংহ ও ব্যাঘ্রের মতো এত শক্তিশালী ও সাহসী হয় না। যেমন গরু, ছাগল, ভোড়া, উট, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি। প্রকৃতিগত ভাবেই তারা তুলনামূলকভাবে শান্ত।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও হিংসা এসব নিকৃষ্ট স্বভাবের অধিকারী একমাত্র পশু শূকর। এত বেশি কামপ্রবৃত্তি অন্য কোন পশুর মধ্যে দেখা যায় না। যারা শূকরের মাংস খেতে অভ্যস্ত তারা কামুক হতে বাধ্য। শূকরের মতোই কামপ্রবৃত্তিতে তাদের মন ভরে ওঠে। কামপ্রবৃত্তি বেশি থাকলে তাদের ন্যায়-অন্যায়, মান-অপমান বিচার করার ক্ষমতা লোপ পায়। দেহ ও মন কলুষিত না হয়ে পারে না। তাই সমাজের মাঝে হানা দিয়ে সমাজকে কলুষিত করে তোলে।

শূকরের মতো ক্রোধ একমাত্র কুকুর ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর নেই। উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে ও খেতে ক্রোধের স্বভাব দেখা যায়। আপন বাচ্চা ও প্রিয়জনের মধ্যেও এ ক্রোধের বশে হয় ঝগড়া ও বিবাদ। তাই এদের মধ্যে গরমিল এত বেশি। সহানুভূতি, সামাজিকতা গড়ে তুলতে এরা জানে না। নিজের উদর ভর্তি ছাড়া অন্যের উদর ভর্তি দেখরেই এদের রাগ জন্মে। শূকরের স্বভাব যারা নিরীক্ষণ করেছে তারাই জানে কি অদ্ভুত এ সৃষ্টি! আপন বাচ্চাকে ধরে এরা কামড়ায়।

এরা অত্যন্ত লোভী। যা সম্মুখে দেখে তাই খায়। যত পচা, দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস ও জীবজন্তুর মল তা এদের খাদ্য। কাদা, অন্ধকার ঝোপ-জঙ্গল, স্যাঁৎসেঁতে ও কুৎসিত পরিবেশ এরা পছন্দ করে। এমন নোংরা, কুৎসিত ও কুস্বভাবের পশু যারা ভক্ষণ করে তাদের শরীর ও মন এরূপ নোংরা ও কুৎসিত হতে বাধ্য।

রাগে যাদের শরীর জ্বলে, হিংসায়ও তাদের মন পোড়ে। কু-স্বভাবের মোহে যারা আকৃষ্ট, সুস্বভাব তাদের কাছে কি করে আশা করা যায়? হিংসার মন নিয়ে শূকরের জন্ম, মায়ার মন নিয়ে সে কি করে সমাজে জীবন যাপন করবে? প্রকৃতির নিয়ম তো তারা বরখেলাপ করতে পারে না। তাই তারা হিংসুক, ক্রোধী, কামুক ও লোভী।

বেশিদিন তিক্ত ওষুধ সেবন করলে মন তিক্ত হয়ে ওঠে। ঠাণ্ডা জল পান করলে মনমেজাজ ও স্নায়ুমণ্ডলী ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মধু সেবন করলে শরীর, মন ও মস্তিষ্ক সবল ও

www.pathagar.com

শক্তিশালী হয়। দুগ্ধ পান করলে রক্ত বৃদ্ধি হয়, ঘিতে বল বৃদ্ধি হয়। আদার রসে পেটের উপকার হয়, তুলসীর রসে কফ গলায়। এসব ত দ্রব্যেরই গুণ-প্রকৃতিরই খেলা। খাসির মাংস ভক্ষন করলে শরীর গরম হয় না অথচ গরুর মাংস ভক্ষণ করলেই কয়েক ডিগ্রী উত্তাপ বেড়ে যায়। মন-মেজাজ অশান্ত হয়ে ওঠে। দ্রব্যের এসব গুণ বৈশিষ্ট্যকে কে অস্বীকার করবে?

যে স্বভাবে শূকরের জন্ম-শূকরের মাংস সে স্বভাব দান করতে সক্ষম। তাই শূকরের মাংস অবৈধ, মানবের জন্য নিষিদ্ধ। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে হিংস্র প্রাণী মাত্রই অর্থাৎ যাদের দন্তে, নখে ও লালায় বিষ থাকে সে পশু বা পক্ষীর মাংস হারাম; যেমন-ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী, গণ্ডার, কুকুর, শৃগাল, বানর, কাক, চিল, শকুন ইত্যাদি। এসব প্রাণীর মাংস হারাম করার অর্থই মানুষকে হিংস্র স্বভাব থেকে মুক্ত করা ও রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করা। হজরত (দঃ)-এর এসব তত্ত্বমূলক বাণী এজন্যই খাঁটি, সত্য ও বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমাণিত। এখানে তাঁর আর একটি বাণীর উল্লেখ করছি। আবু সালাব বর্ণনা করেছেন-

"রসুলুল্লাহ (দঃ) শ্বদন্ত বিশিষ্ট পশু খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।"[১]

এবারে আমরা খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করার সঙ্গে হজরত (দঃ)-এর আরও দু একটি বাণী প্রমাণ করে দেখাবো এগুলি কেমন যুক্তি-যুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত। তিনি বলেছেন,

"আমার উম্মতদের মধ্যে যাহারা মিহি আটা আহার করে তাহারা নিকৃষ্ট।"[২]

ওপরের উদ্ধৃতি হতে বোঝা যায় যে মিহি আটা অর্থাৎ ময়দা রসুলুল্লাহ পছন্দ করেন নি। তাঁর সময়ে তাঁর ভক্ত উম্মতগণ আটা ছাড়া ময়দা যে ভক্ষণ করতেন না এ প্রমাণ মেলে অন্য একটি বর্ণনা থেকে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

"সহল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহাকে জিজ্ঞসা করা হইল, তুমি রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সময়ে ময়দা দেখিয়াছ কি? তিনি বললেন, 'না'। জিজ্ঞাসা করা হইল 'তোমরা যবের আটা চালিতে কি?' তিনি বলিলেন 'না'। কিন্তু আমরা ফুঁক দিতাম।" (সহীহ বুখারী)

ময়দা ও আটার মধ্যে ভিটামিনের তারতম্য নিম্নরূপ ঃ

বিবরণ	আমিষ (Protein)	স্নেহ(Fat)
ময়দা	১১.০%	০.৯%
আটা	১২.০%	১.৭%

চাল ও গমের আবরণে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'বি' থাকে। এই ভিটামিন 'বি' স্নায়ুমণ্ডলীকে সবল ও সতেজ করে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে ও কর্মক্ষমতা দান করে। এর অভাবে বেরিবেরি রোগ জন্মে। শরীর আস্তে আস্তে ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে অকালে মৃত্যু ঘটে।

মিহি আটা বা ময়দা প্রায় ভিটামিন শূন্য। কেননা গমের বাইরের আবরণটুকু কলে ছাঁটার ফলে পৃথক হয়ে যায়। এছাড়া ছাকনি দ্বারা ভিটামিন যুক্ত ভুষিগুলি সরিয়ে মিহি আটা বা ময়দা করা হয়। যে খাদ্য শরীরের পক্ষে কোন কাজে আসে না, উপরন্তু যার প্রভাবে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে সে খাদ্য বর্জন করাই শ্রেয়। এ জন্যই হজরত মুহাম্মদ (দঃ) মিহি আটা পছন্দ করেন নি।

টীকা ঃ ১. হাদিস। সহীহ বুখারী।

২. হাদিস। সংগৃহীত - সৌভাগ্যের পরশমণি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২১।

www.pathagar.com

ভিটামিনের জ্ঞান কি করে তাঁর জন্মাল, কোন্ লেবরেটরিতে বসে বসে এ বিশ্লেষণ তিনি করেছেন সেটা আমরা জানি না। অথচ চরম বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে আজ আমরা তাঁর বাণী প্রমাণ করে তাঁর কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। দেখি এ ধরনের বাণী আরও মেলে কি না।

আনাস বলেন, "এক দরজি হজরত (দঃ)-কে দাওয়াত করিয়াছিল এবং তাঁহার জন্য কিছু খাবার তৈয়ার করিয়াছিল। আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। আটার রুটি, লাউয়ের ঝোল এবং খাসির কাবাব উপস্থিত করা হইল। হজরত (দঃ) পাত্র হইতে **শুধু এক টুকরো লাউ তুলিয়া লইলেন**। সেইদিন হইতে আমি লাউ খুব পছন্দ করিতাম।" (সায়খান)

যে তিনটি খাদ্য হজরত (দঃ)-এর জন্য উপস্থিত করা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে আটার রুটি ও খাসির মাংস যে হজরত (দঃ) এর প্রিয় খাদ্য ছিল সেটা আমরা তাঁর জীবন চরিত হতে দেখেছি। এ দুটি আমিষ জাতীয় খাদ্যে প্রচুর ভিটামিন আছে। আটাতে আমিষের পরিমাণ ১২.০% এবং স্নেহ জাতীয়ের পরিমাণ ১.৭%। খাসির মাংসে আমিষ ১৮.০% ও স্নেহ ১৩.০%। এ খাদ্যগুলি হজরত (দঃ) পছন্দ করতেন বলেই হয়তো দরজি তৈরি করেছিল। কিন্তু সেদিন কেন গ্রহণ করেন নি তার কারণ জানা যায় নি। এগুলির মধ্য হতে শুধু লাউয়ের এক টুকরোই তিনি খেয়েছিলেন। লাউকে প্রায় মানুষই নিকৃষ্ট স্তরের খাদ্য বলে মনে করে। দামে সস্তা, পরিমাণেও বেশি, তাই গরিবের ঘরেই এ খাদ্য বেশি দেখা যায়। আধুনিক রুচিসম্মত মানুষের সম্মুখে এ খাদ্য উপস্থিত করলে কেউবা ভ্রূ-কুঞ্চিত করবে, কেউবা কুখাদ্য বলে আখ্যায়িত করবে। হজরত (দঃ) পরবর্তী বংশধরদের জন্য চিরকালের মতো এ ভুল ভেঙে দিতে নিজে লাউয়ের টুকরো মুখে পুরলেন ও শরীরবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণের জন্য রেখে দিলেন।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'লাউ'-য়ের মধ্যে আমরা কি দেখতে পাই? এটা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য (Carbohydrates)। এতে প্রচুর ভিটামিন আছে। জীবকোষে এ জাতীয় খাদ্য দগ্ধিভূত হয়ে তাপ ও কর্মশক্তি আনয়ন করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ চর্বিতে পরিণত হয়ে শরীরে জমা হয় ও মেদ বৃদ্ধি করে। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য আমিষ জাতীয় খাদ্যকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে ও হজম ক্রিয়ায় সহায়তা করে। এছাড়া অতিরিক্ত তাপ ও শক্তি যা ক্ষতিকর তার হাত থেকে বাঁচায়।

ডাক্তার ও কবিরাজদের মতে, লাউ পেটের পীড়ার মহৌষধ। কোষ্ঠ পরিষ্কারক, ডাইরিয়া ও কলেরার প্রতিষেধক। যখন ব্যাপক আকারে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয় তখন কবিরাজরা এই লাউ খেতে পরামর্শ দেন। 'কমাব্যাসিলাস' লাউয়ের গুণে নষ্ট হয়ে যায়। এজন্যই কলেরা আক্রান্ত রোগীকে লাউয়ের বিচি বেঁটে খাওয়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। আমি নিজে কবিরাজ বা ডাক্তার নই,সামান্য একজন ইঞ্জিনিয়ার। তাই এর ব্যাপক গুণাগুণ তুলে ধরতে পারলাম না।

এ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য আলু, ডাল, কলা, পেঁপে, তরমুজ, খোরমা, আঙুর ইত্যাদি যে হজরত (দঃ) বেশি পছন্দ করতেন তার একটা নিদর্শন পাওয়া যায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হতে।

আবদুল্লা জুবিন জাফর বিন আবু তালেব (রাঃ) বলেন, "আমি রসুলুল্লা (দঃ)-কে পাকা খেজুর শশার সহিত খাইতে দেখিয়াছি।"[১]

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, "একদিন রসুরুল্লাহ (দঃ) সাহাবীদের মধ্যে খেজুর বন্টন করিলেন। তিনি প্রত্যেককে সাতটি করিয়া দিলেন। আমাকেও সাতটি দিলেন। উহার মধ্যে

টীকা ঃ ১. হাদিস। সহীত বুখারী। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁন।

www.pathagar.com

একটি ছিল খারাপ। কিন্তু আমার কাছে উহার চেয়ে বেশি ভাল লাগিল না কোনটি, কেননা উহা বেশিক্ষণ চিবাইলাম আমি।"[২]

ফলমূল রসুলুল্লাহ (দঃ) পছন্দ করতেন। এসব ফলমূলের মধ্যে খেজুর ছিল তাঁর প্রিয় খাদ্য। কেন খেজুর তাঁর নিকট এত প্রিয় ছিল এটা আমাদের জানা দরকার। তিনি যে খাদ্য পছন্দ করতেন সেটার মধ্যেই দেখা যায় বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। শুধু মুখরোচক হিসাবেই কোন খাদ্যকে আমাদের মতো গ্রহণ করতেন না। যে খাদ্যে প্রচুর ভিটামিন আছে, যা আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও সহিষ্ণুতার জন্য প্রয়োজন, যা রোগজীবাণুর প্রতিষেধক, সেটাকেই তিনি পছন্দ করতেন এবং আমাদের জন্যও বিধিবদ্ধ করেছেন। গো-মাংসকে হিন্দুরা ঘৃণা করে অথচ মুসলমানদের জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) এটাকে হালাল করেছেন। কেন? তার কারণ খুঁজে আমরা দেখতে পাই যে, গো-মাংসে প্রচুর পরিমাণে **'নিকোটিনিক'** এ্যাসিড থাকে। এ এ্যাসিডের অভাবে 'পেলেগ্রা' নামক রোগ হয়, জিহ্বার ওপর কালো দাগ পড়ে ও চর্মরোগ হয়। এছাড়া রৌদ্রে পোড়া মুখমণ্ডল, গলা, কান, হাতের কালো দাগ এসব একমাত্র 'নিকোটিনিক' এ্যাসিডই দূর করতে পারে, যা গো-মাংসে থাকে। তাই গো-মাংস স্বাস্থ্যসম্মত। শরীরবিজ্ঞানীরাও তা-ই প্রমাণ করেছেন। তাঁদের মতে, এতে আমিষ জাতীয় খাদ্য উপাদান ২২.৬% এবং স্নেহ জাতীয় (Fat) ২.৬%। তাহলে দেখা যায়–মুসুর ডাল (২৫.১%) এবং সীম বীজের (২০.৯%) পরেই গরুর মাংসের স্থান। একে অবজ্ঞা করে এত বেশি পরিমাণ ভিটামিন না নেবার কারণ থাকতে পারে না। তবে রোগ বিশেষে এটা যে অপকার করে না তা নয়। যে রোগীর জন্য এটা ফলপ্রসূ নয় তার জন্য এ মাংস তিনি বাধ্যতামূলক করেন নি। যা হোক, খেজুরের গুণাগুণ নিয়ে এবারে একটু আলোচনা করছি।

খেজুর একটি শক্তিশালী খাদ্য উপাদান। এটা শ্বেতসার জাতীয় (Carbohydrates) খাদ্য। শর্করা (Sugar) শ্রেণীভুক্ত। খেজুর দেহের পুষ্টিসাধন করে, কর্মশক্তি আনয়ন করে, শরীরে তাপ সৃষ্টি করে, যৌনক্ষমতা এনে দেয়, রক্ত বৃদ্ধি করে। উপরন্তু রোগ প্রতিষেধক। বিষের ক্রিয়া হতে অব্যাহতি পাবার মহৌষধ। রসুল (দঃ)–এর নিম্নোক্ত বাণী এসব কথাগুলির সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেন–

"যে ব্যক্তি প্রতিদিন ভোরে সাতটি আজওয়া খেজুর খায় তার কোন ক্ষতি করতে পারে না ঐদিন কোন বিষ বা জাদু।"[১]

হজরত (দঃ) যে খেজুর অত্যন্ত পছন্দ করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হতে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, "সময় সময় আমাদের পরিজনদের উপর একটি মাস অতিবাহিত হইত কিন্তু তন্মধ্যে আমরা উনানে আগুন জ্বালাইতাম না। শুধু খেজুর, পানি ও কিঞ্চিৎ মাংস ব্যতীত আর কিছুই আহার্য ছিল না।"

"মহানবীর পরিজনদের জন্য দুই দিনের পরিমাণ আটাও ঘরে থাকিত না এবং কোনদিন শুধু খেজুর থাকিত।"[২]

ওপরে বর্ণিত হাদিস হতে বোঝা যায় যে খেজুর ভিটামিনপূর্ণ মহৌষধ। একমাত্র খেজুর ও পানি পান করেও মানুষ বাঁচতে পারে ও তার স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারে। মহামনীষীদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে সারাদিন রোজা রেখে সন্ধ্যায় শুধু দু-চারটি খেজুর খেয়েই তাঁরা মাসের পর মাস কাটাতেন অথচ বেঁচে থাকতেন। স্মরণশক্তিও হতো প্রখর,

---

২. হাদিস। সহীহ বুখারী। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁন।

টীকা ঃ ১. হাদিস। সহীহ বুখারী তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ।

২. হাদিস। শামায়েল।

www.pathagar.com

দৃষ্টিশক্তি হতো তীক্ষ্ণ। জানি না শরীরবিজ্ঞানী ও রসায়নবিদরা এ খেজুর থেকে মানবের উপকারের জন্য কত প্রকারের খাদ্য ও ওষুধ তৈরি করেছেন। না করে থাকলে এর ওপর রিসার্চ চালিয়ে যান, দেখতে পাবেন এ খেজুরকে নিয়ে যুগান্তকারী এক আলোড়ন শরীরবিজ্ঞানের জন্য সৃষ্টি করতে পারবেন।

খেজুর যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপকারী ফল কোরআনের বাণী হতে আমরা তা দেখতে পাই। এর ওপর জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের রিসার্চের বিষয়বস্তু রয়েছে।

"এবং খেজুর ও আঙুর ফলপুঞ্জ–উহা হইতে তোমরা মাদকদ্রব্য এবং উত্তম উপজীবিকা গ্রহণ করিয়া থাক, নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।"[১] (১৬ ঃ ১৭)

আমিষ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে মাছ, মাংস, ডিম, আলু, চাল, আটা, ডাল ইত্যাদি যা সচরাচর আমরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করি, এগুলি আমাদের জন্য হালাল বা বৈধ। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। আমরা শুধু হজরত (দঃ)-এর বাণী আলোচনায় মন দেবো এবং তাঁর পছন্দনীয় খাদ্যগুলি বিশ্লেষণ করে দেখব আমাদের জন্য সেগুলির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু।

আবু মুসা (রাঃ) বলেন, "আমি হজরত (দঃ)-কে মুরগি খাইতে দেখিয়াছি।"[২]

ডাক্তার, কবিরাজ ও হেকিমগণ মুরগির মাংস রোগীদের পথ্য হিসাবে দেন। এছাড়া সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য এটা যে কত রুচিকর ও উৎকৃষ্ট খাদ্যপ্রাণ সম্পন্ন বস্তু তা বলারই অপেক্ষা রাখে না। শরীর বিজ্ঞানীদের মতে, মুরগির মাংসে আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ ১৯.২% যা অন্য খাদ্যে খুব কম দেখা যায়। Fat বা Carbohydrates এতে নেই বললেই চলে। তাই রোগী ও দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসকরা এ খাদ্যের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। শরীরের রক্ত বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য এটি আমিষ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে অদ্বিতীয়। হজরত (দঃ) ডাক্তার ছিলেন না, কবিরাজ ছিলেন না, হেকিমী শাস্ত্রও পড়েন নি, অথচ সবারই বিদ্যা ও বুদ্ধি তাঁর জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সব ধরনের জ্ঞানই তাঁর আয়ত্তে। চিন্তা করতেও আমাদের মতো বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্ক বিগড়ে যায়।

আমিষ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে মাছ অন্যতম। এ কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আমাদের খাদ্যের (আমিষ জাতীয়) শতকরা ৯০ ভাগ অংশই পূর্ণ করে মাছ। বাকিটা ভাত, আটা এবং ডাল। মাছ সুস্বাদু, রুচিকর ও বলবৃদ্ধিকারী। রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছের মাথায় প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস থাকে, যা আমাদের মস্তিষ্কের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এ খাদ্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই পছন্দ করে। আমদের শরীরবিজ্ঞানী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) মাছকে হালাল করেছে। মাছ সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান থাকার কথা নয়। কেননা মরুর দেশে ছিল তাঁর জন্ম। যেখানে পানির অভাব সেখানে মাছের প্রাচুর্য থাকবে এটা কেউ কল্পনা করতে পারে না। তবু দেখতে পাই হজরত (দঃ)-এর বাণীতে মাছ খাবার নির্দেশ। এর বর্ণনা দিয়েছেন হজরত (দঃ)-এর একান্ত সহচর জাবির (রাঃ)। বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

"সমুদ্র আমাদের জন্য তীরে নিক্ষেপ করিল 'আমবার' নামে এক প্রকাণ্ড মৎস্য, এবং আমরা তাহা হইতে ভক্ষণ করিলাম অর্ধমাস ধরিয়া এবং গায়ে মালিশ করিলাম উহার তেল, আর ঠিক হইয়া গেল আমাদের শরীর।" এবং অপর এক বর্ণনায় আছে, আবু উবাইদা বলিলেন, "তোমরা খাও।" এবং যখন আমরা মদিনায় আসিয়া নবী (সঃ)-এর নিকট উহার

টীকা ঃ ১. কোরআন ঃ সূরা নহল, আয়াত ৬৭।
২. হাদিস। সহীহ বুখারী। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ।

www.pathagar.com

উল্লেখ করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, "খাও খোদা প্রদত্ত জীবিকা। এবং খাওয়াও আমাদের যদি উহার কিছু থাকে তোমাদের সঙ্গে। তখন কেহ তাঁহাকে দিল উহার এক টুকরা এবং তিনি খাইলেন উহা।"[১]

যাঁর মাছের দেশে জন্ম নয়, যিনি মাছ খেতে অভ্যস্তও নন, অথচ তিনি মাছের টুকরো নিজে খেয়ে এটাকে হালাল বলে ঘোষণা করলেন। আল্লাহ্ মাছের মধ্যে যে গুণাগুণ দিয়েছেন, মানব শরীরের জন্য যে একান্ত প্রয়োজন তা বুঝিয়ে দেবার জন্যই তিনি মাছের টুকরা মুখে পুরলেন ও দেশী-বিদেশী ভক্ত মুসলমান তথা সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। বিজ্ঞানীরা আজ মাছের মধ্যে অমূল্য উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। শুধু সুস্বাদু খাদ্যরূপেই নয়, হাজার হাজার রোগ নিরাময়কারী ওষুধ রূপেও এ মাছ আজ ব্যবহৃত হচ্ছে। শতকরা নব্বই ভাগ আমিষ জাতীয় খাদ্য যে মাছের মধ্যে বিদ্যমান সে মাছ কি হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর মতো মহাবৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এড়াতে পারে? খাদ্য নিয়ে বিশ্লেষণ করলে তাঁর বাণীর অভাব হবে না। বিশ্লেষণেরও শেষ হবেনা। তাই এর ওপর আর অগ্রসর না হয়ে পানীয়ের ওপর কিছুটা আলোচনা করছি।

পানীয়

খাদ্য হিসাবে আমরা যা পান করি তাকেই পানীয় বলা হয়। এদের মধ্যে (১) পানি, (২) দুধ, (৩) সরবত, (৪) চা, (৫) লেমনেড বা সোডার পানি, (৬) কফি, (৭) ঘোল, (৮) ছানার পানি, (৯) তাড়ি, (১০) মদ ইত্যাদি।

পানি—শারীরবিজ্ঞানে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। পানিকে জীবের প্রাণ বলা হয়। কেননা দেহের শতকরা ৯০ ভাগই পানি। এ পানি একটি মূল্যবান খাদ্য উপাদান। এটি খাদ্যবস্তুকে তরল করে, পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে ও শরীরের অভ্যন্তরে খাদ্যের সারাংশ পৌঁছিয়ে দিতে সহায়তা করে। এছাড়া রক্তপ্রবাহ ও দূষিত দ্রব্য নির্গমনের জন্য এটা অদ্বিতীয় উপাদান। প্রোটোপ্লাজম গঠনের জন্য এ পানির ক্রিয়া সর্বাধিক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, তৃষ্ণা নিবারণ ও ওষুধপত্র তৈরির ব্যাপারে এর প্রয়োজন যে কত অধিক তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

পানির ব্যবহার সম্বন্ধে হজরত (দঃ)-এর বাণী হতে আমরা অনেক মূল্যবান তত্ত্ব জানতে পারি। এ বিষয়ে ইনশাআল্লাহ্ রসায়ন বিজ্ঞান পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। এখানে শুধু পানির বিশুদ্ধতার ওপর হজরত (দঃ)-এর একটি বাণী পেশ করছি। তিনি বলেছেন,

"যে পানির রং, গন্ধ ও স্বাদ তিনটিই নষ্ট হয়েছে সে পানি দ্বারা কোন কাজ করা বা করতে দেওয়া উচিত নয়।"[১]

পানির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে শারীরবিজ্ঞানীরাও ঠিক একই মত পোষন করেন। তাঁরা বিশুদ্ধ পানির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

টীকা ঃ ১. হাদিস। সহীহ বুখারী। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ।

১. আবু দাউদ। সংগৃহীত - আলহাজ্ব কাজী মওলানা মোঃ গোলাম রহমান কর্তৃক রচিত মকসুদুল মোমেনীন। পৃষ্ঠা ১১৯।

www.pathagar.com

"স্বচ্ছ, বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং যাহাতে কোন ভাসমান জৈব অথবা অজৈব পদার্থ থাকে না এবং যাহাতে কোন রোগজীবাণু নাই এরূপ প্রাকৃতিক পানিকেই স্বাস্থ্যসম্মত বিশুদ্ধ পানি (Hygincally pure water)"[২] বলে।

পানির রং তখনই নষ্ট হয়, যখন কোন জৈব পদার্থ অথবা উদ্ভিজ্জ পানিতে পচে অথবা গলে মিশ্রিত হয়। রং নষ্ট হবার পরই পানি অস্বচ্ছ হয় এবং স্বাদহীন হয়ে বিষাক্ত ও তিক্ত হয়ে পড়ে। এ পানিতেই রোগজীবাণুর সৃষ্টি হয়। এ পানি পান করলে অজীর্ণ, উদারাময়, কলেরা, টাইফয়েড, অন্ত্র প্রদাহযুক্ত রোগে মানুষ আক্রান্ত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হজরত (দঃ)-এর বাণী বিজ্ঞান-সম্মত, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের জন্য অপরিহার্য। রসায়ন বিজ্ঞান পরিচ্ছেদে পানির ওপর ইনশাআল্লাহ্ বিস্তারিত আলোচনা করব।

দুধ–দুধ নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমরা দেখব হজরত মুহাম্মদ (দঃ) দুধকে কেমন পছন্দ করতেন, দুধ পান করতে উপদেশ দিয়েছেন কিনা, দুধের গুরুত্ব অন্যান্য পানীয়ের চাইতে বেশি দিয়েছেন কিনা, দেহের পুষ্টিসাধন ও জীবজন্তুর প্রাণ রক্ষার্থে এটা কতটুকু সহায়ক হতে পারে তার কোন প্রমান দিয়েছেন কিনা। হজরত বলেছেন ঃ

"উত্তম দান একটি দুধেল উটনী বা একটি দুধেল বকরী যাহা প্রাতে দেয় একপাত্র দুধ আর সন্ধ্যায় অপর একপাত্র।"[৩]

"যখন কেহ দুধ পান করে, সে বলিবে "হে আল্লাহ্ আমাদের জন্য ইহাতে বরকত দাও এবং ইহার চেয়ে বেশি দাও, **কারণ দুধ ছাড়া আর অন্য কিছুই আহার ও পানীয়ের ক্ষতিপূরন করিতে পারে না।**"[১]

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, "আমার খুব ক্ষুধা পাইয়াছিল। আমি উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কোরআনের একটি আয়াত পড়িতে বলিলাম। তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া আয়াতটি আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। আমি কিন্তু কিছুদূর না যাইতেই ক্ষুধার তাড়নায় মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেলাম। সহসা দেখি রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার মাথার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বলিলেন, "আবু হুরাইরা"। আমি বলিলাম, 'খেদমতে হাজির আছি–বলুন আদেশ পালন করি।' তিনি আমার হাত ধরিয়া আমাকে খাড়া করিলেন এবং আমার অবস্থা বুঝিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন এবং আমার জন্য এক জামবাটি দুধ আনাইলেন। আমি উহা হইতে কিছু খাইলাম। তিনি বলিলেন; 'ফের খাও'। আমি ফের খাইলাম। তিনি বলিলেন, 'আরো খাও'। আমি আরো খাইলাম। অবশেষে আমার পেট ফুলিয়া গেল। তারপর আমি দেখা করিলাম ওমরের সহিত এবং তাঁহাকে জানাইলাম আমার ব্যাপার এবং বলিলাম খোদা উহার ভার অর্পণ করিলেন তোমার চেয়ে যে উহার জন্য বেশি হকদার তাঁহার ওপর। হে ওমর, কসম খোদার তোমাকে আমি একটি আয়াত পড়িতে বলিলাম, যদিও আমি নিশ্চয় তোমার চেয়ে ভাল পড়ি। ওমর বলিলেন, "কসম খোদার তোমাকে ঘরে আনা আমি বেশি পছন্দ করিতাম লাল উটের মালিক হওয়ার চেয়েও।"[২]

---

২. স্বাস্থ্য বিজ্ঞান - বাংলাদেশ টেক্স্ট বুক বোর্ড।

৩. সহীহ বুখারী - তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। পানীয় পরিচ্ছেদ। পৃঃ ৩৫৯; হাঃ নং ১০, ৭৫২।

১. তিরমিজি আবু দাউদ। সংগৃহীত - আলহাজ্ব আজহারউদ্দিন, এম. এ., হাদিসের আলো। ২য় খণ্ড। পানি ভোজন পরিচ্ছেদ। হাঃ নং ৫৪৬, পৃষ্ঠা ১১৩।

২. সহীহ বুখারী। তর্জমা আলহাজ্ব আজহারউদ্দিন, এম. এ., হাঃ নং ১৬৯৯।

www.pathagar.com

হজরত (দঃ)-এর মাত্র কয়েকটি কথার মধ্যেই সব প্রশ্নের সমাধান মিললো। দুধ ছাড়া কিছুই আহার ও পানীয়ের ক্ষতিপূরণ করতে পারে না। তিনি দুধের গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণনা করে এ তথ্যই শরীরবিজ্ঞানীদের শিখিয়ে দিলেন যে, পৃথিবীতে যত প্রকার খাদ্য ও পানীয় আছে তার মধ্যে দুধ সর্বশ্রেষ্ঠ।

পরবর্তী যুগের বৈজ্ঞানিকরা দুধকে বিশ্লেষণ করে এর মধ্যে কি দেখতে পেলেন? তাঁরা দেখলেন–শরীর গঠনের জন্য সর্বপ্রকার উপাদান দুধে বিদ্যমান। এতে আমিষ (protein), শর্করা (Sugar), স্নেহ জাতীয় পদার্থ (Fat), ভিটামিন (Vitamin), ধাতব লবণ(Mineral salts) ও পানি (Water)–এ ছয়টি উপাদানই বিদ্যমান। এ জন্য সুস্থ, অসুস্থ, যুবক, বৃদ্ধ, শিশু ও দুর্বল সবার পক্ষেই দুধ প্রযোজ্য। এছাড়া ভিটামিন B1, B2, C, D, Iodine, Sodium, Potassium–ও প্রচুর। এ জন্যই দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয়। আল্লাহর বাণীও এর সাক্ষ্য বহন করে।

"এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশুর মধ্যে শিক্ষাপ্রদ বিষয় রহিয়াছে; এবং আমি তোমাদিগকে উহাদের উদরে অন্তর্নিহিত গোময় ও শোনিতের মধ্য হইতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ পান করাইয়া থাকি, যাহা পানকারীদের জন্য তৃপ্তিকর।"[১] (১৬ ঃ ৬৬)

এমন উপযোগী ও মূল্যবান খাদ্যকে সংরক্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। ধুলোবালি ও মাছি দুধে রোগজীবাণু মিশিয়ে দেয়। দুধের মাধ্যে রোগজীবাণুর সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে। এ জন্যই খোলা জায়গায় মুক্ত বাতাসের মধ্যে বা ঢাকনি না দিয়ে দুধ রাখা ঠিক না। হজরত (দঃ) তাঁর এক বাণীতে এ বিষয়েও উপদেশ দিয়েছেন। আবু উমাইদ নকীব একপাত্র দুধ আঢাকা অবস্থায় রসুল (দঃ)-এর নিকট আনলে তিনি তা দেখে বললেন,

"উহা ঢাকিয়া আনিলে না কেন? যদি উহার উপর রাখিতে একখানি আড়াআড়ি কাঠ।"[২]

ওপরের বাণী প্রমাণ করে যে দুধের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। নইলে এমনিভাবে তিনি উপদেশ দিতেন না। সংক্রামক ব্যাধির হাত হতে রক্ষা করতেই তিনি এ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। পানীয় সম্বন্ধে আর দু-চারটি মূল্যবান বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"শীতল ও সুমিষ্ট পানীয় হজরত (দঃ)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল।"[১]

শীতল ও সুমিষ্ট পানীয়ের মধ্যে ঘোল, দধি, চিনির সরবত, মধুর সরবত, লেমনেড অন্যতম।

দুধ হতে দধি হয়। দধি থেকে আবার ঘোল হয়। দুধে যখন ব্যাসিলাস বাড়ে তখন তা ল্যাকটিক এ্যাসিড তৈরি করে, ফলে দুধ দধিতে পরিণত হয়। দুধ গুরুপাক কিন্তু দধি ও ঘোল লঘুপাক্ সেজন্য পেটের পীড়ায় আক্রান্ত রোগীদের দধি অথবা ঘোল পান করার উপদেশ দেওয়া হয়।

ঘোল পেটকে শান্ত করে, স্নায়ুমণ্ডলীকে শীতল করে। এতে আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য থাকে না।

---

১. কোরআন ঃ সূরা নহল, আয়াত ৬৬।

২. সহীহ বুখারী। তর্জমা পূর্বে বর্ণিত। হাঃ নং ৯/১৫১।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে হজরত (দঃ)-এর আর একটি বাণীর উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি বলেছেন, "উষ্ট্রের মতো এক নিঃশ্বাসে সবটুকু (দুধ বা পানীয়) পান করিও না। বরং অল্প অল্প করিয়া দুই বা তিনবারে পান কর এবং প্রথমে বিসমিল্লাহ ও শেষে আলহামদুলিল্লাহ বল।"[২]

আমি পাকস্থলী ক্রিয়া লিখতে গিয়ে Renin নামক এক প্রকার পাচক রসের কথা উল্লেখ করেছি। পাকস্থলী হতে নিঃসৃত এই রস দুধকে দধিতে পরিণত করে। পাকস্থলীতে এই দুধ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এই রস নিঃসৃত হতে থাকে। এজন্যই ছোট ছেলেরা দুধ পান করার ২৪ মিনিট পর বমি করলে দেখা যায় যে তা দধিতে পরিণত হয়েছে। দধিতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত হজম ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এজন্য দুধ পান করার সময় এক নিঃশ্বাসে অর্থাৎ অল্প সময়ে বেশি পরিমাণ পান করা উচিত নয়। এমন একটা সময় নিয়ে পান করা উচিত, যে সময়ের মধ্যে পাকস্থলী হতে এই Renin রস দুধের সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে ও ল্যাকটিক এ্যাসিড তৈরি করে দধিতে রূপান্তরিত করার সুযোগ পায়। তাহলে বদহজমের সম্ভাবনা থাকে না। অন্যান্য পানীয় সম্বন্ধে এরূপ নিয়মই পালন করা উচিত। তাহলে স্নায়ুমণ্ডলী এ পানীয়কে শরীর অভ্যন্তরে সহজে শোষণ করার সুযোগ পায়; ফলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, ভয়ের আশঙ্কা থাকে না, হজম ক্রিয়ারও সুবিধে হয়। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি এ কথার সাক্ষ্য দেয়।

আনাস (রাঃ) বলেন, "হজরত মুহাম্মদ (দঃ) পান করিবার সময় তিনবার নিঃশ্বাস লইতেন এবং বলিতেন–ইহা তৃষ্ণা নিবারক, স্বাস্থ্যপ্রদ এবং পাচক।"[১]

শীতল ও সুমিষ্ট পানীয়ের মধ্যে রসুলুল্লাহ (দঃ) মধুর সরবতকেই বেশি পছন্দ করতেন। মধুর সরবত তৃষ্ণা নিবারণ করে, পেটের রোগকে আরোগ্য করে, স্নায়ুমণ্ডলী সবল করে, মস্তিষ্ক শীতল ও উর্বর করে, রোগজীবাণু ধ্বংস করে, পরিশ্রম করার সহায়তা করে। ডাক্তার, কবিরাজগণ এ বিষয়ে আরও অধিক গুণাগুণ বর্ণনা করতে পারবেন।

তালের রস, খেজুরের রস, তরমুজের রস, ডাবের জল ও অন্যান্য ফলের রস এগুলিও সুমিষ্ট ও শীতল পানীয়। এ সবের ওপর হজরত (দঃ)-এর প্রত্যক্ষ কোন বাণী আমি এখন পর্যন্ত পাই নি, তাই পাঠকবৃন্দের আগ্রহ মেটাতে পারছি না। তবে নিঃসন্দেহে একথা বলতে পারি যে এগুলির ওপর বিধিনিষেধ নেই। বরং শরীরের জন্য উপকারী। এসব তিনি পছন্দ করতেন এটা আমরা ধারণা করতে পারি। তবে তালের রস, খেজুরের রস বা অন্যান্য যে কোন ফলের রস যা নেশার বস্তুতে পরিণত হয় তা তাঁর মতে হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ। এসব পানীয় কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় নয়। এ বিষয়ে নিম্নে একটি হাদিস পেশ করছি।

"যে পানীয়ে নেশা হয়, তাহা হারাম।"[২]

তাড়ি–তালের রস, খেজুরের রস, কয়েকদিন ধরে পচালে তাড়িতে পরিণত হয়। এটাকেও মদ বা Alcohol বলা হয়। মদের মধ্যে এটাই সব চাইতে নিকৃষ্ট। আমাদের দেশে অনেকেই বিশেষ করে মেথর ও অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত মজুরেরা মদের অভাবে এই তাড়ি পান করে। এতে সাংঘাতিক নেশা হয়। স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়ে পড়ে। হিতাহিত জ্ঞান

টীকা ঃ ১ - ২. তিরমিজি। সংগৃহীত - মুহাম্মদ আজাহারউদ্দিন, এম. এ., হাদিসের আলো। ২য় খণ্ড। হাদিস নং ৫৪৫। পৃষ্ঠা ১১৩ ও হাঃ নং ৫৪২।

১. শায়খান। সংগৃহীত - হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড। পানভোজন পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ১১৩, হাঃ নং ৫৪০।

২. সহীহ বুখারী। পানীয় পরিচ্ছেদ। তর্জমা পূর্বে বর্ণিত। পৃষ্ঠা ৩৫৬।

www.pathagar.com

থাকে না। বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে যাকে সম্মুখে পায় তাকেই গালি দেয় অথবা অচেতন হয়ে রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে। এ জন্যই ইসলামী মতে তাড়ি হারাম (নিষিদ্ধ)।

চা–হজরত (দঃ)-এর সময় চা-এর প্রচলন ছিল কিনা জানা যায় না। চায়ের ওপর কোন হাদিস আমি পাই নি। তবে চা নিষিদ্ধ নয়, কেননা এটা নেশার উদ্রেক করে না। সাময়িকভাবে শরীরে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা চা-কে বেশি পছন্দ করে। আহারের পূর্বে বা পরে অনেকেই চা, কফি পান করে আনন্দ পায়। অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের পর চা পান করলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র সাময়িকভাবে সতজে হয়। ফলে ক্লান্তি দূর হয় ও পরিশ্রম করার শক্তি এনে দেয়।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে অতিরিক্ত চা পানে অগ্নিমন্দা, অজীর্ণ ও কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। চা পাতার মধ্যে Tenin নাম এক প্রকার Chemical পদার্থ থাকে বলে তাঁরা ধারণা করেন। এ জন্যই অতিরিক্ত চা পান করা অনুচিত।

বর্তমান বিজ্ঞানীদের মতে, চা পান ক্ষতিকারক নয়। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন **'C'** রয়েছে। চা ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি, কাশি, দন্তরোগ, স্কার্ভি রোগ ও লিউকোমিয়ার মহৌষধ। ভিটামিন **'C'** -এর অভাবে শরীরে যেসব রোগের সৃষ্টি হয় চা তার প্রতিষেধক।

সোভিয়েত রাশিয়ার ফিজিওলজি ইনস্টিটিউটের প্রফেসর কিয়েভস্ক বগমোলেটস্ চায়ের ওপর গবেষণা করে যে তত্ত্ব বের করেছেন, বিভিন্ন পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের **'দৈনিক বাংলা'** পত্রিকায় উক্ত ঘটনা **'চায়ে লিউকোমিয়া নিরাময়ের উপাদান রয়েছে'** শিরোনামায় যা বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

[আগস্ট ১৯৭৩ সন, নয়াদিল্লি ২৫ আগস্ট, এনা]

"চায়ে এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ আছে যা **লিউকোমিয়া বা রক্তের ক্যান্সার নিরাময়ে** কার্যকরী বলে প্রমাণিত হতে পারে।"

সোভিয়েত রাশিয়ার কিয়েভস্ক বগমোলেটস্ ফিজিওলজি ইনস্টিটিউটে ইঁদুরের ওপর তেজস্ক্রিয়তা প্রয়োগ করে এ প্রকার পরীক্ষা চালান। তেজস্ক্রিয়তা প্রয়োগের ফলে ইঁদুরের রক্তে লিউকোমিয়ার আক্রমণ হয়। এরপর এসব ইঁদুরকে দুভাগে বিভক্ত করে রাখা হয়। এক ভাগকে বিনা চিকিৎসায় রাখার ফলে সেগুলো মারা যায়। আর এক ভাগের ওপর চা থেকে পাওয়া জৈবিক উপাদান 'ক্যাটেচিন' প্রয়োগ করার ফলে সেগুলো বেঁচে যায়। এ খবর দিয়েছে নভোস্তি বার্তা প্রতিষ্ঠান।

আরও জানা গেছে যে টাট্‌কা চা-পাতায় লেবুর রস অথবা কমলালেবুর রসের চারগুণ ভিটামিন 'সি' রয়েছে। সর্বশেষ পরীক্ষায় জানা গেছে যে চায়ের সব মিলিত উপাদানের শক্তিই আরোগ্যকারী গুণ। চা শুধু উৎফুল্লই করে, নেশাগ্রস্ত করে না।

কফি– এতে ক্যাফিন নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এই Caffine সাময়িকভাবে স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত করে বলে মাংসপেশীর কর্মশক্তি বেড়ে যায়। এটা মদ বা তাড়ির মতো নেশার উদ্রেক করে না, তাই নিষিদ্ধ নয়।

এ ধরনের পাতার মধ্যে গাঁজা-আফিম হারাম। ইসলাম ধর্মে এগুলি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। কেননা গাঁজা ও আফিমখোর ব্যক্তিরা তাড়ি ও মদখোর ব্যক্তিদের মতোই নেশায় ঢুলে পড়ে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। দেহের ভারসাম্য নষ্ট হয়, ফলে এদিক ওদিক ঢুলতে থাকে, অবক্তব্য ভাষা ব্যবহার করে ও কুকার্যে লিপ্ত হয়। এছাড়া স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর এগুলো এমন আঘাত হানে যে গাঁজা ও আফিমখোর ব্যক্তির যে কোন স্থানে যে কোন সময় মৃত্যু হতে পারে।

www.pathagar.com

মদ–হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বলেছেন,

"মদ, উহার পানকারী, পানপাত্র বাহক, বিক্রেতা, ক্রেতা, নিষ্পেষক ও নিষ্পেষিত বস্তু এবং বাহক ও বাহনকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন।"[১]

"কখনও মদপান করিও না, কারণ উহা সমস্ত কুকার্যের কুঞ্জিকা।"[২]

"মদ্যপায়ী মূর্তিপূজকের তুল্য।"[১]

"যে মদ্যপান করে ইহকালে এবং তওবা করে না সে উহা হইতে বঞ্চিত হবেই পরকালে।"[২]

"ব্যাভিচারী মুমেন থাকে না যখন সে ব্যভিচার করে, মদ্যপায়ী মুমেন থাকে না যখন সে মদ্যপান করে এবং চোর মুমেন থাকে না যখন সে চুরি করে।"[৩]

"যে পানীয়ে নেশা হয় উহা হারাম।"[৪]

রসুল (দঃ)-এর প্রতিটি বাণী নিয়ে বিশ্লেষণ করলে এক একটা বই রচিত হবে। পাঠকবৃন্দের অধৈর্য ঘটাবার ইচ্ছা আমার নেই। মদ শরীরের জন্য কেন ক্ষতিকর শুধু সেটারই একটু বিশ্লেষণ এখানে দিচ্ছি। রসায়ন বিজ্ঞান পরিচ্ছেদে ইনশাআল্লাহ্ আরও কিছু আলোচনা করব।

প্রতিটি ধর্মে মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মদ্যপানকারী যে শুধু সমাজকেই কলুষিত করে তা নয়, দেহের যে ক্ষতিসাধন করে, ধ্যান-ধারণা ও সুচিন্তার মাথায় যে কুঠারাঘাত করে তার তুলনা মেলে না। মদ্যপানে যদিও সাময়িকভাবে স্নায়ুতন্ত্রগুলি সবল ও সুস্থ বলে মনে হয় তবু এর ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর। মদ্যপানের ফলে লঘু মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি অন্যান্য অংশের পূর্বেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ফলে মদ্যপায়ী দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। তাই চলতে ফিরতে টলতে থাকে। মস্তিষ্কে এর ক্রিয়া ত্বড়িৎ গতিতে চলে বলে স্নায়ুগুলিও অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কুকর্মের নেশায় পাগল হয়ে ওঠে। ধন-মান রাজ্য, বিদ্যাবুদ্ধি সব জলাঞ্জলি দিয়ে ছোটে নারীর পেছনে। মা, ভাই-বোন,বন্ধু-বান্ধবীর কোন ভেদাভেদ থাকে না। যাকে কাছে পায় তারই সর্বনাশ ঘটায়। এ জন্যই রসুল (দঃ) বলেছেন–'উহা সমস্ত কুকার্যের কুঞ্জিকা'।

আল্লাহ্ পাকও কোরআনে মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও নেশাকে গুরুতর অপরাধ বলে অভিহিত করেছেন। নিম্নোক্ত বাণী এর সাক্ষ্য বহন করে।

'তাহারা তোমাকে মাদকদ্রব্য ও জুয়াখেলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তুমি বল এতদ উভয়ই গুরুতর পাপ ও মানবমণ্ডলীর জন্য অলাভজনক। এবং এতদ উভয়ে লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর।"[১] (২ ঃ ২১৯)

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! মাদকদ্রব্য ও দ্যুতক্রীড়া ও প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরপুঞ্জ এবং ভাগ্যশরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য ব্যতীত নহে। অতএব উহা হইতে বিরত হও যাহাতে তোমরা সুফলপ্রাপ্ত হইবে।"[২] (৫ ঃ ৯০)

টীকা ঃ ১ - ২. আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও সগির (সংগৃহীত, পূর্বে বর্ণিত হাদিসের আলো), ২য় খণ্ড। পৃষ্ঠা ১১৯।

২ - ৪. সহীহ বুখারী (তর্জমা পূর্বে বর্ণিত), পৃষ্ঠা ৩৫৫ - ৩৫৬।

১. কোরআন ঃ সূরা বাকারাহ, আয়াত ২১৯।

২. কোরআন ঃ সূরা মায়েদা, আয়াত ৯০।

www.pathagar.com

যে যুগে হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জন্ম হয়, সে যুগ ছিল পাষাণ প্রতিমার যুগ, সে যুগ ছিল মদ্যপায়ীর যুগ, সে যুগ ছিল ব্যভিচারীর ও জুয়াড়িদের যুগ। অত্যাচার, অবিচার,হিংসা-বিদ্বেষ ও ব্যভিচারে ভরে উঠেছিল সমগ্র দেশ, যার ছোঁয়া লেগেছিল সারা পৃথিবীতে। কোন সম্রাট,কোন নরপতি, কোন রাজ্যশাসক, কোন রাজনীতিবিদই এ কুস্বভাব ও অনাচারের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে নি। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কোন আইন প্রয়োগ করেন নি, বলপ্রয়োগ করেন নি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মদ্যপান, জুয়াখেলা ও ব্যভিচার বন্ধ করেন নি। তিনি শরীরবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও অদৃশ্য বিজ্ঞানের নতুন থিওরী দিয়ে মানুষকে প্রভাবান্বিত করেন। কথিত আছে যে কোরআনের এই বাণী তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হবার কয়েক দিনের মধ্যেই এ সুরার স্রোত আরব থেকে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

মাদক জাতীয় দ্রব্য পান করে মানুষ সাময়িক লাভবান হয়। এ থেকে বিভিন্ন ধরনের উত্তেজক ওষুধপত্র তৈরি হয় যা সেবন করে মানুষ কিছুটা আরোগ্য লাভ করে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ফলে শরীরের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়, স্নায়ুমণ্ডলীর যে অসাড়তা পরিশেষে নেমে আসে, লঘু মস্তিষ্কে আঘাতের ফলে চিন্তাধারায় যে বিপাক সাধিত হয় তা মদের গুণের তুলনায় অনেক বেশি। জুয়ার ব্যাপারও ঠিক তাই। বিনা পরিশ্রমে লাভের আশায় জুয়া খেলতে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে মানুষ পথের ভিখারি হয়। জুয়াড়িরা চুরি, ডাকাতি ও খুন করতে দ্বিধাবোধ করে না। জুয়ার নেশায় বাড়িঘর, ধন-দৌলত এমনকি নিজ স্ত্রীর ইজ্জত বিক্রি করতেও তারা রাজি হয়, এমন দৃষ্টান্তও অনেক দেখা গেছে। জুয়ার নেশায় একবার পড়লে তার সর্বনাশ ঘটে। শরীরবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা ক্ষতিকারক। কেননা জুয়াড়ীরা মদ, তাড়ি, ভাং, আফিম, গাজা ও বেশ্যাবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়। রাত্রি জাগরণ করে দেহের বল-বীর্য, শক্তি-সাহস ও কান্তি হারিয়ে ফেলে। অনিয়ম, কুখাদ্য, অনিদ্রা ও ব্যভিচারের দ্বারে আঘাত হানতে থাকে, ফলে অকালে প্রাণ হারায়।

পোশাক-পরিচ্ছদ

পোশাক-পরিচ্ছদ শরীরবিজ্ঞানের অন্যতম অঙ্গ। পোশাক-পরিচ্ছদকে বাদ দিয়ে দেহ-মনকে সুস্থ রাখা সম্ভব নয়। দেহের জন্য যেমন উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি প্রকৃতির খেয়ালী অত্যাচার থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য পোশাকের প্রয়োজন। প্রাচীনকালে যখন মানুষ বস্ত্র তৈরি করতে জানত না তখনও প্রয়োজনের তাগিদেই তারা পোশাক ব্যবহার করত। এখন আমরা যেমন সুট, কোট, প্যান্ট, সার্ট, জুতা, মোজা ব্যবহার করে দেহকে রক্ষা করি, পুরাকালের মানুষ যাদের আমরা অসভ্য বলে আখ্যায়িত করি তারও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে গাছের ছাল, বাকল, পাতা ও পশুর চামড়া ইত্যাদি ব্যবহার করত। শীত, গ্রীষ্ম, ঝড়, বৃষ্টি, উষ্ণ ও শীতল হাওয়া দেহের ক্ষতি করতে না পারে এ চিন্তা অসভ্য মানবদের যখন ছিল তখন বৈজ্ঞানিক যুগের সুসভ্য মানবের মাঝে আরও বেশি পরিমাণে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই পোশাক পরিচ্ছদের ওপর দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য; এটা শুধু ফ্যাশন ও বাবুগিরিই নয়, দেহ রক্ষার্থে অতীব প্রয়োজন। এ প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা চলে না। একে বিলাসিতা বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

www.pathagar.com

জাতিভেদ দেশাচার ভেদে পোশাকের তারতম্য ঘটে। হিন্দুদের যে পোশাক, মুসলমানদের পোশাক তা হতে আলাদা আবার হিন্দু-মুসলমানের পোশাক থেকে খ্রীষ্টান, ইহুদি ও অন্যান্য জাতির পোশাক ভিন্ন। দেশাচার ভেদেও ঠিক তাই দেখা যায়। একই জাতি মুসলমান অথচ বাঙালি মুসলমানদের পোশাক, আরব, ইরান, তুর্কী ও পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের মুসলমানদের পোশাক তা হতে ভিন্নতর। একই মুসলমানের পোশাক দেখে অন্য মুসলমানেরা হাসে। অন্যান্য জাতির মধ্যেও তাই। দেশাচার ভেদে এক জাতি হয়েও ভিন্ন পোশাক ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।

পদমর্যাদা অনুযায়ীও পোশাকের তারতম্য ঘটে। যেমন পিয়ন, চাপরাশি, হোটেলের বয়, বাবুর্চি, ড্রাইভার, পাইলট, সৈনিক, পুলিশ এদের পোশাক সাধারণ মানুষের পোশাক হতে ভিন্ন। পোশাকের প্রকারভেদে মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়। রাজকীয় পোশাক পরলে রাজসুলভ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। পুলিশের পোশাক পরলে মেজাজ কঠোর হয়। বয়, বাবুর্চি ও পিওনের পোশাক পরলে সেবার মনোবৃত্তি আসে। আটো-সাটো পোশাক পরলে দাম্ভিকতা, অহঙ্কার ও কুপ্রবৃত্তিতে মন ভরে ওঠে। সৈনিকের পোশাক পরলে যুদ্ধের লিপ্সা জাগে। জজের পোশাক পরলে ন্যায়-নীতির প্রশ্ন মনে জাগে।

পুরুষ ও নারীর পোশাকেও ব্যবধান আছে। পুরুষের পোশাক নারীর জন্য উপযুক্ত নয়। নারীর পোশাকও পুরুষের উপযুক্ত নয়। কেননা পুরুষ নারীর পোশাকে ভূষিত হলে নারীর মনোবৃত্তি আসে। ভীরুতা, কাপুরুষতা ও লজ্জায় মন আড়ষ্ট হয়। নারীর অবস্থাও ঠিক তাই। নারী পুরুষের পোশাক পরলে মাতৃত্বের মনোবৃত্তি হারিয়ে ফেলে, কঠোর হতে বাধ্য হয়। পোশাকের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না, জল্লাদের পোশাক পরে কেউ মায়ার টানে কাঁদে না; টেডি পোশাক পরেও ধর্মের নামে আকুল হয় না; পাগড়ি ও আলখেল্লা পরে কেউ চুরি করে না।

দেশাচার ও জাতিভেদের তারতম্য থাকলেও পোশাকের মাঝে একটা শালীনতা থাকা দরকার। যে ধরনের পোশাক পরলে মনে কুপ্রবৃত্তি জন্মে না, অহঙ্কার ও আস্ফালনে নাকের শিরা-উপশিরা স্ফীত হয়ে ওঠে না, অথচ শরীর ও মনকে সুস্থ রাখা যায় সে ধরনের পোশাক পরাই সঙ্গত।

চোদ্দশ' বছর আগের এক মহামানব অসভ্য যুগের মাঝে জন্ম নিয়েও অসভ্য মানুষের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের ওপর যে বিধিব্যবস্থা দিয়ে গেছেন তার দু-একটি মাত্র এখানে আলোচনা করছি ও দেখছি যে সেগুলি সত্যি শরীরবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কতটুকু প্রযোজ্য ও প্রয়োজন। তিনি বলেছেন,

"গোড়ালির নিচে পায়ের যে অংশে কাপড় ঝুলে উহা যাইবে দোজখে।"[১]

"যে ব্যক্তি গর্ব প্রকাশের জন্য তাহার পাজামা লম্বা করে আল্লাহ্ তাহার সহিত কথা বলিবেন না।"[২]

ওপরের দুটি বাণীই প্রথমে আলোচনা করছি। পূর্বেই বলেছি যে পোশাক সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও দেহ রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া গর্ব, অহঙ্কার বা রোগজীবাণু টেনে আনতে নয়। পায়ের গোড়ালির নিচে পর্যন্ত কাপড় ঝুলে পরার অর্থই রাস্তার ধুলো, বালি, কাঁদা, মল,বিষ্ঠা প্রভৃতি ইচ্ছাকৃতভাবে কাপড়ে সংযুক্ত করা। এই রোগজীবাণুবিশিষ্ট পদার্থ কাপড়ের সঙ্গে মিতালী

টীকা ঃ ১. সহীহ বুখারী। তর্জমা-আবদুর রহমান খাঁ। হাঃ নং ১/৭৯৭; পৃ. ৩৮৬।

২. তিরমিজি ও আবু দাউদ। সংগৃহীত-আজহার উদ্দিন, এম.এ., হাদিসের আলো। ২য় খণ্ড। হাঃ নং - ৫১২।

www.pathagar.com

করে হাত, পা, গা ও পেটে ঢুকবার সুবর্ণ সুযোগ পায়। এরপর কি হয় সেটা আধুনিক যুগের শিক্ষিত সমাজ ও জ্ঞানীদের নিকট বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

দ্বিতীয়ত–পোশাকের সঙ্গে সৌন্দর্যের প্রশ্ন জড়িত যে কাপড় পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করে তা নিঃসন্দেহে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ করে অপবিত্র ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে উঠে এটাও জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নির্ভুল। অহঙ্কারী মনে ফ্যাশানের আশায় নিজের পোশাক যদি কেউ ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত করে তোলে তবে বন্ধু-বান্ধবদের কাছেই শুধু নয়, শিশুদের কাছেও উপহাসের পাত্র হতে বাধ্য। এ ধরনের লোককে দেখে ঘৃণার চোখে সবাই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। আল্লাহ্ পবিত্রতা ভালবাসেন। অপবিত্রকারীকে তিনি পছন্দ করে না। কোরআন এর সাক্ষী।

"হে বসনাবৃত, ওঠ। অনন্তর ভয় প্রদর্শন কর। এবং তোমার প্রতিপালকের মহিমা প্রচার কর। **এবং তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র কর এবং মলিনতা দূরীভূত কর।**" (সূরা মোদ্দাচ্ছের, আয়াত-৩,৪)

" হে আদম, বংশধরগণ, আমি অবশ্য তোমাদের প্রতি এরূপ পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা তোমাদের আবৃতাঙ্গ আচ্ছাদিত ও সুসজ্জিত করে। এবং সংযমশীলতার পরিচ্ছদই উত্তম। ইহা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত যেন তোমরা স্মরণ কর।"

(সূরা আরাফ, আয়াত ২৬)

এজন্যই হজরত (দঃ) বলেছেন যে, যারা মলিনতাকে পছন্দ করে ও অহেতুকভাবে পাজামা লম্বা করে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না।

ইসলামে নির্দিষ্ট পোশাক নেই। এর ওপর কোন বিধি-নিষেধও নবী-পয়গম্বরগণ দিয়ে যান নি। আবহাওয়ার সঙ্গে মিল রেখে শরীরকে সুস্থ রাখবার জন্য যে কোন পোশাকই ব্যবহার করা চলে। এর প্রমাণ আমরা পাই হজরত আব্বাস (রাঃ) এবং হজরত ওমরের (রাঃ) বাণী হতে। যা ছিল নিম্নরূপ–

"যাহা ইচ্ছা আহার কর,পান কর ও পরিধান কর, যে পর্যন্ত অমিতব্যয়িতা ও অহঙ্কার উহার সহিত মিশ্রিত না হয়।"[১]

যে পোশাকে অহঙ্কার আসে, দাম্ভিকতা আসে, প্রবৃত্তির লালসা আসে-সে পোশাক বর্জনীয়। হজরতের বাণী হতে আমরা তা দেখলাম এবং বিচার দিনের কঠোরতার কথাও জানলাম। এ বাণী সমগ্র মানবজাতির জন্যই সাবধান বাণী।

পূর্বোক্ত নবীরাও এ অহঙ্কারী ও স্বার্থপর পোশাকধারীদের কঠোরভাবে সাবধান করে দিয়েছেন। নিম্নে হজরত ঈসা (আঃ)-এর বাণী এর সাক্ষ্য বহন করে।

হজরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ

"ধর্মগুরুদের বিষয়ে সাবধান হও; তাহারা লম্বা লম্বা জামা পরিয়া বেড়াইতে চায় এবং হাটে-বাজারে লোকদের অভিবাদন, সমাজ-গৃহে প্রধান প্রধান আসন এবং ভোজের সময় প্রধানস্থান ভালবাসে; তাহারা বিধবাদের গৃহসম্পত্তি গ্রাস করে, এবং ধর্মের ভান করিয়া লম্বা প্রার্থনা করে। বিচারে তাহারা আরও অধিক দণ্ড পাইবে।"

[বাইবেল; ইঞ্জিল, লুক ২০/৪৬-৪৭ ও মার্ক ১২/৩৮-৪০]

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এবং হজরত ঈসা (আঃ)-এর বাণী হতে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে–জামা, পাজামা, তহবন্দ যে কোন পোশাকই পরি না কেন অহঙ্কারের প্রবৃত্তি নিয়ে, স্বার্থসিদ্ধির ভান করে বা অন্যের ওপর ঈর্ষা করে, নিজেকে সমুন্নত করার সকল উদ্দেশ্যই

টীকা ঃ ১. বুখারী। সংগৃহীত হাদিস রসুলকৃত – মৌঃ মোঃ তরিকুল ইসলাম, পৃষ্ঠা নং৩৪০।

www.pathagar.com

—পরকালের জন্য অকল্যাণকর, দণ্ডনীয় অপরাধ।

শরীরবিজ্ঞানী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) কি ধরনের পোশাক পরতেন, কেন পরতেন এটা আমরা কিছুটা আগে জেনে নিই। এরপর আবার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর বাণীর ওপর আলোচনা করব।

"আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হজরতের নিকট সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল ইয়মনী চাদর।" (যাহা প্রায় সবুজ)

আয়েশা (রাঃ)—এর উক্তি হতেও এ কথাই জানা যায় যে তিনি ইয়মনী চাদর বেশি পছন্দ করতেন। মৃত্যুর সময়ও তাঁকে ঐ চাদরেই ঢাকা হয়েছিল। তাঁর বাণীটি নিম্নরূপ ঃ

"যখন রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর মৃত্যু হয় তখন তিনি ইয়মনী চাদরে ঢাকা ছিলেন।"[১]

আবু যর (রাঃ) বলেন—"আমি নবী (দঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি সাদা কাপড় পরিয়া শুইয়াছিলেন।"[২]

হজরত বলেছেন, "সর্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছেদ যদ্দ্বারা তোমরা কবরে ও মসজিদে আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও উহা শ্বেতবস্ত্র।"[৩]

"যে কেহ রেশমী বস্ত্র পরিবে দুনিয়াতে, সে উহা পরিতে পারিবে না আখেরাতে।"[৪]

ওপরের উদ্ধৃতিগুলি হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হজরত (দঃ) সুতিবস্ত্র পছন্দ করতেন যা সবুজ ও সাদা রংয়ের ছিল। রেশমী বস্ত্র পুরুষের জন্য তিনি সম্পূর্ণই নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। নিম্নের আর একটি উদ্ধৃতি তা প্রমাণ করে। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, "নবী (দঃ) আমাদের নিষেধ করিয়াছিলেন সোনা ও রূপার পাত্রে পান করিতে বা খাইতে এবং রেশম ও গরদ পরিতে বা উহার উপর বসিতে।"[১]

দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে সুতি বা পশমী বস্ত্র পরিধান করা বিধেয়। মানুষ তার রুচির তারতম্য অনুযায়ী সাদা, কালো, সবুজ, লাল, বেগুনি বা জাফরান, রংয়ের বস্ত্র ব্যবহার করে। এসব বিভিন্ন রংয়ের বস্ত্রকে হজরত (দঃ) হারাম বলে ঘোষণা করেন নি। তবে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্য উত্তম যেসব রং সেগুলির নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজে তা ব্যবহার করে আমাদের শিখিয়েছেন—যেমন সাদা ও সবুজ পোশাক। সাদা পোশাক পরা যে স্বাস্থ্যসম্মত সে বিষয়ে শরীরবিজ্ঞানীদের দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। কেননা সাদা পোশাকে মন যেমন সাদা ও প্রফুল্ল হয় অন্য কোন পোশাকে তা হয় না। মনের সৌন্দর্য ও প্রফুল্লতাই যে সুষ্ঠু চিন্তাধারার মাপকাঠি ও সবল দেহের উপাদান তা সবাইকে স্বীকার করতেই হবে। দ্বিতীয়ত, সাদা কাপড়ে ময়লা জমলে তা চোখে পড়ে। অন্য যে কোন রংয়ের কাপড়ে তা দেখা যায় না। শরীরে ময়লা লাগা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত পোশাক ব্যবহার করা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। তাই সাদা কাপড়ই উত্তম। এজন্যই হজরত (দঃ) সাদা কাপড়কে সর্বোৎকৃষ্ট বলেছেন।

সাদার পরেই সবুজের স্থান। সবুজ রং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। চোখের দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করে। সূর্যের যে সাতটি রঙ আছে সবুজ তার মধ্যে অন্যতম। যদি গাছের পাতা এই সূর্যরশ্মি না পায় তবে সবুজ রং ধারণ করতে পারে না। এর উদাহরণ—ঢেকে রাখা চারাগাছ। একটি চারাগাছকে কয়েকদিন ঢেকে রাখলে দেখা যাবে তার পাতাগুলি সাদা হয়ে গেছে।

টীকা ঃ ১—২. সহীহ বুখারী। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা ৩৮৬-৩৮৯।

৩ . ইবনে মজা, সংগৃহীত মুহাম্মদ আজহার উদ্দিন, এম. এ., হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠা।

৪ . সহীহ বুখারী। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ; ৩৮৬ হতে ৩৮৯ পৃঃ।

টীকা ঃ ১ . সহীহ বুখারী। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। ৩৮৬ হতে ৩৯০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

এই সাদা পাতাবিশিষ্ট চারাটি অত্যন্ত দুর্বল। বাড়বার ক্ষমতা নেই, ফলদানের ক্ষমতা নেই। এর কারণ ক্লোরোফিলের অভাব। ক্লোরোফিল গাছের জীবন। যখন সূর্যরশ্মির সাহায্যে গাছ পর্যাপ্ত পরিমান ক্লোরোফিল পায় তখনি বাড়তে থাকে, সবল হয় ও ফলদানের ক্ষমতা পায়। সবুজ রংয়ের কাপড়ও হয়তো ঠিক এমনি উপাদানই মানব শরীরে দান করে যার ফলে প্রচুর ভিটামিন দেহে প্রবেশ করে। হজরত (দঃ) যে সবুজ রংয়ের পোশাকও ব্যবহার করতেন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁরই প্রিয় সহচর আনাস (রাঃ)। তিনি বলেছেন ঃ

"হজরত (দঃ)-এর প্রিয় পোশাক ছিল সবুজ রং-এর জোব্বা।"[১]

পূর্বে যে বিশ্লেষণ আমি দিলাম এর সত্যাসত্য বিচার করবেন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ও শরীরবিজ্ঞানী ভাইয়েরা। তবে এ বিশ্লেষণ যে অহেতুক হবে না তার প্রমাণ মেলে রসুল (দঃ)-এর আর একটি বাণী হতে, যা আনাস (রাঃ) ও হজরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনা হতে পাওয়া যায়।

আনাস (রাঃ) বলেছেন, "হজরত মুহাম্মদ (দঃ) পুরুষকে নিষেধ করিয়াছেন জাফরানী রং ব্যবহার করিতে।"[২]

হজরত আলী (রাঃ) বলেছেন, "হজরত (দঃ) আমাকে সোনার আংটি, রেশমের পোশাক এবং রুকু সেজদাতে কোরআন পাঠ ও লাল রংয়ের পোশাক পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"[৩]

সোনা এবং লাল, হলুদ, জাফরানী রং বিশিষ্ট বস্ত্রগুলি Ultra Violet ছাড়া বাকিগুলি absorb করে নেয়, অর্থাৎ শোষণ করে ফেলে। Ultra Violet শরীরে D-Vitamin সরবরাহ করে। কিন্তু যেহেতু পুরুষছেলেরা প্রচুর পরিমাণে D-Vitamin সূর্য তাপ হতে পেয়ে থাকে তাই সোনার আংটি বা লাল, জাফরান, হলুদ রংয়ে বস্তু হতে পাবার প্রয়োজন নেই। উপরন্তু ক্ষতিকারক। কিন্তু মেয়েরা রৌদ্রতাপে বের হয় না বলে তাদের শরীরে D-Vitamin এর অভাব হয় যা পূরণ করে সোনার গয়না, লাল জাফরান বস্ত্র। এজন্যই এ সব বস্ত্র ও সোনা গয়না মেয়েদের পরার জন্য হজরত (দঃ) নির্দেশ দিয়েছেন।

রেশমী ও সুতা বস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন রংয়ের ব্যবহার-বিধির ওপর হাত বাড়িয়েছিলাম। এবারে দেখি রেশমী ও সুতী বস্ত্রের গুণাগুণ।

সুতীবস্ত্রের অভ্যন্তরে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। গ্রীষ্মকালে শরীর ঘামলে সুতীবস্ত্র তা শোষণ করে নিতে পারে। এছাড়া সুতীবস্ত্রের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে ঘামকে বাষ্পে পরিণত করে ও শরীরকে শীতল করে। রেশমী বস্ত্রে তা হয় না। ঠিক এর উল্টো ক্রিয়া হয়। ফলে শরীর অসুস্থ হবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। যেহেতু পুরুষছেলেরা কঠোর পরিশ্রম করে, ফলে শরীর ঘর্মাক্ত হয়, তাই তাদের জন্যই শুধু রেশমী বস্ত্র নিষিদ্ধ কিন্তু মেয়েদের জন্য নয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এরও ব্যতিক্রম আছে। যাদের শরীরের ঘর্মবিন্দু বাতাসে ভেসে যাওয়া ক্ষতিকর, অর্থাৎ এ সব ঘর্মবিন্দুর স্পর্শে অন্যের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা তাদের প্রতি শুধু রেশমী বস্ত্র পরিধানের নির্দেশ হজরত (দঃ) দিয়েছেন। রেশমী বস্ত্র এ সব রোগজীবাণুর হাত হতে মানুষকে রক্ষা করে। হজরত (দঃ)-এর তত্ত্বমূলক বাণীগুলি নিম্নরূপ ঃ "আনাস (রাঃ)

টীকা ঃ ১. শায়খান। সংগৃহীত–মোঃ আজহারউদ্দিন, এম. এ., হাদিসের আলো। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৯ (জোববা অর্থ লম্বা ও ঢিলে জামা)

২. শহীহ বুখারী। সংগৃহীত – মোঃ আজহারউদ্দিন, এম. এ., হাদিসের আলো। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা। ১০৯।

৩. তিরমিজি। সংগৃহীত–মোঃ আজহারউদ্দিন, এম. এ., হাদিসের আলো। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৯।

www.pathagar.com

বর্ণনা করেছেন যে রসুলুল্লাহ্ (দঃ) আবদুর রহমান বিন আউফ ও যুবাইর (রাঃ)-কে অনুমতি দিয়েছিলেন রেশমী জামা পরতে তাদের গায়ে কুষ্ঠ হেতু।"[১]

তিনিই অপর এক বর্ণনায় বলেছেন ঃ "তারা দু'জন উকুনের অভিযোগ করলে রসুলুল্লাহ্ (দঃ) তাদের অনুমতি দিলেন রেশমী বস্ত্র পরতে।"[২]

সোনার পাত্রে ও রূপার পাত্রে ভোজন ও পান করতে কেন হজরত (দঃ) নিষেধ করেছেন তার বিশ্লেষণ রসায়ন বিজ্ঞান পরিচ্ছেদে দিতে চেষ্টা করব।

দেহকে আবৃত করতে যেমন জামা-কাপড় দরকার, মস্তিষ্ক ও পদযুগল রক্ষা করতেও তেমনি পরিচ্ছদ দরকার। এজন্য হজরত (দঃ) টুপি, পাগড়ী ও জুতা ব্যবহার করতেন। এ বিষয়ে অনেকেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন—

"যখন হজরত (দঃ) পাগড়ী বাঁধিতেন তখন উহার শেষাংশ উভয় স্কন্ধের মধ্য দিয়ে ঝুলাইয়া দিতেন।"[১]

হজরত নিজেও বলেছেন,

"মুশরেক ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে আমরা টুপির উপর পাগড়ী ব্যবহার করি।"[২]

"তোমরা পাগড়ী পরিবে যেহেতু উহা ফেরেশ্তাদের চিহ্ন এবং উহা তোমাদের পিঠের উপর ঝুলাইয়া দিবে।"[৩]

"তোমাদের কেহ চলিবে না এক জুতা পরিয়া। উভয় জুতা খুলিয়া রাখিবে বা উভয়ই পরিবে।'[৪]

ধুলো-বালি, উষ্ণ হাওয়া ও ক্ষতিকর বিষাক্ত গ্যাসীয় বস্তুর হাত থেকে মস্তিষ্ক রক্ষা করতে টুপি বা পাগড়ী ব্যবহারের প্রয়োজন। এটা অহেতুক বা অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নয়। কেননা ওপরে বর্ণিত পদার্থ সমূহের প্রভাবে মস্তিষ্কে নানা ধরনের পীড়া যেমন ঘা, খুস্কি, উকুন, মাথা ব্যথা ও অন্যান্য ছোঁয়াচে রোগের সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই সর্বযুগে সর্বদেশের মানুষই মাথাকে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করে। চীনারা লাল ঝুলবিশিষ্ট টুপি ব্যবহার করে। এ টুপিকে চীনা টুপি বলে। ইংল্যান্ডবাসীগণ হ্যাট ব্যবহার করে। জাপানি, জার্মানি প্রভৃতি জাতি 'ফেল্টক্যাপ' পরে। আরবীয়গণ পাগড়ী, পাকিস্তানীরা জিন্নাহ ক্যাপ, লিয়াকত ক্যাপ, ভারতীয়গণ নেহেরু ক্যাপ ব্যবহার করে। শুধু ফ্যাশানের জন্য নয়, মস্তিষ্ক রক্ষাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এ জন্য পুলিশ ও মিলিটারিরা খালি মাথায় কার্যক্ষেত্রে যায় না। প্রতিটি দেশেই এ নিয়ম পালিত হয়।

খালি পায়ে চলাফেরাও যুক্তি সঙ্গত নয়। কেননা রোগজীবাণু পদতলের মাধ্যমেও শরীরে প্রবেশ করার সুযোগ পায়; হুকওয়ার্ম, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগজীবাণু ধুলো-বালি, স্যাৎসেঁতে ও আবর্জনাযুক্ত স্থান হতেই উৎপত্তি হয়। চলাফেরার সময় এগুলি পায়ের মাধ্যমে দেহ-অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। এছাড়া আঘাতজনিত দুর্ঘটনা, শীত ও গ্রীষ্মের চরম আবহাওয়ার হাত হতে জুতো শরীরকে রক্ষা করে।

টীকা ঃ ১ –২. সহীহ বুখারী (তজরীদ)– আবদুর রহমান খাঁ বর্ণিত। প্রথম খণ্ড, হাদিস নং ৫৪ ও ৫৫; পৃষ্ঠা ১০২।

টীকা ঃ ১ -২. তিরমিজি। সংগৃহীত – মুহাম্মদ আজহারউদ্দিন, এম.. এ., হাদিসের আলো। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৮–১০৯।

৩. মিশকাত। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৮-১০৯।

৪. সহীহ বুখারী। তর্জমা–আবদুর রহমান খাঁ; হাঃ নং ১০/৮০৬।

www.pathagar.com

এক পায়ে জুতো পরার কথা শুনে অনেকেই অবাক হবেন। কেননা, এরূপ প্রচলন আমাদের দেশে নেই। শহর, নগর ও পল্লির অশিক্ষিত ব্যক্তিরা যাদের সামর্থ্য আছে তারা জুতো পায়ে দিয়ে চলে। যাদের নেই তারা খালিপায়ে চলে। পথ চলার সময় একটি জুতো ছিঁড়ে গেলে অন্যটি তৎক্ষণাৎ খুলে হাতে নেয় অথবা দুটোই ফেলে দেয়। কিন্তু অজ্ঞ দেশের মানুষ এক জুতো ছিঁড়ে গেলে সেটিই হাতে নেয়, বাকিটি অন্য পায়ে থাকে। এটা কাল্পনিক বা গল্পের কথা নয়। আমি স্বচক্ষে পাকিস্তানে এরূপ ঘটনা দেখেছি, যখন রাওয়ালপিন্ডির নিকট হরিপুরে ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম। গ্রামের লোকেরা জুতো ও পাগড়ী পরে শহরে যেত। রাস্তায় হাঁটবার সময় কারো একটি জুতো নষ্ট হলে সেটি কাঁধে অথবা হাতে নিত। বাকিটি অন্য পায়েই থাকত। জীবনে প্রথম এ দৃশ্য দেখে হাসতে হাসতে অস্থির হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। আজ রসুল (দঃ)-এর বাণী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেই দিনটির কথা বার বার মনে পড়ছে আর রসুল (দঃ)-এর সতর্কবাণীর কথা চিন্তা করে তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় হৃদয় বিগলিত হচ্ছে। কত বড় মহান চিন্তাবিদ পণ্ডিত ছিলেন তিনি। মানুষের নাড়ি-নক্ষত্র, মনের ভাব, কল্পনা, খেয়াল ও চরিত্র যেন তাঁর নখদর্পণে ছিল। কি করলে ভাল হবে, কি করলে মন্দ হবে, কোন্ কাজে শরীর ও মন সুস্থ থাকবে, কোন্ কাজে দেহ অসুস্থ হবে এসব বিদ্যায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মানুষের খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, নিদ্রা-অনিদ্রা, ভক্তি-প্রেম, মোহ-মায়া, সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন,মান-অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ, জ্ঞান-বিজ্ঞান সবকিছুর সঙ্গেই তিনি ছিলেন জড়িত। তাই ভূত-ভবিষ্যতের ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরে তিনি দিয়েছেন থিওরী, যা যুগ যুগের জন্য হয়ে থাকবে অমর ও অক্ষয়; যে থিওরীর ক্ষয় নেই; লয় নেই, যা সমালোচনার উর্ধ্বে, বহু উর্ধ্বে।

এবারে আসুন শরীরবিজ্ঞানী ভাইয়েরা, আমরা দেখি এক পায়ে জুতো পরার দোষ কি?

এক পায়ে জুতো আর এক পা খালি থাকলে, শীতের দিনে এক পা যেটিতে জুতো পরা থাকবে, সেটা উষ্ণ থাকবে, রক্ত চলাচল ঠিকমতো হবে। বাকি পা, যেটিতে জুতো থাকবে না, সেটা শীতল হবে; ফলে রক্ত চলাচল ঠিকমতো হবে না। শিরা-উপশিরা অকেজো, অসাড় ও পঙ্গু হবে। যে পায়ে জুতো থাকবে না সেই পা বা শরীরের সেই অংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবে। কেননা অঙ্গে অঙ্গে উষ্ণতার ভারসাম্য থাকবে না।

একটি লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত আগুনে, অন্যপ্রান্ত ঠাণ্ডা পানিতে ডোবালে লৌহদণ্ডটি উষ্ণতার ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না, যার ফলে লৌহদণ্ডটি অতি সহজেই ভেঙে যায়। শরীরের অবস্থাও ঠিক তাই। রসুল (দঃ)-এর এ উপদেশ বিজ্ঞানসম্মত।

মানুষ সৌন্দর্যের পূজারী। সৌন্দর্যকে সে চায়। সৌন্দর্যকেই সে ভালবাসে। তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পোশাক-পরিচ্ছদ, ছবি-নকশা, সুগন্ধি ও বিলাসবহুল জিনিসপত্র নিয়ে জীবন কাটাতে পছন্দ করে। এতে মনের দিক থেকে যেমন উন্নতি হয়, দেহের দিক থেকেও তেমনি উৎকর্ষ সাধিত হয়। হজরত (দঃ)-এর জীবনচরিত ও উপদেশ বাণীর মধ্যেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। নিম্নে তাঁর কয়েকটি বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"প্রাকৃতিক অভ্যাস পাঁচটি ঃ (১) খাত্না করা, (২) গুপ্তাঙ্গের চুলকাটা, (৩) গোঁফ ফেলা, (৪) নখ কাটা এবং (৫) বগলের চুলকাটা।"[১]

"গোঁফ ফেল ও দাড়িকে ক্ষমা কর।"[২]

টীকা ঃ ১. শায়খান।

২. শায়খান ও তিরমিজি সহীহ বুখারী।

www.pathagar.com

"চক্ষুকে সুরমা দ্বারা রঞ্জিত কর, কারণ উহা দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল করে এবং চুল উৎপাদন করে।"[৩]

হজরত (দঃ)-এর সহচরগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন, "নবীর একটি সুরমাকাঠি ছিল। উহা দ্বারা তিনি প্রতি রজনীতে বাম চোখে দু বার এবং ডান চোখে তিনবার সুরমা দিতেন।"[৪]

আল্লাহর প্রেমিক, সাধক, তপস্বী, নবী, পয়গম্বর ও বিজ্ঞানীরা সাধারণত আপনভোলা হয়ে থাকেন। খাওয়া-পরা, গোসল, চুল কাটা, নখ কাটা, দাড়ি কাটা, গোঁফ ফেলা এসব ঝামেলা সহ্য করতে তাঁরা রাজি নন। শরীরের প্রতিও থাকেন বেখেয়াল। চিন্তা শুধু নিহিত থাকে ঈপ্সিত বস্তুর ওপর। কিন্তু এর একমাত্র ব্যতিক্রম শুধু অমর বৈজ্ঞানিক হজরত মুহাম্মদ (দঃ)।

ধ্যান-ধারণা, তপস্যা-প্রার্থনা, আরাধনা ও একমনা হয়ে বিশ্বপালকের নিকট হতে যেমন উপাধি পেলেন 'আহমদ' (প্রশংসাকারী)–সৃষ্ট জীবের বন্ধু হয়ে, মধুর বাণী ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ড উন্মোচন করেও তারই নিকট হতে আবার তেমনি উপাধি পেলেন মুহাম্মদ (দঃ) (প্রশংসিত)। বিশ্ব ও বিশ্ববিধাতা ছিলেন তাঁর একান্ত আপন ও নিকটবর্তী। তাই বেখেয়ালি হয়ে, অচৈতন্য হয়ে, অপরিষ্কার হয়ে ও আনমনা হয়ে জীবন কাটাতে তিনি পারেন নি। যা কিছু করেছেন প্রমাণের ভিত্তিতে করেছেন। যা কিছু দেখেছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। যা কিছু শুনেছেন তা খাঁটি নির্ভুলভাবেই শুনেছেন। তাই যা কিছু আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন তা সত্য ও বিজ্ঞানসম্মত। ওপরের উদ্ধৃত বাণীগুলি তার সাক্ষ্য বহন করে। শরীর বিজ্ঞানীরা আজ চোদ্দশ' বছর পরেও দেখতে পারেন যে খাতনা করা, গুপ্তাঙ্গের চুল কাটা, গোঁফ ফেলা, নখ কাটা এবং বগলের চুল কাটার প্রয়োজনীয়তা কত বেশি। নতুন করে আমার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন পড়েনা। এখানে শুধু গোঁফ ফেলা ও দাড়ি রাখার ওপর সামান্য দু-একটি কথা বলেই এ পরিচ্ছেদ শেষ করছি।

প্রাকৃতিক নিয়মেই পুরুষের দাড়ি গজায়; শক্তি-সাহস বেশি হয়, দেহ বর্ধিষ্ণু হয়, গলার স্বর মোটা হয়। পুরুষ জাতীয় জীবকে স্ত্রী জাতীয় জীব হতে পৃথক করতেই আল্লাহপাকের এ ব্যবস্থা। সিংহের কেশর হয়, সিংহীর হয় না। এ কেশরই তার গাম্ভীর্য ও শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। মোরগের সৌন্দর্যমণ্ডিত পালক মুরগিকে যেমন আকৃষ্ট করে, মোরগকেও তেমনি অসীম শক্তি ও বলবীর্য এনে দেয়। ময়ূরের নয়নাভিরাম পালক ময়ূরীকে মুগ্ধ করে। পেখম মেলে যখন ময়ূর নাচতে থাকে তখন সে দৃশ্য ময়ূরী প্রাণভরে উপভোগ করে। এর প্রাণে তখন আসে এক নতুন জোয়ার, যার ফলে ময়ূরের প্রেমে ময়ূরী মুগ্ধ হয়। ময়ূরের এ সুদৃশ্য পালক ময়ূরীর জন্য আনে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা। লোমে ভরা ও দাড়িতে সজ্জিত পাঠার চাল-চলনে ছাগী মুগ্ধ হয়। পুরুষজাতীয় জীবের এ দাড়ি ও পালক যে অহেতুক নয়, এগুলিই যে পুরুষের বলবীর্যের নিদর্শন এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রত্যক্ষভাবেই আমরা দেখতে পাই যে একটি মোরগ বা একটি পাঠা শত শত মুরগির ও পাঠীর যৌনপিপাসা মেটায়। মানুষের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। যাদের দাড়ি আছে তাদের কাছে শুনলে বোঝা যায় যে কামপ্রবৃত্তিতে তারা অনেক বেশি শক্তিশালী। এছাড়া ঘন ঘন দাড়ি কাটার ফলে স্নায়ুমণ্ডলী আঘাতপ্রাপ্ত হয়; ফলে চোখের জ্যোতি কমে যায়, আর মুখের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। এ জন্যই হজরত (দঃ) বলেছেন, "শ্মশ্রুকে ক্ষমা কর।"

www.pathagar.com

গোঁফ ফেলে দেওয়া বা ছোট করার প্রয়োজন আছে। রসুল (দঃ)-এর মতে গোঁফের পানি হারাম। কেননা গোঁফে ধুলোবালি, ঘর্ম ও দূষিত দ্রব্য লেগে থাকা সম্ভব, যা পান করার সময় পাকস্থলীতে প্রবেশ করে ও অঘটন ঘটায়। এছাড়া শরীর-অভ্যন্তর হতে নাসিকার ছিদ্রপথে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত গ্যাস বের হয়, যা গোঁফের ধুলোবালি ও ঘর্মের সঙ্গে মিশে বিষাক্ত বস্তুতে পরিণত হয়। এসব বস্তু পাকস্থলীতে যে রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটন করে তা মারাত্মক। তাই গোঁফের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন না করে নির্দয়ভাবে কেটে বা ছেঁটে ফেলার আদেশ তিনি দিয়েছেন। এ আদেশ হজরত (দঃ)-এর অগাধ পাণ্ডিত্য ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

এবারে সুরমা লাগান সম্বন্ধে দু-এক কথা বলছি। সুরমা চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পুরুষ অথবা নারী যে কেউই এ সুরমা ব্যবহার করতে পারে। চোখ মানবের অমূল্য সম্পদ। যার চোখ নেই তার কাছে দুনিয়া অন্ধকার। এ চোখকে তাই ধুলোবালি ও দূষিত পদার্থ হতে রক্ষা করা কর্তব্য। প্রাকৃতিক নিয়মেই অবশ্য চোখ নিজেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে। ওপরে ও নিচে চোখের পাতার সংলগ্ন চুলগুলি বাহ্যিক ধুলোবালি হতে রক্ষা করে। এছাড়া চোখ থেকে যে পানি বের হয় তা সঙ্গে সঙ্গে ময়লা ও দূষিত পদার্থকে বের করে দিতে সহায়তা করে। চোখের অভ্যন্তরে এগুলিকে ঢুকবার ও অনিষ্ট করবার সুযোগ দেয় না। এছাড়া সাধারণ পানিতে যে রোগজীবাণু ধ্বংস না হয়, চোখ হতে নিঃসৃত পানিতে তা হয়। এজন্য অতি সহজে চোখ আক্রান্ত হয় না। তবু চোখকে নিরাময় রাখতে ও এর দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর রাখতে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যে ব্যবস্থা আমাদের দিয়েছেন তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা–প্রতি রাত্রিতে চোখে সুরমা লাগান। চোখেতে নিয়মিত ব্যবহার করার জন্য এমন ব্যবস্থা আছে কিনা সুরমার চাইতে মূল্যবান ওষুধ, আর কতগুলি আবিষ্কার হয়েছে জানি না–তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এমন মূল্যবান ও উপকারী ওষুধ বিরল।

সুরমা চোখকে সুস্থ রাখে। স্নায়ুমণ্ডলীকে সতেজ করে, দৃষ্টি-শক্তিকে প্রখর করে। নিয়মিত সুরমা ব্যবহার করলে বার্ধক্য ছাড়া আর কোন রোগ চোখকে আক্রমণ করতে পারে না।

চোখ সব চাইতে সুন্দর ও আকর্ষণীয়। এমন আকৃষ্ট বস্তু প্রাণীদেহে আর নেই। চোখের রূপেই প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা জন্মে। চোখের আকর্ষণেই মায়া ও মোহ আসে। চোখের ইসারা ও চাহনিতেই মন ভোলে। এ চোখের পরিচ্ছেদ কাপড় নয়, সুরমা ও কাজল। এই একমাত্র উপাদান যা চোখের রূপ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। মাটির প্রলেপ দিয়ে, লিপস্টিকের লাল টুকটুকে রং দিয়ে, দোয়াতের কালি দিয়ে, সোনা-রূপার ঝিলিমিলি গুঁড়ো দিয়ে, রেশমী বা পশমী বস্ত্র দিয়ে চোখকে রূপ দিতে গেলে চোখ রূপসী হয় না—হাস্যাস্পদ হয়, আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ করে। প্রেম আনে না, শত্রুতা আনে। ভালবাসা আনে না, ঝগড়া আনে (প্রমাণের ইচ্ছা হলে কেউ করতে পারেন)।

পরিচ্ছেদের মধ্যে আর একটি বস্তু যা রসুল (দঃ) অত্যন্ত বেশি পছন্দ করতেন তা হলো সুগন্ধি। কেউ সুগন্ধি তাঁকে উপহার দিলে তা কোনদিন তিনি ফিরিয়ে দেন নি। সানন্দে গ্রহণ করতেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় হজরত আনাস (রাঃ) ও হজরত আয়েশা (রাঃ)-এর উক্তি হতে।

www.pathagar.com

আনাস (রাঃ) বলেন, "নবী (দঃ) কখনও ফেরত দিতেন না সুগন্ধি।"[১] আয়েশা (রাঃ) বলেন, "আমি রসুলুল্লাহ্ (দঃ)-কে উত্তম সুগন্ধি যাহা পাইতাম তাহা দিয়াই সুগন্ধ করিতাম। এমনকি আমি তাঁহার মাথা ও দাড়িতে সুগন্ধির চাকচিক্য দেখিতাম।"[২]

"আমি বিদায় হজ্বে নিজ হাতে 'যবীরা' (এক প্রকার সুগন্ধি) দিয়া সুগন্ধ করিয়াছি রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে ইহ্‌রাম ছাড়া ও বাঁধার সময়।"[৩]

সুগন্ধি ব্যবহার করা অহঙ্কার নয়। বিলাসিতা বা অপচয়ও নয়। এটা একটা মনের ও দেহের ওষুধ। দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু, ক্ষতিকর গ্যাস নাসিকারন্ধ্র, গলদেশ ও ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। সুগন্ধি ছাড়া সুন্দর পোশাক, সুদৃশ্য ছড়ি, ঢাল, তলোয়ার, বল্লম তীর কোনটি দিয়েই এ দুর্গন্ধ বা দূষিত হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে না। পকেটে মূলবান ক্যাপসুল, আয়ুর্বেদীয় গাছ-গাছড়ার শিকড় বা হোমিওপ্যাথের দু-এক শিশি ওষুধ রাখলেও এ দুর্গন্ধ ভয় পায় না। আপন ভঙ্গিতেই নাসিকায় প্রবেশ করে। সুগন্ধিই একমাত্র 'যম' যা দেখে দুর্গন্ধ পালায়। এছাড়া সুগন্ধি প্রেম-ভালবাসা নিয়ে আসে। স্বামী -স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলে। যৌনমিলনে তৃপ্তি আনে। নিয়মিত ব্যবহারে বীর্যস্তম্ভন ঘটায়। মন প্রফুল্ল হয় এবং দেহ ও মস্তিষ্কের সবলতা আনে। তাই সুগন্ধি ব্যবহার স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানসম্মত।

বিশ্রাম

খাদ্য, পানীয় ও পোশাক-পরিচ্ছদ যেমন শরীরের জন্য অতীব প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন বিশ্রাম। অথচ এর ওপর মানুষ সাধারণত ততটুকু গুরুত্ব দেয় না। এজন্যই শরীরবিজ্ঞানী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) আক্ষেপ করে বলেছেন—

"দুটি সম্পদ সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই অমনোযোগী। একটি স্বাস্থ্য, অপরটি বিশ্রাম।"[১]

ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে HEALTH IS WEALTH

— অর্থাৎ স্বাস্থ্যই সম্পদ।

সম্পদ বলতে আমরা বিশেষভাবে ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, ধান-চাল, গাড়ি-বাড়ি, জমি-জমা ইত্যাদি বুঝি। কিন্তু প্রকৃত সম্পদ যে ভাল স্বাস্থ্য, একথা মোটেই বুঝি না। যার স্বাস্থ্য আছে সে হয়তো বুঝতে পারে না যে তার স্বাস্থ্যের মূল্য কতটুকু। কিন্তু যার স্বাস্থ্য নেই অর্থাৎ রোগগ্রস্ত সে-ই বোঝে এবং অনুভব করে–স্বাস্থ্যহীন জীবন কত অসাড়, পঙ্গু ও মূল্যহীন। সাত তলার ওপর মনোরম সুসজ্জিত কক্ষে আরাম পালংকে শুয়ে যে মাথার ব্যথা বা পেটের ব্যথায় হাউ-মাউ করে কাঁদে আর প্রতিবেশীর গাল শোনে সে-ই বোঝে তার সিন্দুকে আবদ্ধ হীরা-জহরত, প্রবাল, মুক্তা ও সোনা-রূপার মূল্য বেশি না সুশ্রী, সবল, বলিষ্ঠ দেহের মূল্য বেশি? শুকনো রুটি বা পান্তাভাত খেয়ে যারা হাসিমুখে পরিবার নিয়ে দিন কাটায় তারাই সুখী না ঐশ্বর্য সম্পদশালী রাজা-মহারাজা যারা হজম শক্তির অভাবে লেবুর সবরত বা তরল বার্লি পান করে জীবন রক্ষা করে তারাই সুখী? সারাদিন কুলি-মজুরের কাজ করে

পীকা ঃ ১ –৩. সহহি বুখারী। তর্জমা–আবদুররহমান খাঁ। পৃষ্ঠা ৩৯৩-৯৪।

টীকা ঃ ১. সহী বুখারী। তর্জমা–আবদুর রহমান খাঁ। ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৪

www.pathagar.com

ঘর্মাক্ত ও ক্লান্ত দেহে মাটির ওপর যারা মাথার নিচে হাত রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমায় তারাই সুখী, না প্রথম শ্রেণীর বিলাসপ্রিয় অফিসার যিনি মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরার বেদনাহেতু ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে অচেতন হন তিনিই সুখী? স্বাস্থ্যহীন ধনী স্বাস্থ্যবান কাঙালের চাইতেও নিকৃষ্ট। কেননা ধন থাকা সত্ত্বেও যার ফুর্তি নেই, আনন্দ নেই, শরীরে শক্তি নেই, চোখের দৃষ্টি নেই, তার চাইতে অভিশপ্ত আর কে হতে পারে? দুনিয়া তার কাছে কারাগার। আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র তার কাছে বৈরী। তার বুদ্ধির স্থিরতা নেই, মনের শান্তি নেই, সাহস, বল হারিয়ে নির্জীব প্রাণীর ন্যায় সে পরমুখাপেক্ষী হয়। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিদের চরিত্র হয় এর উল্টো। খাওয়া-পরার চিন্তা ছাড়া অন্য কোন দুর্ঘটনার জন্য তারা মোটেই চিন্তা করে না। তাই কাঙাল হয়েও হাসিমুখে আপন স্ত্রীকে নিয়ে গাছের নিচে ঘুমায়।

যে স্বাস্থ্যের অভাবে দুনিয়াকে দোজখ বলে মনে হয় সে স্বাস্থ্যের প্রতি অধিকাংশ লোকই উদাসীন। ধনীরা ধনের লোভে স্বাস্থ্যকে জলাঞ্জলি দেয়। ব্যবসায়ীরা মুনাফার লোভে শরীরের ওপর অত্যাচার করে। ছাত্র-শিক্ষক শিক্ষার ব্রত পালন করতে অনিয়ম করে অকালে বার্ধক্য টেনে আনে। গরিব ব্যক্তি অন্নের আশায় অধিক পরিশ্রম করে ব্যধিগ্রস্ত হয়। কবি, লেখক, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকরা আপনভোলা হয়ে শরীরকে ধ্বংস করে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকেই স্বাস্থ্যের প্রতি এমন অমনোযোগী হতে দেখা যায়। হজরত (দঃ)-এর দূরদৃষ্টি বাস্তব।

আর একটি বিষয়ে আমাদের অমনোযোগী হতে দেখা যায়। সেটা অবসর বা বিশ্রাম। স্বাস্থ্য রক্ষার্থে বিশ্রামের প্রয়োজন যে কত বেশি সেটা বলার প্রয়োজন রাখে না। অথচ এ বিশ্রামের প্রতি মানুষ উদাসীন। নির্বোধ প্রাণীগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়, এ বিষয়ে তারা কত সজাগ। যার যতটুকু অবসর নেবার প্রয়োজন ঠিক ততটুকু নেয়। গরু, ঘোড়া, ছাগল, মহিষ, হাঁস, মুরগি দিনের বেলায় আহারের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু সূর্য অস্তমিত হবার পূর্বে যে যার বাসায় ফেরে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমায়। মৌমাছি সারাদিন এক মিনিটও অবসর গ্রহণ করে না; কিন্তু রাত্রিবেলায় ঘুমায়। ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহে তখন ব্যস্ত থাকে না। অনেক প্রাণী যারা রাত্রিতে আহার সংগ্রহ করে তারা কিন্তু দিনের বেলায় অবসর গ্রহণ করে। শৃগাল, কুকুর, বাঘ, ভল্লুক, এদের দৃষ্টান্ত। কুকুর সারারাত্রি পাহারা দেয়; দিনের বেলায় ঘুমায়। পাখিরা রোদ-বাদলে ভিজে ভিজে সারাদিনে নিজেদের উদর ভর্তি করে ও বাচ্চাদের জন্য সঞ্চয় করে। রাত্রিতে মাটির গহ্বরে অথবা গাছের ডালে বাচ্চাদের নিয়ে ঘুমায়। প্রতিটি প্রাণী দিনে অথবা রাতে অবসর গ্রহণ করে। নিয়মের তারা ব্যতিক্রম করে না। তাই পেটের ব্যথা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, মাথাধরা বা রক্তহীনতায় দুর্বল হয় না, বা রক্তচাপে অবসন্ন হয় না। মানুষ একমাত্র জীব, যারা এ নিয়মকে সঠিকভাবে পালন করে না। তাই অকালে বার্ধক্য দশায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর পুর্বেই মৃত্যুস্বাদ ভোগ করে।

অবসরের প্রয়োজন কি এ কথা যদি কেউ বোঝে, এবং সেভাবে কাজ করে তবে তারা সুখী, সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান হয়। একটানা একটা ইঞ্জিন চললে তার অংশগুলি অতিরিক্ত উত্তাপে অথবা অত্যধিক চাপে ভেঙে যায়। যে ইঞ্জিন দশ বছর চলবে বলে কোম্পানি গ্যারান্টি দেয়, সে ইঞ্জিন যদি ঠিকমতো বিশ্রাম না পায় এবং এর কল-কব্জাগুলিকে সময়মতো পরিষ্কার ও মেরামত করা না হয় তবে ছয় মাসের মধ্যেই তা বিকল হয়ে পড়ে। মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও ঠিক ইঞ্জিনের মতোই। বেশি পরিশ্রমের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায়। বিশ্রামই হারানো শক্তিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। কেননা দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফলে মস্তিষ্কের জীবকোষগুলি আস্তে আস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও দূষিত পদার্থে পূর্ণ হয়। ফলে এগুলি

www.pathagar.com

ক্রমশ নিস্তেজ ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। এই দূষিত পদার্থ সমূহ মস্তিষ্ক হতে নিস্ক্রান্ত না হলে মস্তিষ্কের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না এবং ক্ষয়পূরণও হয় না। জীবকোষগুলিকে উপযুক্ত পরিমাণ অবসর দিলে এরা খাদ্য উপাদান গ্রহণ করতে পারে ও দূষিত পদার্থ নির্গত করতে সমর্থ হয়। এ জন্যই বিশ্রামের প্রয়োজন।

বিশ্রাম বলতে পরিশ্রম হতে অব্যাহতি পাওয়া ও নিদ্রা যাওয়াকেই বোঝায়। তিন-চার ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমের পর এক ঘণ্টা অবসর দেওয়া উচিত। এছাড়া দৈনিক কমপক্ষে চার থেকে ছ ঘণ্টা নিদ্রা গেলে মস্তিষ্কের ক্ষয়পূরণ হয়। নিদ্রা ছাড়া শুধু অবসর গ্রহণে মস্তিষ্কের ক্ষয়পূরণ সম্ভব নয়; কেননা দৈহিক পরিশ্রম না করলে চেতন অবস্থায় মানসিক পরিশ্রম হয়েই থাকে। এ পরিশ্রম হতে অব্যাহতি পাবার একমাত্র উপায় সুনিদ্রা। সুনিদ্রা কেবলমাত্র মস্তিষ্ককে সবল করে না এর ক্ষয়পূরণ করে ও দূষিত পদার্থ নির্গমনেও সাহায্য করে। এজন্যই হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বিশ্রামের ওপর এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন; কোন সময় কতটুকু বিশ্রামের প্রয়োজন এ কথারও উল্লেখ তাঁর বাণীতে মেলে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিনি বিশ্রাম করতেন কিন্তু রাত্রিতে খাবার পর নামাজ পড়তেন। তারপর ঘুমাতেন। আমাদের শরীরবিজ্ঞানীরা তাঁর এ মূল্যবান উপদেশকে উপেক্ষা করতে পারেন না। তাঁরা হজরত (দঃ)-এর এ অমূল্য বাণীকে যাচাই করে দেখেছেন যে, মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পরিশ্রম করার অর্থ লিভারকে হাতুড়ি পেটা করে সম্পূর্ণ অকেজো করে দেওয়া। যারা এ নিয়ম মেনে চলে না, তাদের পেটের বেদনা, লিভারের দোষ ও কামলা রোগে ভুগতে দেখা যায়। রাত্রিতে অবশ্য এর উল্টো ক্রিয়া হয়। রাত্রে খাবার পরক্ষণেই যারা ঘুমায় তারা বদহজম, অগ্নিমান্দ্য, অলসতা, দুর্বলতা রোগে ভুগতে বাধ্য। এজন্যই শরীরবিজ্ঞানীরা বলেন,

"After dinner rest a while
After supper walk a mile."

হজরত (দঃ) যা বলতেন ও নিজের জীবনে পালন করতেন তা বিজ্ঞানসম্মত এ কথা আমি অনেকবার বলেছি। স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিশ্রামের ওপর সামান্য কিছু আলোকপাত করেছি। এবারে তাঁর একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েই এ পরিচ্ছেদ শেষ করছি।

জনৈক সাহাবী বর-বিন-আযির বলেছেন, "নবী (দঃ) যখন শয্যায় আশ্রয় লইতেন তখন ডান কাতে শুইতেন।"[১]

প্রত্যেক শরীরবিজ্ঞানী এ কথা স্বীকার করবেন যে, ডানদিকে কাত হয়ে শোওয়া বিজ্ঞানসম্মত। কেননা বামপাশে হৃদয় অবস্থিত। বাম কাতে শুলে হার্টের ওপর চাপ পড়ে। রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হবার অর্থই শরীর অসুস্থ হওয়া ও মৃত্যুকে ডেকে আনা। শরীরবিজ্ঞান পাঠ করলে এর বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়। তাই এ নিয়ে আর অগ্রসর হচ্ছি না। এবার দেখি রোগ ও তার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা হজরত (দঃ) দিয়েছিলেন।

টীকা ঃ ১ সহীহ বুখারী। (তজরীদুল বুখারী) ২য় খণ্ড, তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ, হাদিস নং ৬/১০০০। পৃষ্ঠা ৫১২।

www.pathagar.com

রোগ ও তার প্রতিকার

"আল্লাহ্ প্রেরণ করেন নাই এমন কোন রোগ, যাহার জন্য প্রেরণ করেন নাই আরোগ্য।"[১]

(মা আন্‌জালাল্লাহু-দায়ান ইল্লা আনজালা লাহু শিফায়ান)

ওপরে বর্ণিত মহাবাণীটি দিয়েছেন শারীরবিজ্ঞানী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। সৃষ্টজীব মাত্রই অসুস্থ হয়; রোগাক্রান্ত হয়। মানুষ, পশুপক্ষী, তরুলতা যারই প্রাণ আছে, দেহ আছে, ক্ষয়-বৃদ্ধি আছে তারই শত্রু আছে। এ শত্রু তার রোগ বা ব্যাধি এ ব্যাধি কত প্রকার এর নিশ্চিত হিসাব কেউ দিতে পারবে না। কেননা এক এক সময়ে এক এক ব্যাধির উৎপত্তি হয়ে থাকে। এক বছর পূর্বে যে ব্যাধি ছিল না, এক বছর পরে সেই ব্যাধির আবির্ভাব দেখা যায়। শরীরবিজ্ঞানীরা তাই ব্যাধির সঠিক হিসাব দিতে পারেন না। তবে কারো কারো মতে, দু লক্ষেরও বেশি ব্যাধি জীবদেহ আক্রমন করে।

ব্যাধি হলে স্বভাবতই মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে। এ ব্যাধির প্রতিকার চাই। রোগে আক্রান্ত হলে নিশ্চুপ থাকা, অদৃষ্টের ওপর ধিক্কার দিয়ে আল্লাহর প্রতি বিরূপ হওয়া বা প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা শুধু বোকামিই নয়, নির্বুদ্ধিতাও বটে। তবে এ কথা সত্য যে, প্রকৃতি আপনা-আপনি যেন এর প্রতিকারের ভার নেয়। জ্বর, মাথা ব্যথা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি, কাশি প্রভৃতি রোগ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেই যেমন হয়ে থাকে, তেমনি নিয়ম পালন করলেই আবার ভাল হয়ে যায়। শতরা ৭০ ভাগ রোগই এ ভাবে হয়ে থাকে, আবার প্রাকৃতিক ওষুধেই ভাল হয়ে যায়।

ওলি, গাউস, নবী-পয়গম্বরগণ সাধারণত রোগের গুরুত্বকে বেশি আমল দেননি। তাঁদের বিশ্বাস, আল্লাহই তাঁদের শাস্তিরূপ এ রোগ প্রেরণ করেন আবার আল্লাহই মুক্ত করেন। এরূপ দৃষ্টান্ত শোনা যায়নি বা দেখা যায়নি তা নয়। ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস সে সাক্ষ্য যুগ যুগ ধরে বহন করে। এর দৃষ্টান্ত পয়গম্বর আইউব (আঃ)। কুষ্ঠরোগে একদিন নয়, দু দিন নয়, দীর্ঘ আঠারো বছর অতিবাহিত করেছেন হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে বনে তবুও চিকিৎসা করেন নি। আল্লাহর কাছে রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনাও করেন নি। এমন সুদৃঢ় বিশ্বাস আমাদের নেই এরূপ ভক্তও আমরা নই। এরূপ সহনশীলতাও আমাদের সম্ভব নয়। কেননা মন ও ঈমান দুটিই আমাদের দুর্বল। এছাড়া সাধক হয়ে, মুনি-ঋষি হয়ে, ওলি-গাউস বা পয়গম্বর হয়ে কয়জনই বা দিন কাটান। সাধারণ মানুষ হয়ে, সংসার জীবন পালন করে স্ত্রী-পুত্রের মুখে দু মুঠো অন্নের সংস্থান করে দেওয়াই যেখানে শতকরা ৯৯.৯ জনেরই ধর্ম, সেখানে সুস্থ ও নীরোগ হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই পঙ্গু, ব্যাধিগ্রস্ত, রোগী ও উন্মাদ লোককে ভালবাসেন না। কেননা এরা আল্লাহর বিধিনিষেধ পালন করতে অক্ষম। সুস্থ মনে সুস্থ জ্ঞানে আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ্ যেমন খুশি হন, যিনি আল্লাহকে ডাকেন তাঁর হৃদয়ও তেমনি শান্তি ও আনন্দে ভরে ওঠে। আল্লাহকে ভালবাসার অর্থ আল্লাহর সৃষ্ট জীবকে ভালবাসা। তাঁর জীবের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা। যারা রোগা তারা নিজেরাই বিকারগ্রস্ত। তারা অন্যের কি উপকার করবে? এজন্যই হজরত (দঃ) হাত তুলে প্রার্থনা করতেন–

টীকা ঃ ১. সহীহ বুখারী। তর্জমা–আবদুর রহমান খাঁ, হাদিস নং ৩/৭৭৫। পৃষ্ঠা ৩৭৩। ও বুখারী শরীফ। তর্জমা–মওলানা শামসুল হক./ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৪।

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ্! আমাকে অপ্রিয় ব্যবহার, কার্য ও বাসনা এবং অনিষ্টকর পীড়া হইতে আশ্রয় দাও।"[১]

"হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা কর। আমার প্রতি দয়া কর। আমায় নীরোগ কর ও রেজেক দান কর।"[২]

বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক হয়ে যাঁর জন্ম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব আনতে যাঁর সৃষ্টি, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য যাঁর শুভাগমন, বিশ্বের অনাচার, অত্যাচার, কদাচার ও রোগমুক্তির পথ নির্দেশ করতে যাঁর আবির্ভাব তিনি কি মানব-সমাজ ছেড়ে বনে, জঙ্গলে পর্বতগুহায় বা নির্জন প্রান্তরে কাটাতে পারেন? মুক্তির থিওরী দিতে, কল্যাণের উপদেশ দিতে ও বিশ্ব সাম্যের জয়গান গাইতেই এসেছিলেন এ মহাবৈজ্ঞানিক হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। চলুন আমরা তাঁর গবেষণাপ্রসূত মুক্তির থিওরী নিয়ে কিছু আলোচনা করি।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন—"জ্বর দোজখের তাপ হইতে আগত। অতএব তোমার ঠাণ্ডা কর উহাকে পানি দিয়া।"[১]

জ্বর একটি পীড়া যা সাধারণত প্রতিটি মানুষকেই আক্রমণ করে। এ পীড়া হতে কেউ জীবনে রেহাই পেয়েছে কিনা বলা কঠিন। যে যতভাবে নিয়ম পালন করুক না কেন এ নিষ্ঠুর পীড়ার হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এর প্রধান উপসর্গ শরীরে উত্তাপ। বিভিন্ন প্রকারের জ্বর আমাদের দেশে সাধারণত দেখা যায়; যেমন, ম্যালেরিয়া, কালা জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড ইত্যাদি। আঘাতজনিত ব্যথা বা অন্য কোন পীড়ার প্রভাবেও শরীরে জ্বর আসে। যেমন, পাকস্থলী উত্তেজিত হলে ফোড়া, পাঁচড়া, কাটা ঘা, চোখের ব্যথা ইত্যাদি হয়। এক কথায় বলা চলে শরীরে রোগজীবাণু প্রবেশ করলে রক্তের শ্বেত কণিকার সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। ফলে স্নায়ুমণ্ডলীতে ভয়ানক আঘাত পড়ে ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপকেই জ্বর বলা হয়। এর প্রধান ওষুধ পানি।

জ্বরে যখন কেউ ছট্‌ফট্ করতে থাকে, মাথার যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে জ্ঞানহারা হয়, তখন ডাক্তারগণ ওষুধ প্রয়োগ করার পূর্বেই পরামর্শ দেন মাথায় পান দিতে। মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলী শীতল হলে জ্বর আস্তে আস্তে কমে আসে। শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত রোগী যখন মস্তিষ্কের যন্ত্রনায় পাগল হয়ে ওঠে তখন কোন ওষুধই কার্যকরী হয় না, যেমন কার্যকরী হয় পানি। পানিই একমাত্র উপাদান যা অসহ্য যন্ত্রনার উপশম করে।

পানির ব্যবহার আমরা জানি না। পানির ওপর রিসার্চ করলে হয়তো দেখা যেত যে শুধু পানি দিয়েই শত শত রোগকে নিরাময় করা যায়। ঠাণ্ডা, গরম, ঈষদুষ্ণ বা বাষ্পীয় অবস্থা বিভিন্ন রোগে প্রযোজ্য। পানি দিয়েই সর্ববিধ ওষুধ তৈরি হয়। শরীরের অভ্যন্তরে ঢুকে এ পানিরই ক্রিয়া সাধিত হয়। পানির বিভিন্ন অবস্থার ধারবাহিক নিয়ম পদ্ধতি তুলে ধরে যদি কেউ 'জলবিদ্যা' বা 'পানিবিধি' নাম করে নতুন কিছু জাতিকে দিতে পারত তাহলে মানব-সমাজ মুক্তির পথ খুঁজে পেত এতে কোন সন্দেহ নেই। যে পানিতে সৃষ্টি হয়েছে শুরু, সে পানি যে কি আশ্চর্য উপাদান, সে পানি যে আরোগ্যের কেমন দৃঢ় মহৌষধ সে কথা বিজ্ঞানীদের কাছে বলার বা বিশ্লেষণ করার সুযোগ রাখে না।

হজরত (দঃ) বলেছেন, "প্লেগ এক শাস্তি যাহা পাঠান হইয়াছিল বনি ইসরাইল বা যাহারা তোমাদের পূর্বে গত হইয়াছে তাহাদের উপর। যখন তোমরা কোন স্থানে উহার কথা শোন,

---

টীকা ঃ ১. তিরমিজি।

২. সগির। সংগৃহীত মুহাম্মদ আজহারউদ্দিন, এম. এ., হাদিসের ২য় খণ্ড। হাঃ নং ১৩ ও ১০।

টীকা ঃ ১. সহীহ বুখারী। তজমা আবদুর রহমান খাঁ। সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ১৭৪।

www.pathagar.com

যাইও না উহার কাছে এবং যখন উহা আসিয়া পড়ে কোন স্থানে আর তোমরা থাক সেখানে, পালাইও না সেখান হইতে।"[১]

ছোঁয়াচে ও মারাত্মক রোগের মধ্যে 'প্লেগ' অন্যতম। আমাদের দেশে অবশ্য এ রোগ সাধারণত দেখা যায় না। Bacillus Peslis নামক রোগজীবাণু দ্বারা এ রোগ সংক্রামিত হয়। এ রোগের সৃষ্টি হয় ইঁদুর থেকে মহামারী রূপে। প্রথমে ইঁদুর আক্রান্ত হয় এবং দেখতে দেখতে ইঁদুরের বংশ নির্বংশ হয়। যখন ইঁদুর মারা যায় তখন মাছি এর বীজ বহন করে অন্য ইঁদুরের ওপর পড়ে। ইঁদুর না পেলে মানব শরীরে বসে ও এর বীজ ঢুকিয়ে দেয়। তিন হতে দশ দিনের মধ্যেই রোগী ভয়ানক আক্রান্ত হয়ে পড়ে ও মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

প্লেগ তিন প্রকার–(১) Bubonic plague ঃ এতে গ্রন্থিগুলি আক্রান্ত হয়। বগলের ও কুচকির গ্রন্থি ফুলে উঠে ভয়ানক বেদনা ও জ্বর হয়। (২) Pneumonic Plague ঃ এতে ফুসফুস আক্রান্ত হয় এবং কফ-রক্ত নির্গত হয়। (৩) Septicaemic (সেপটিসিমিক) plague ঃ এটাই অত্যন্ত মারাত্মক। বিষের যন্ত্রণায় রোগী জ্ঞানহারা হয় এবং অল্পক্ষণেই মারা যায়।

এ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দানে যেমন শত শত লাশ পড়ে থাকে, প্লেগের আক্রমণেও ঠিক তেমনি হয়। হজরত মাহাম্মদ (দঃ) জানতেন যে, এমন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলে বাঁচার কোন আশা নেই। তাই সাবধান করে দিয়েছেন সেখানে যেতে, যেখানে প্লেগে আক্রান্ত রোগী আছে। আবার আক্রান্তদেরও নিষেধ করেছেন সেখান হতে পালিয়ে সুস্থ সমাজে ঢুকতে। তাঁর এ উপদেশ মানলে শুধু আক্রান্তরাই মরবে কিন্তু নতুন ভাবে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষের জীবন যাবে না।

শরীরবিজ্ঞানীরা এ মারাত্মক ব্যাধি হতে রক্ষা পাবার যে ক'টি পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন, সে নির্দেশ রসুল (দঃ)-এর নির্দেশের সঙ্গে ভিন্নতর নয়। শরীরবিজ্ঞানীদের মতেও এটাই পাওয়া যায়।

(১) ইঁদুর ধ্বংস করতে হবে। (২) প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিলে সঙ্গরোধ ব্যবস্থা দৃঢ়তর করতে হবে। (৩) সুস্থ লোককে গ্রামের বাইরে কিছুদিনের জন্য বসবাস করতে হবে। (৪) রোগীর মলমূত্র, শ্লেষ্মা, কফ, থুথু বিশোধন করতে হবে। (৫) রোগীকে মশারির ভেতর রাখতে হবে। (শরীরবিজ্ঞান হতে সংগৃহীত)।

প্লেগের মতো মারাত্মক ব্যাধি সম্বন্ধে হজরত (দঃ)-এর আরও দু-একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেছেন–"নাই কোন অশুভ ছোঁয়াচে,পেঁচাতে বা সফর মাসে কিন্তু দূরে থাক কুষ্ঠ রোগী হইতে যেমন তুমি দূরে থাক বাঘ হইতে।"[১]

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত–"এক আরাবী বলিল, হে রসুলুল্লাহ! আমার উটগুলি কেন এরূপ হয় যখন তাহারা থাকে মরুতে তাহারা থাকে হরিণের মতো। যখন এক খুজলীওয়ালা (চর্মরোগ) উট মিলে উহাদের সহিত খুজলীওয়ালা করিয়া দেয় উহাদের। তিনি বলিলেন, তবে কিসে ছোঁয়াচ দিয়েছিল প্রথম উটকে।"[২]

অন্যত্র বলেছেন, "রুগ্ন উটকে লইয়া যাইও না সুস্থ উটের নিকট।"[৩]

টীকা ঃ ১. সহীহ বুখারী। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ২৬২।

টীকা ঃ ১. সহীহ বুখারী। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা ৩৭৮।

২. সহীহ বুখারী। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা ৩৭৯ ও ৩৮৪।

৩. সহীহ বুখারী। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা নং ৩৮৪।

www.pathagar.com

খোস, পাঁচড়া, খুজলী, কুষ্ঠ এগুলি ছোঁয়াচে রোগ। স্পর্শেই রোগজীবাণু বিস্তার লাভ করে। শ্লেষ্মা, কফ, থুথু, ক্ষতরোগ, মলমূত্র ইত্যাদিতে রোগজীবাণু থাকে। তাই এসব রোগী হতে দূরে থাকা নিরাপদ।

হজরত (দঃ) ছোট, বড়, কালো, সাদা, ধনী, গরিব প্রভৃতির পার্থক্য করেন নি। সেখানে সাম্যের গান গেয়েছেন। মানুষে মানুষে একসূত্রে গেঁথে দেবার থিওরী দিয়েছেন। এক থালায় বসে আহার করা, এক জামায়াতে নামাজ পড়া, একসঙ্গে পরামর্শ করা, রোগীর বিছানায় উপবেশন করার পর্যন্ত নির্দেশ দিয়েছেন **অথচ কুষ্ঠ রোগীকে দেখে বাঘের চাইতেও বেশি ভয় করতে বলেছেন**। তাঁর এ নির্দেশ কি শরীরবিজ্ঞানীদের হতবাক করে দেয় না? তাঁর এ মহামূল্যবান উপদেশ বাণীটি কি এটাই প্রমাণ করে না যে তিনি ছিলেন সর্বযুগের এক অমর শরীরবিজ্ঞানী?

ছোঁয়াচে রোগ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কত স্পষ্ট, রুগ্ন উট ও কুষ্ঠ রোগীর উপমা এর সাক্ষ্য দেয়।

Lepra Bacillus (লেপ্রা ব্যাসিলাস) কুষ্ঠ রোগের জীবাণু– যা শরীরের চামড়ার ওপর ক্রিয়া করে। এর ফলে শরীরে ক্ষত হয়, প্রবাহ জন্মে, পুঁজ নির্গত হয়, শরীরের রং কুৎসিত হয়ে ফুলে ওঠে। রোগীর ক্ষতরস কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র রোগবিস্তারে সহায়তা করে। এ জন্যই কুষ্ঠরোগী হতে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন শরীরবিজ্ঞানী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। এই কুষ্ঠরোগীদের রেশমী বস্ত্র পরতে নির্দেশ দিয়েছেন। পুরুষের জন্য যেখানে রেশমী বস্ত্র হারাম সেখানে কুষ্টরোগীদের জন্য বিধিসম্মত বলা তাঁর প্রজ্ঞা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় বহন করে।

প্রতিকার

"লে কুল্লে দায়ে দাওয়াউন ফা এজা উছিবা দাওয়াউন দ্দায়া বারিয়া বেজনেল্লাহে।"[১]

অর্থাৎ প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ আছে। সঠিকরূপে রোগের ওপর পড়লে আল্লাহর হুকুমে আরোগ্য লাভ হয়।

আল্লাহ্ জীবজন্তুর জন্য যেমন রোগ প্রেরন করেছেন, প্রতিকারেরও তেমন ব্যবস্থা দিয়েছেন। প্রতিটি তরুলতারই এক একটা কার্যকারিতা আছে। হয় বিষের ক্রিয়া করে নয়তোবা বিষ ধ্বংস করে। কোনটি দেহকে সুস্থ ও সবল করে, কোনটি রোগজীবাণু আনয়ন করে, কোনটিবা রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করে। এ মহাবিশ্বে যে অগণিত সৃষ্টি তা উদ্দেশ্য বিহীন নয়, অহেতুক নয়। প্রত্যেকটির পেছনে আছে গূঢ় রহস্য ও উদ্দেশ্য। কোরআন পাকও একথারই সাক্ষ্য দেয়।

"ওয়া মা খালক্না সামওয়া ওয়াল্ আরদা ওয়া মা বায়নাহুমা বাতিলান।"[২]

অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুকে আমি বৃথা সৃষ্টি করি নাই। হজরত (দঃ)-এর বাণীতেও আমরা এরই প্রতিধ্বনি দেখতে পাই। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ

টীকা ঃ ১ . মোসলেম। সংগৃহীত– মওলানা শামসুল হক কর্তৃক তর্জমা বুখারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩।
২ . কোরআন– সূরা জোমর।

www.pathagar.com

এমন কোন রোগ প্রেরণ করেন নি যার জন্য প্রেরণ করেন নি আরোগ্য।'–অর্থাৎ এ কথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, যে কোন রোগ তা যত কঠিনই হোক না কেন তার আরোগ্য বিধানকারী ওষুধ আছে। এ বিষয়ের ওপর ব্যাপক আলোচনা সম্ভব নয়। রসুল (দঃ)-এর কয়েকটি মাত্র বাণী শরীরবিজ্ঞানীদের উপহার দিচ্ছি। আশা করি বাণীগুলির ওপর ব্যাপক গবেষণা করে তাঁরা মানব জাতিকে আরোগ্যের পথ দেখাবেন।

হজরত (দঃ) বলেছেন–

"আরোগ্য তিনটি জিনিসে ঃ (১) মধুর সরবতে, (২) সিঙ্গা লাগানোতে, (৩) আগুনের দাগ দেওয়াতে। কিন্তু আমি আমার উম্মতগণকে নিষেধ করিতেছি আগুনের দাগ দেওয়া হইতে।"[১]

মধুর গুণাগুণ নিয়ে আমার সাধ্যানুযায়ী "বিজ্ঞান না কোরআন" পুস্তকে রসায়নবিজ্ঞান পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। তাই এর পুনরুক্তি করতে চাই না। কোরআন যেখানে বলেছে **"মধু আরোগ্যের দৃঢ় উপাদান।"**[২]

আর রসুল (দঃ) বলেছেন, 'মধু শ্রেষ্ঠ আরোগ্যকারী' সেখানে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। স্বাস্থ্য গঠনকারী, প্রতিরোধ বিধানকারী, মস্তিষ্ক উর্বরতাকারী, স্নায়ুমণ্ডলী সতেজকারী, পাকস্থলী আরোগ্যকারী, যৌনশক্তি বৃদ্ধিকারী, দুর্বলতা হরণকারী, দৃষ্টিশক্তি আনয়নকারী, এ মহৌষধ অদ্বিতীয়, তুলনাবিহীন। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসের বর্ণনা দিচ্ছি।

"এক ব্যক্তি রসুল (দঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল,
'আমার ভাই-এর পেটের অসুখ হয়েছে।'
রসুল (দঃ) বললেন, 'মধু সেবন করতে বল।'
লোকটি দ্বিতীয়বার বললে রসুলুল্লাহ (দঃ) বললেন,
'মধু সেবন করতে বল।'
তারপর সে আবার এসে বলল,
'ভাইকে মধু সেবন করিয়েছি।'
রসুল (দঃ) বললেন,
'খোদার কথা মিথ্যা নয়, মিথ্যা তোমার ভাইয়ের পেট। যাও সেবন করতে বল।'

লোকটি চলে গেল। তারপর তার ভাইকে মধু সেবন করতে দিল এবং সে ভাল হয়ে গেল।"[১]

মানবজাতিকে মধু সেবনের উপদেশ দিয়েই এ মহাজ্ঞানী ক্ষান্ত হন নি, এর গুণাগুণ নিজে যাচাই করতে প্রতিদিন মধু সেবন করতেন।

'মধু এবং মাংসই ছিল হজরত (দঃ)-এর প্রিয় খাদ্য।'[২]

হজরত (দঃ)-এর মধু পান সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। অনেকেই হয়তো তা জানেন। হজরত (দঃ) মধুকে অত্যন্ত বেশি পছন্দ করতেন বলে একদা তাঁর পত্নিগণ বুদ্ধি করলেন যে রসুল (দঃ)-কে মধুপান থেকে বিরত করতে হবে। যার কাছে যাবেন তিনিই যেন বলেন যে, রসুল (দঃ)-এর মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়েছে। তাই তাঁর পাশে থাকা যায় না।

টীকা ঃ ১. সহীহ বুখারী। তর্জমা আবদুর রহমকান খাঁ। ২য় খণ্ড হাঃ নং২৭৭৬। পৃষ্ঠা ৩৭৩।
২. কোরআন–সূরা নহল।
টীকা ঃ ১. সহীহ বুখারী (তজরীদুল বুখারী)। তর্জমা–মওলানা শামসুল হক, হাঃ নং ৩.২৭৭, পৃষ্ঠা ২৭৪।
২, সংগৃহীত– সৌভাগ্যের পরশমণি, পৃষ্ঠা ১২৯।

www.pathagar.com

একদিন হজরত (দঃ) তাঁর বিবিদের মধ্যে বিবি আয়েশা ও বিবি হাফসার নিকট গেলে তাঁরা দুজনই একই কথা বললেন, আপনার মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। আপনি মধু সেবন বন্ধ করুন।

এ কথায় হজরত (দঃ) নির্বাক হয়ে গেলেন। চিরদিনের অভ্যাস মধুপান কি তবে তিনি ছাড়বেন–এ কথা চিন্তা করছিলেন। এরপর নাজেল হল কোরআনের অমোঘ বাণী–

"আর তোমার প্রভু মৌমাছির প্রতি নির্দেশ করিয়াছেন–পাহাড়, বৃক্ষ এবং সকল উচ্চস্থানে মৌচাক নির্মাণ কর। তারপর রকম বেরকমের ফুলের মধু খাইতে থাক। অতঃপর চলতে থাক তোমার প্রভুর দেখান সহজ পথসমূহে। বাহির হইয়া থাকে তার পেট হইতে বিভিন্ন বর্ণের পানীয়। **তার মধ্যে আছে মানুষের জন্য আরোগ্যের দৃঢ় উপাদান।** নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে চিন্তাশীল জাতির জন্য।" (সূরা নহল,আয়াত, ৬৮, ৬৯)

যুগ যুগের যিনি অমর বৈজ্ঞানিক, মানবমুক্তির সর্বপ্রকার থিওরী হাতে যাঁহার আবির্ভাব, তাঁকে বোকা বানাবে কার সাধ্য? হজরত (দঃ)-এর বিবিদের কৌশল টিকল না। মধু চিরজনমের জন্য আরোগ্যের উপাদান বলে প্রমাণিত হয়ে থাকল। তাই ডাক্তার, কবিরাজ ও বৈদ্যগণ এ মধুকে অবলম্বন করেই তাঁদের যত কৃতিত্ব ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন আর প্রমাণ করলেন হজরত (দঃ)-এর অমোঘ বাণী।

শিঙ্গা লাগান–হজরত (দঃ)-এর এ নির্দেশকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ হয়তো মানতে পারেন না। কেননা সিঙ্গা লাগানোর পরিবর্তে তারা অস্ত্রের ব্যবহার করেন। Surgical Operation -এ আধুনিক চিকিৎসাবিদগণ যে সফলতা অর্জন করেছেন তা যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি উপকারী। ওষুধে যে রোগ আরোগ্য হয় না অস্ত্রোপচারে তা সম্ভব।

চোদ্দশ' বছর আগে যখন বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটেনি, অভিযান ও আবিষ্কার যখন ছিল সীমাবদ্ধ, চিকিৎসাবিদ্যায় মানুষ যখন ছিল অপরিদর্শী–তখন শিঙ্গা লাগানোর পদ্ধতিই যে আরোগ্যের অন্যতম এক কৌশল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রত্যক্ষভাবে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করার এই শিঙ্গা লাগান পদ্ধতিই পরবর্তীকালে চিকিৎসকদের অস্ত্রোপচারের বুদ্ধি শিখিয়েছে। যেখানে অস্ত্রধারণ দরকার সেখানে হজরত (দঃ) দোয়া, তাবিজ ও ওষুধ সেবনের ব্যবস্থা দেননি–দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক এক পদ্ধতি। দিয়েছেন রোগ নিরাময়ের এক কৌশল, যে কৌশলে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ।

আগুনের দাগ– শরীর অভ্যন্তরে এমন কতকগুলি জটিল রোগের সৃষ্টি হয় যা অস্ত্রোপচার বা ওষুধে আরোগ্য হয় না। আগুনের সেঁক, দাগ বা উত্তাপের মাধ্যমেই এ সব রোগজীবাণুকে ধ্বংস কতে হয়। চোদ্দশ' বছর পূর্বের এ নির্দেশ আজ বিংশ শতাব্দীতে সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা ইলেকট্রিক শক দিয়ে পাগল, ক্যান্সার ও ক্ষত রোগীদের আরোগ্য করা হচ্ছে।

এছাড়া প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আগুনের সেঁক বা দাগ দিয়ে কিভাবে রোগমুক্ত করা যায় ডাক্তার ও কবিরাজগণ তা ভালভাবেই বলতে পারেন। এ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন করিনি। তাই সুন্দর সুন্দর পন্থা উল্লেখ করে পাঠকদের খুশি করতে পারছি না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

আগুনের সেঁক– (১) পাথরকুচি পাতার সোজা দিকে রেড়ির তেল মাখিয়ে আগুনে সেঁকে উত্তপ্ত করার পর ফোড়ার ওপর বেঁধে রাখলে ফোড়া কয়েকদিনের মধ্যেই পেকে যায়। অবশ্য তিন-চারদিন পর্যন্ত এভাবে আগুনে সেঁক দিতে হয়।

www.pathagar.com

(২) ধুতরার পাতা রোদে শুকিয়ে শুকিয়ে চূর্ণ করার পর উক্ত চূর্ণে আগুন ধরালে যে ধোঁয়া বের হয় তা নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলে শ্বাসরোগের উপশম হয়।

(৩) পাথরের বাটিতে এক তোলা তেলাকুচা পাতার রস রেখে একটি লোহা আগুনে পুড়িয়ে এতে ডোবাতে হয়। এরপর উক্ত রস কাশির চিনিসহ সেবন করলে রক্ত আমাশয় রোগ ভালো হয়।

(৪) কুকশিমা বা কুকুর শোকার পাতা আগুনে সেঁকে শোথগ্রস্ত রোগীর ফোলাস্থানে লাগালে শোথরোগ আরোগ্য হয়।

(৫) শিঙি মাছে কাঁটা দিলে ক্ষতস্থানে কিছুটা ঘি মালিশ করে আগুনের সেঁক দিলে ব্যথা কমে যায়।

আগুনের সেঁক দিয়ে এরূপভাবে কত শত রোগের উপশম হয় তার হিসাব দেওয়া কঠিন। আগুনের সেঁক রোগ নিরাময়ের এক অব্যর্থ পন্থা।

আগুনের দাগ-বিষাক্ত জন্তুর দংশনে রোগী নিমেষেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বিষের ক্রিয়ায় অল্পক্ষণেই মারা যাবারও সম্ভাবনা থাকে। এ বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে সারাদেহে প্রসার লাভ করে ও রক্তকে জমাট করে দেয়। ফলে ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হয়। আগুনের দাগ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে ফলপ্রদ। হাজার হাজার রোগীকে এভাবে বাঁচানো হয়েছে এবং হচ্ছে। প্রত্যক্ষভাবে আগুনের দাগ দেবার ব্যবস্থা আমাদের ডাক্তার ও কবিরাজগণ কিভাবে দিয়েছেন তার দু-একটি পন্থা এখানে উল্লেখ করছি।

(১) "বাঘ, ভালুক, শৃগাল ঘোড়া, ইঁদুর প্রভৃতি হিংস্র জন্তু দংশন করলে লোহার শলাকা আগুনে গরম করে সেঁক দিতে হবে। এতেবিষ নষ্ট হবে এবং পরে কোন উপসর্গ দেখা দেবে না।"[১]

(২) "ইঁদুর বা বিড়ালে কামড়ালে, দংশনের স্থানে লোহাগরম করে সেঁক দেবে।"[১]

(৩) "ছুঁচো কামড়ালে যত শীঘ্র সম্ভব লোহা পুড়িয়ে দংশিত স্থানে সেঁক দেবে।"[২]

(৪) "কাউকে সাপে কামড়ালে লোহার শিক লাল করে পুড়িয়ে দংশনের স্থানে লাগালে বিষ নষ্ট হয়। এ কাজ খুব তাড়াড়ি করা দরকার।"[৩]

(৫) "বিছার দংশনে তালপাতা পুড়িয়ে সেঁক বা তাপ দিয়ে জ্বালার উপশম হয়।"[৪]

এরূপ অসংখ্য ব্যবস্থা আমাদের চিকিৎসকগণ দিয়ে থাকেন। এসব ব্যবস্থা কার্যকরী বলে সর্বত্রই প্রমাণিত হয়েছে।

শারীরবিজ্ঞানীদের মতে, রোগজীবাণুকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়াকে Disinfection বা বিশোধন বলে। রোগজীবাণু বিশিষ্ট বস্তুগুলোকে সাধারণত তিনটি উপায়ে বিশোধন করা হয়।

প্রথম–Natural Disinfection বা প্রাকৃতিক উপায়ে।

দ্বিতীয়–Application of heat বা উত্তাপ দ্বারা।

তৃতয়ি–By Chemical Methods বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা।

উত্তাপ দ্বারা যেসব রোগজীবাণু ধ্বংস করা হয় তাদের মধ্যে অগ্নিসংযোগই প্রধান বা শ্রেষ্ঠতম উপায়। রোগজীবাণু বিশিষ্ট বস্তু পুড়িয়ে ফেললে রোগ সংক্রমণের আর কোন উপায় থাকে না।

টীকা ঃ ১ . মোঃ মোয়েজউদ্দিন হামিদী কর্তক 'সর্পদংশন ও বিষ চিকিৎষা' পুস্তক হতে সংগৃহীত। পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৪, ৪৬ ইত্যাদি।

টীকা ঃ ১ –৪. মোঃ মোয়েজউদ্দিন হামিদী কর্তৃক 'সর্পদংশন ও বিষ চিকিৎসা' পুস্তক হতে সংগৃহীত। পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৪, ৪৬ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এছাড়া সেদ্ধ জল, উত্তপ্ত বায়ু বা উত্তপ্ত বাষ্প দ্বারাও রোগজীবাণু ধ্বংস করা যায় কিন্তু শতকরা একশ' ভাগ গ্যারান্টি দেওয়া যায় না।

যে অঙ্গ আগুনে পোড়ান হয় বা ইলেকট্রিক সক দিয়ে নিরাময় করা হয়, সে অঙ্গ সাময়িক সুস্থ হলেও পরবর্তীকালে অক্ষম ও অবশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্যই হজরত (দঃ) আগুনের দাগ দেওয়াকে নিষেধ করেছেন এবং বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত না করে বিকল্প ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। তাঁর নিম্নোক্ত বাণী এ কথারও সাক্ষ্য দেয়।

হজরত (দঃ) বলেনে, "আমি আমার উম্মতকে নিষেধ করিতেছি আগুনের দাগ দেওয়াইতে।"[১]

"তোমরা যে সব ওষুধ ব্যবহার কর তাহার মধ্যে শিঙ্গা লাগান ও জলস কুস্ত উত্তম এবং বলিলেন, তোমরা শিশুদের কষ্ট দিও না শিঙ্গা দ্বারা বরং ব্যবহার করিও কুস্ত।"[২]

হজরত (দঃ)-এর ওপরে বর্ণিত বাণী ও এতদসঙ্গে আমার বিশ্লেষণ অনেকের কাছেই Contradictory বলে মনে হবে। আগুনের দাগ দিয়ে রোগমুক্ত করা যায় এর পন্থা হজরত (দঃ) দিয়েছেন, আবার আগুনের দাগ দিতে মানা করেছেন কেন? ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন দেখলে এই কেনর জবাব পাওয়া যায়। রোগী বিশেষে ইনজেকশন দেওয়া জরুরি মনে হয়তো তিনি Calcium বা Arovit ইনজেকশনের নাম উল্লেখ করলেন। এরপর ভাবলেন যে ইনজেকশনে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে বা রোগী সহ্য করতে পারবে না। তখন নিচেই alternate বলে Calcium tablet বা Arovit tablet -এর নাম উল্লেখ করলেন। রোগের প্রয়োজনবোধে ইনজেকশন দিতেই হবে আর ইনজেকশন দেবার অনুকূল ব্যবস্থা না হলে তার বিকল্প ব্যবস্থাও দিতে হবে, এটাই চিকিৎসকদের নিয়ম। হজরত (দঃ) সেরূপ নিয়মেরই নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিকল্প ব্যবস্থা তাঁর অসাধারণ জ্ঞানেরই বহিঃপ্রকাশ।

জলস কুস্তঃ –পানির সেক বা উত্তপ্ত পানির ব্যবহার।

রসায়ন বিজ্ঞান পরিচ্ছেদে পানির ব্যবহারবিধি, পানির গুণাগুণ, পানির বৈশিষ্ট্য, পানির অপরূপ মাহাত্ম্যের কথা লিখতে চেষ্টা করব।

তাই এর ওপর আর আলোচনা করছি না।

আধুনিক বিজ্ঞানের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে Electrical ও Surgical -এর সঙ্গে হজরত (দঃ)-এর দুটি পদ্ধতির মিল দেখা যায়–

আগুনের সেঁক ও শিঙ্গা লাগান। এবারে দেখব বর্তমান বিজ্ঞান Chemical Science অর্থাৎ Medicine Chapter -এর কিছু অংশ হজরত (দঃ)-এর বাণীর মধ্যে খুজে পাই কিনা। Medicine-এর প্রথমেই দেখলাম হজরত (দঃ)-এর জলস কুস্ত (Application of water)।

ঠাণ্ডা, গরম বাষ্পীয় যে কোন অবস্থায়ই পানি রোগের তারতম্য অনুযায়ী ব্যবহৃত হয় ও হাজার হাজার রোগকে নিরাময় করে। ডাক্তার, কবিরাজ, হেকিম,বৈদ্য প্রথম এবং প্রধান ওষুধ বলে একে ব্যবহার করেন। পানির ব্যবহারবিধির কথা বলে হজরত (দঃ) নিজেকে Chemical Scientist বলে প্রমাণ করলেন।এবার দেখি দ্রব্যের ওপর কি রিসার্চ করেছেন এবং Medicine হিসাবেই বা কিভাবে স্থান দিয়েছেন।

টীকা ঃ ১. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড (তজরীদুল বুখারী)। তর্জমা মওলানা শামসুল হক, হাঃ নং৫/৭৭৯।
২ . সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড (তজরীদুল বুখারী)। তর্জমা মওলানাশামসুল হক, হাঃ নং ৩৫৩০, পৃষ্ঠা ১৫০।

www.pathagar.com

হজরত (দঃ) বলেছেন–"এই কালোদানা সব রোগের ওষুধ 'সাম' ছাড়া (সাম অর্থ মৃত্যু)।"[১]

কালোদানা –অর্থ কালোজিরে। হিন্দি ভাষায় একে 'মঙ্গলবইল' বলে, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বলে 'কালেজীরা', তেলুগু ভাষায় 'কল্লজীর'। তাহলে দেখা যায় সর্বদেশেই এ কালোজিরে জন্মে। এ দানা দেখতে সুন্দর না হলেও, রুচিকর খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও রোগমুক্তির দিক থেকে অদ্বিতীয়। এমন মহোপকারী দ্রব্য পৃথিবীতে কমই সৃষ্টি হয়েছে। এর সত্যিকারের গুণাগুণ আমরা জানি না। আমরা শুধু সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, গলা ব্যথা বা কপাল ব্যথার জন্য এটাকে ব্যবহার করি। কিন্তু এটা যে সর্ব রোগের মহৌষধ তা আমরা জানতাম না। প্রবীণ হেকিমগণ এর ওপর রিসার্চ করে বলেছেন, 'ইহা ঘটুরস, উষ্ণবীর্য, রুক্ষ, সুগন্ধি, রুচিকারক, মলরোধক অগ্নিবর্ধক ও চক্ষুর উপকারক এবং জীর্ণ জ্বর, কফ, শোথ, শিরপীড়া ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

আধুনিক হেকিম,কবিরাজ ও কেমিস্টগণ এ কালোজিরে হতে হাজর হাজার রোগের আরোগ্যকারী ট্যাবলেট ও টনিক তৈরি করছেন। যে সব রোগে কালোজিরে ব্যবহৃত হয় তার সামান্য দু-একটা এখানে তুলে ধরছি।

(১) মাথাধরা–কালো জিরে ন্যকড়ার মধ্যে পুরে মর্দন করে ঘ্রাণ নিলে মাথাধরা আরোগ্য হয়।

(২) কালো জিরে বেঁটে গরম পানির সহিত সেবন করলে **পাগলা কুকুরের দংশনজনিত বিষ আরোগ্য হয়।**

(৩) কালো জিরে পানিতে সিদ্ধ করে কুলি করলে দন্তরোগ দূর হয়।

(৪) কালো জিরে, রক্তচন্দন, অহিফেনও মদসাশিজের ছালের রসের সঙ্গে পিষে গরম করে প্রলেপ দিলে গলা ফোলা আরোগ্য হয়।

(৫) কালো জিরে দুধের সর-সহ পিষে প্রলেপ দিলে বিখাউজ, একজিমা রোগ আরোগ্য হয়। কুষ্ঠ এবং অন্যান্য ঘাজাতীয় রোগ কালো জিরের ব্যবহারে (বিভিন্ন উপায়ে) আরোগ্য হয়।

কালো জিরের ওপর বিশেষ গবেষণা দরকার।

হজরত (দঃ)-এর আরও কয়েকটি বাণী নিম্নরূপ-"তোমরা ব্যবহার করিও এই ভারতীয় কাঠ আগর, কেননা ইহা সাত রোগের ওষুধ। ইহা নাকে দেওয়া হয় উথরা অর্থাৎ শিশুদের গলরোগে কাত করিয়া খাওয়ান হয় পার্শ্ব বেদনায়...।"[১]

"বেঙের ছাতা মন্নের প্রকারবিশেষ এবং উহার পানি চক্ষুরোগের মহৌষধ।"[২]

"তলবীনা শান্ত করে রোগীর হৃৎপিণ্ড এবং উপশম করে শোক।"[৩]

এরূপ একটি দুটি নয়, শত শত ওষুধের সন্ধান তিনি দিয়েছেন। কত গুরুত্বপূর্ণ এ হাদিসগুলি। হৃৎপিণ্ড, চক্ষুরোগ প্রভৃতি কেমন সুন্দর আরোগ্যকারী ওষুধের সন্ধান দিলেন। রোগে, শোকে, অনিদ্রা ও অনাহারে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই হৃৎপিণ্ডের রোগে আক্রান্ত হয়। **তলবীনা বা যবের যাউ** যা অতি সাধারণ বলে আমরা মনে করি,তার মধ্যেই যে হৃৎপিণ্ড সবলকারী ওষুধ নিহিত এ তত্ত্ব একজন নিরক্ষর নবী (দঃ) কি করে জানলেন তা চিন্তা করলে কি আশ্চর্য মনে হয় না?

টীকা ঃ ১ . সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড (তজরীদুল বুখারী), তর্জমা মওলানা শামসুল হক, হাঃ নং ৪/৭৭৮; পৃঃ ৩৭৪-৭৫।

টীকা ঃ ১ . সহহি বুখারী, ২য় খণ্ড (তজরদ্দিল বুখারী)। তর্জমা–মওলানা শামসুল হক, হাঃ নং ৫/৭৬৯।

২ . সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, হাঃ নং ৩.৫৩০। পৃষ্ঠা ১৫৮।

৩ . সহীহ বুখারী, ২য খণ্ড (তজরদুিরল বুখারী)। তর্জমা–মওলানা শামসুল হক, হাঃ নং ১৪/৪১২।

www.pathagar.com

সামান্য কয়েকটি মাত্র বাণী বিশ্লেষণ করে আমাদের এ ধারণা হলো যে, রোগ প্রতিকারের জন্য তিনি অস্ত্রোপচার (Surgical Operation) এবং ওষুধ (Medicine) দুটোকেই পাশাপাশি স্থান দিয়েছেন। যখন যেটার প্রয়োজন সেটাই করা দরকার।

আধুনিক বিজ্ঞানী ও আমাদের মতো নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা একটি শক্তিকে মোটেই আমল দেন না। অথচ প্রতিকারের দিক থেকে এ শক্তিও যে প্রবল তা তাদের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য ও অমূলক বলে মনে হলেও এ দেশের শতকরা নব্বই জন লোকই তা বিশ্বাস করে আর বিশ্বাস করে বলেই সে শক্তি ব্যবহার করে গুরুতর অসুখের হাত থেকে রক্ষা পায়। এ শক্তি ঐশীশক্তি। এবারে এ শক্তির ওপরই কিছু আলোচনা করব।

ঐশীশক্তি

ঝাড়-ফুঁক, আধ্যাত্মিক বা মানসিক শক্তিবলে যে শক্তি অর্জন করা হয় তাকেই ঐশীশক্তি বলে। এ শক্তিবলে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করে, দুরারোগ্য ব্যাধিকে আরোগ্য করে, শত্রুকে প্রেমের ডোরে আবদ্ধ করে; হিংস্র জীবজন্তুকে বশে আনে, স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটিয়ে দেয়, ভূত-প্রেত, জীন-পরী অদৃশ্য শক্তিগুলিকে দমন করে।

মহাবৈজ্ঞানিক রূপে জন্ম নিয়েও, আধুনিক হতে সর্বাধুনিক মানব হয়েও হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এ 'ঐশীশক্তিকে' অবিশ্বাস করেননি। বরং নিজে এ শক্তিকে প্রয়োগ করে এর ফলাফল মানুষকে দেখিয়েছেন এবং পরবর্তী বংশধরদের এ শক্তি প্রয়োগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নে এর কয়েকটি প্রমাণ উত্থাপন করছি।

আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, "রসুলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে (বা অপরকাহাকেও) বলিয়াছেন দৃষ্টিতে (বা কু-নজরে) কোরআনের আয়াত পড়াইতে।"[১]

উম্মে সালমা বলেছেন, "হজরত (দঃ) তাঁহার বাড়িতে একটি বালিকার মুখে কিছু চিহ্ন দেখিয়া বলিলেন, **"উহার জন্য কোরআনের আয়াত পড়াও–কেননা তাহার দৃষ্টির ব্যারাম হইয়াছে।"**[২]

অন্যত্র আয়েশা(রাঃ) বলেছেন, "নবী (দঃ) যে কোন বিষধর জীবের দংশনে আয়াতে করিমা পড়াইবার অনুমতি দিয়াছেন।"[৩]

আনাস বিন-মালিক (রাঃ) বলেন, "রসুলুল্লাহ্ (দঃ) এক আনসারী পরিবারকে আয়াতে করিমা পড়াইতে অনুমতি দিয়াছিলেন বৃশ্চিক দংশনে ও কানের বেদনায়।"[৪]

আয়েশা (রাঃ) অন্যত্র বলেছেন, নবী (দঃ) রোগীকে বলতেন, **"আল্লাহর নামের বরকতে আমাদের মাটির ধুলি আমাদের কাহারও থুথুর সহিত মিলিত হয় আর আরোগ্য লাভ করে আমাদের রোগী খোদার হুকুমে।"**

এর চাইতে বেশি উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল যে অমর বৈজ্ঞানিক আয়াতে করিমাকে বিশ্বাস করতেন কিনা এবং নিজে এর ব্যবহার করতেন কিনা।

আমরা প্রত্যক্ষভাবেই দেখতে পাই যে, সাপ বা যে কোন বিষধর প্রাণীর দংশনে শুধু বাঙালী, পাকিস্তানী বা ভারতীয়গণই নয়, প্রায় দেশের মানুষই মন্ত্রের ব্যবস্থা নেয়। এর চাইতে কার্যকরী আর কোন ওষুধ আমরা আপাতত দেখি না। মন্ত্রে কি করে এমন মারাত্মক বিষ নষ্ট হয়, তা না দেখলে অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করতে পারবে না। যারা দেখেছে বা নিজেরা

টীকা ঃ ১ -৪. সহীহ বুখারী (তজরীদুল বুখারী)। তর্জমা–মওলানা শামসুল হক, ২য় খণ্ড–চিকিৎসা পরিচ্ছেদ, হাঃ নং ১৩/৭৮৭, ১৪/৭৮৮ ১৬/৭৯০. ১৮.৭৮৪। পৃষ্ঠা ৩৭৯-৩৮২।

www.pathagar.com

এ ব্যবস্থা নিয়েছে তারা আধুনিক চিকিৎসকদের পুরো প্রাধান্য দেবে না। কেননা চিকিৎসকগণ কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে বা লোহা গরম করে পোড়ান, বিষকে মুরগির বাচ্চা বা অন্য কোন প্রকারে টেনে নেওয়া, সিরিঞ্জ দিয়ে দূষিত রক্ত তুলে ফেলা, দংশিত স্থানকে চিরে দেওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। সে ব্যবস্থা মন্ত্রের মতো অতটা কার্যকরী নয়। বিষাক্ত সর্পদংশনকৃত রোগীদের সব সময় ডাক্তারগণ সুস্থ করতে পারেন না। ডাক্তারদের সাপে কামড়ালেও 'ওঝা' বা মন্ত্রসাধকেরই প্রয়োজন হয়, ডাক্তার নয়। এ বিদ্যাকে কোন ডাক্তার, কোন বৈজ্ঞানিক বা কোন কবিরাজই অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা, এটা গাঁজাখোরী কোন গল্প নয়; আরব্য উপনাসের কাহিনীও নয়। লক্ষ লক্ষ সর্পদংশনকৃত রোগী 'ওঝাদের' হাতেই আরোগ্য লাভ করছে। শুধু তাই নয়, বহু ক্ষেত্রে শোনা গেছে ডাক্তারদের দেওয়া ওষুধের পরিবর্তে রোগীকে 'ওঝারা' মন্ত্রগুণেই ভাল করেছেন। একটি দুটি নয়, বহু প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকেই এ গল্প শুনে মন্ত্রসাধনাকারীদের ওপর স্বভাবতই ভক্তি ও শ্রদ্ধা আসে। সাপুড়ে যারা, তারা সাপকে নিয়ে কত খেলাই না খেলে! সাপের গলা ধরে, লেজ ধরে, ফণা বা যে কোন জায়গাতে হাত দিয়েই সাপের খেলা দেখায়। হিংস্র এ মারাত্মক প্রাণীকে তার গর্ত থেকে টেনে বের করা, কথামতো নাচান, ইশারার সঙ্গে বাক্সে ঢোকান, এসব অপূর্ব খেলা কোন এফ. আর.সি. এস. অথবা এম. আর. সি. পি. বিলাত ফেরত ডাক্তার দিয়ে সম্ভব নয়। আমাদের মতো কবি, লেখক ও সাহিত্যিকদের কথা কবিতায়ও এরা ভোলে না। অথচ একজন মূর্খ ওঝার আদেশকে ওরা কত ভয় করে। এদের এমন অপূর্ব শক্তিকে দেখেও কি কোন জ্ঞানী লোক অস্বীকার করবেন যে ঐশীশক্তির কোন প্রভাব নেই? কুফরী কালামের ঐশীশক্তিতে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব থাকলেও তা দ্বারা চিকিৎসা করানো যায়েজ নয়।

আমার বাবার মুখে শুনেছি আমাদের বাড়ির পাশের (বগুড়া জেলার ধুনট থানার শিমুলবাড়ি গ্রাম) এক গ্রামে সমীর মণ্ডল নামে এক বিখ্যাত সর্প চিকিৎসক ছিলেন। এত বড় পাণ্ডিত্য সাপের ওপর বাংলাদেশে আর কেউ দেখাতে পেরেছে বলে কারো জানা নেই। মন্ত্র দিয়ে শুধু হাজার হাজার রোগীকে ভাল করেন নি, সাপকে হাজির করতেন ও দংশনকারী সাপকে দিয়ে বিষ তুলিয়ে নিতেন। একবার নাকি মন্ত্রযোগে সাপের Exhibition করে-ছিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। কয়েক ঘণ্টা মন্ত্রপাঠ করার পর শূন্য থেকে, পার্শ্ব থেকে চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের সাপ এসে হাজির হতে লাগল। মাঠের মধ্যে বৃহৎ এক চক্রাকৃতি করে তার মাঝ থেকে তিনি মন্ত্রপাঠ করলেন আর এ চক্রের বাইরে থাকলেন দারোগা, পুলিশ, সরকারী অফিসার, কর্মীবৃন্দ ও হাজার হাজার দর্শক। যখন সাপ আসতে লাগল, তখন ভয়ে সবাই দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। তিনি সবাইকে স্থানচ্যুত হতে মানা করলেন এবং গ্যারান্টি দিলেন যে, সাপ কাউকে কামড়াবে না। হয়েছেও ঠিক তাই। কয়েকটি ডেকচিতে রাখা দুধ এরা পান করল। একটি আর একটির ওপর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করল। ফোঁস ফোঁসানিতে এক শোরগোল সৃষ্টি হলো, কিন্তু সাপ অরাজকতা, অনিয়ম, অবাধ্যকতা, বিশৃঙ্খলা বা হিংসার বশবর্তী হয়ে একটি লোককেও কামড়ালো না। শুনেছি, কয়েকদিন পর্যন্ত এ সাপ মাঠে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামে ছিল। এরপর আস্তে আস্তে এদিক ওদিক সরে গেল। এ ঘটনার পর অনেক বছর পর্যন্ত ঐ ওঝার বাড়ির চতুর্দিকে বহু সাপ বিদ্যমান ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে এ ঘটনা উদ্ধৃত করলাম।

এ ঘটনা বিবৃতির পেছনে আর কোন যুক্তি নেই। আছে শুধু এটাই যে, হিংস্র পশু-পক্ষী, ভূত-প্রেত, জানা অজানা কু-দৃষ্টিকারী শয়তান বা ক্ষতিকারক কোন এজেন্টের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে অপারেশন বা মেডিসিন নয়, ঐশীশক্তি প্রয়োজন। বিভিন্ন জাতি এ ঐশীশক্তি বিভিন্ন উপায়ে অর্জন করে। কেউ সাধনা দ্বারা, কেউ কোরআন বা নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ দ্বারা, কেউ বা গাছ-গাছড়ার গুণাবলী দ্বারা। এ ঐশীশক্তিকে অস্বীকার করা শুধু গোঁড়ামিই নয়, সত্যের অপলাপ করা। কুফরী কালামের ঐশীশক্তির দ্বারা কোন রকম চিকিৎসা করা প্রযোজ্য নয়।

www.pathagar.com

সাপের সম্মুখে বিশিষ্ট কোন গাছের শেকড় বা পাতা ধরলে সাপ মাথা নত করে পালায়। কোরআনের বাণী বলে অলৌকিক ঘটনা ঘটানো যায়। যাদুমন্ত্র বলে মানুষ বা জীবজন্তুকে পাথরে রূপন্তরিত করা যায়, এ সব ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটানো সম্ভব। আমি নিজেও এর প্রত্যক্ষদর্শী। নিজেকে তাই মিথ্যাবাদী বা ভণ্ড অবিশ্বাসী বলে সাব্যস্ত করতে পারি না। মনকে ফাঁকি দিয়ে নিজের সামান্যতম বিদ্যাবুদ্ধিকেও জলাঞ্জলি দিতে পারি না। আমার অধীনস্থ একজন সুহৃদ, সত্যভাষী, অমায়িক, সুন্দর আকৃতি-প্রকৃতি বিশিষ্ট কর্মচারী, নাম 'আহসান উদ্দীন' কোরআনের বাণীর ওপর যে রিসার্চ করেছেন এবং অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছেন তা দেখে শুধু আমি নই, আমার চেয়ে অনেক বড় জ্ঞানী-গুণী -পণ্ডিত -শিক্ষক -ছাত্র, বিজ্ঞানের অধ্যাপক সাহেবগণও অবাক হয়েছেন। অবাক হয়েছেন ডাক্তার, কবিরাজ ও বিশিষ্ট হেকিমগণ। প্রতিদিনি শত শত রোগী তাঁর কাছে ভিড় করে। শত শত রোগী আরোগ্য লাভ করে ধন্য হয়। অপারেশন করে নয়, ওষুধ নিয়ে নয়, শুধু ঐ বাণীর অলৌকিক ক্ষমতাবলে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেন, যা সেরা ডিগ্রীধারী ডাক্তাররা করতে ব্যর্থ হন। আমার নিজের চোখে দেখা দু-একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। পাঠকবৃন্দ একটু ধৈর্য ধরে দেখুন কেমন রোগ, কেমন চিকিৎসা, কি অদ্ভুত চিকিৎসক।

এক– আজ থেকে প্রায় চার বছর আগের কথা। রংপুর পলিটেকনিকের একজন ছাত্র, নামটি আমার স্মরণ নেই, পরীক্ষার হলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়। তার বন্ধু-বান্ধব এবং শিক্ষকগণ তাকে আবাসিক হলে নিয়ে যান এবং সেবা-শুশ্রূষা করেন জ্ঞান ফেরে না দেখে ডাক্তার ডাকেন। ডাক্তার ওষুধ প্রয়োগ করেন ও ইনজেকশন দেন। ছেলেটির জ্ঞান ফিরে আসে, কিন্তু সুদীর্ঘ সাতদিন পর্যন্ত জবান বন্ধ থাকে। কোন কথা উচ্চারণ করতে পারে না। সবাই তখন ছেলেটিকে নিয়ে প্রমাদ গোনে। ডাক্তারও তখন কোন রোগের লক্ষণ খুঁজে পান না। রুগ্ন ছেলেটি তার যা প্রয়োজন কলমের মাধ্যমে লিখে জানায়। বন্ধু-বান্ধবগণ তার কথা অনুযায়ী কাজ করে। একদিন ঘুম থেকে উঠে ছেলেটি তার এক বিশিষ্ট বন্ধুকে লিখে জানায় যে, সে স্বপ্নে দেখেছে এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি তাকে ফুঁক দিয়ে ভাল করেছে। তার বন্ধুগণ একথা জেনে ছেলেটিকে নিয়ে বিকাল চারটায় আমার অফিসে আসে এবং আহসান সাহেবকে দেখায়। আহসান সাহেব বেশ কিছুক্ষণ ছেলেটির দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন এবং স্পষ্ট স্বরে কোরআন পাঠ করতে থাকেন। এরপর ছেলেটির হাত ধরে 'বিসমিল্লাহ্' বলতে বলেন। কি আশ্চর্য! আহসান সাহেবের হাত স্পর্শ করা মাত্রই যেন ইলেকট্রিক কারেন্ট তার শরীরে সক দিতে থাকে। এরপর 'আল্লাহ'–'আল্লাহ' উচ্চারণ করতে বলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এ বাকরুদ্ধ ছেলেটির কণ্ঠে 'বিসমিল্লাহ্' ও 'আল্লাহ্' শব্দ বেরিয়ে এলো। আপনার নাম কি জিজ্ঞাসা করায় ছেলেটি তৎক্ষণাৎ নাম বলে দিল। উক্ত ঘটনার সময় আমি বাইরে চেয়ার নিয়ে বসেছিলাম ও আমার সুপারভাইজার সাহেবদের নিয়ে একটি জরুরি বিষয় আলোচনা করছিলাম হঠাৎ হৈ-চৈ ও চিৎকার শুনে তাকাতেই দেখি দশ-বারো জন ছাত্র, আমার কয়েকজন কর্মী ও আহসান সাহেব বাইরে এলেন। আমার কাছে আসতেই আহসান সাহেব ছেলেটিকে বললেন, 'ওনাকে সালাম করো। ছেলেটি আমাকে সালাম করল। সালাম নিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কি? তখন ছেলেটি নিজ মুখেই ঘটনাটি ব্যক্ত করল। বলল গত এক সপ্তাহের ইতিহাস। দেখাল তার হাতের দুটি পাখনা, যেখানে কমপক্ষে ৭টি ইনজেকশন দেবার ফলে ব্যথায় হাত দুটি নড়াতে পারছে না। ডাক্তারগণ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ছেলেটিকে কথা বলাতে পারেন নি। পারেন নি পরিষ্কার করে জিহ্বায় আলোড়ন এনে দিতে ও তার মুখে হাসি ফোটাতে। এ অসম্ভবকে সম্ভব করলেন আহসান সাহেব। একজন অতি সামান্য ওয়্যারলেস অপারেটর তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে, কোরানের অলৌকিক মাহাত্ম্যবলে। শ্রদ্ধায় নত হয়ে গেল আমার শির, ভক্তিতে উথলিয়ে পড়ল আমার হৃদয়। স্নেহ ও ভালবাসায় জুড়িয়ে গেল আমার পাষাণ

www.pathagar.com

বুক ঐ একটি নামে 'আহসান সাহেব'। কে বলে ফুঁক দিয়ে ভাল হয় না? কে বলে মন্ত্র দিয়ে যন্ত্রের কাজ চলে না? কে বলে ঐশীশক্তিতে রোগ নিরাময় হয় না?

গল্প নয়, কাহিনী নয়, মুখরোচক কোন কথাও নয়। যা লিখছি সত্য ঘটনা। ধার করে নিয়ে লিখি না। এছাড়া বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) বই লিখছি। এমন এক মহামানব ও বৈজ্ঞানিকের বাণী বিশ্লেষণ করছি যা চিরসত্য, চির আদরিত ও চির প্রমাণিত। যুগ যুগের জন্য এ বাণী অমর ও অক্ষয়।

দুই-পূর্বে বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল আমার প্রথম ছেলেকে নিয়েই। এই ঘটনাটি তুলে ধরলে আশা করি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সবার কাছে আশ্চর্যান্বিত বলে মনে হবে যে মন্ত্রের সাধনা বা কোরআনের অলৌকিক মহিমায় মহিমান্বিত ব্যক্তিদের ঝাড়-ফুঁক কেমন বিদ্যুৎবেগে কাজ করে।

আমার প্রথম ছেলে, নাম আলমগীর, পাশের ঘরে পড়াশুনা করছিল। কয়েকদিন পূর্ব থেকে গলার স্বরটা তার ভাঙা ভাঙা হয়েছিল। আমি তখন বসে বসে লিখছি। এমন সময় পাগলের মতো ছুটে এলো আমার কাছে। কথা বলতে পারছে না। শুধু গলা দেখাচ্ছে। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি চোখ থেকে টস টস করে পানি পড়ছে। আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এমন সময় পেছন থেকে মেজো ছেলে শাহাদত বলে উঠল, 'আব্বা। ভাইজান কথা বলতে পারছে না। পড়তে পড়তে কথা বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ আমি হতবাক হয়ে পড়লাম কি করব ঠিক করতে পারছি না। একবার ভাবলাম আদা দিয়ে গরম চা খেতে বলি। আবার ভাবলাম দারুচিনি, গোলমরিচ এবং লবঙ্গ পানিতে গরম করে কুলি করতে বলি। এ ধরনের অনেক চিন্তাই মাথার মধ্যে খেলে যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ মনে হলো আহসান সাহেব অফিসেই ডিউটি করছে তাঁর কাছে আগে পাঠিয়ে দিই। টেলিফোন তুলে সব ঘটনা তাঁকে বললাম। উনি বললেন, 'আলমগীরকে পাঠিয়ে দিন।' তাঁর কথামতো ছেলেটিকে পাঠালাম। এর মধ্যে ওর মা হাউ মাউ করে কাঁদাকাটা শুরু করল। আমিও নির্বাক হয়ে বসে থাকলাম। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান হাসিমুখে ফিরে এলো আমার ছেলে, দিব্যি কথা তার জিহ্বার আগায় নিয়ে। আমি যদিও বেকুবের মতো বসেছিলাম তবুও মনে আমার এ বিশ্বাস ছিল যে, আহসান সাহেবের কাছে গেলে ইনশাল্লাহ্ আমার ছেলে ভাল হবে। হলোও ঠিক তাই। ওদের হাসিতে আমার মুখেও হাসি ফুটল। শুকুর আদায় করলাম আল্লাহর দরবারে।

দু-এক আনার লেখাপড়া করতে গিয়ে আমরা আপন সত্তাকে হারিয়ে ফেলি। হারিয়ে ফেলি নিজেকে। হারিয়ে ফেলি নিজের ঈমানকে। যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তারা অবিশ্বাসে-অবিশ্বাসে শেষে অবিশ্বাসী হয়েই দাঁড়ায়। এরূপ অবিশ্বাসের মাঝে আমিও যথেষ্ট হাবুডুবু খেয়েছি। সেদিন আর অবিশ্বাস করতে পারলাম না। কে যেন এক চরম শিক্ষা আমাকে দিয়ে গেল। ঐশীশক্তিকে বিশ্বাস করলাম। কোরআনের ওপর অগাধ ভক্তি আনলাম। সর্বশক্তিমান আল্লাহর অপার শক্তি-মহিমার প্রমাণ দেখে অবিশ্বাসীদের ওপর অবিশ্বাস আনলাম। আর কোরআনের সাধক আহসান সাহেবকে হৃদয়ের অফুরন্ত শক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ঝাড়-ফুঁক ও দোয়া-তাবিজের কথা লিখতে গিয়ে দুটি অপ্রাসঙ্গিক গল্প লিখে ফেললাম। এবারে দেখি হজরত (দঃ) নিজ জীবনে এরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়েছেন কিনা। কোন অলৌকিক শক্তি বা মোজেজা দেখিয়ে আমাদের এ বিষয়ের ওপর চিন্তা ও সাধনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন কিনা।

আবদুল্লাহ (রাঃ) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, "আমরা কোন সফরে রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন পানির অভাব হইল। তিনি বলিলেন, 'বাছা একটু পানি তালাস করিয়া আন।' সাহাবীরা একটা পাত্র আনিল। উহাতে সামান্য কিছু পানি ছিল। তিনি ঐ পাত্রে নিজের হাত রাখিয়া বলিলেন, 'আস এই পবিত্র ও মঙ্গলময় পানির কাছে এবং এই বরকত খোদার তরফ হইতে আসিয়াছে।'

www.pathagar.com

আমি দেখিলাম রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর অঙ্গুলির মধ্য দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতেছে। এবং আমরা খাদ্যের তসবী পড়া শুনিয়াছি যখন উহা খাওয়া হইত।"[১]

চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত, সূর্যের গতি নিয়ন্ত্রণ করা, আবু জেহেলকে গভীর কূপ থেকে হাত বাড়িয়ে তুলে নেওয়া এসব অলৌকিক ঘটনা হজরত (দঃ) কোন্ শক্তিবলে করেছিলেন এবং বিজ্ঞানীদের তাক লাগিয়েছিলেন? ওষুধ দিয়ে নয়, গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ দিয়ে নয়, অসি বা মসি দিয়ে নয়, অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করেও নয়, সাধনা বা ঐশীশক্তি যাই আমরা বলি না কেন, যা কোরআন থেকে শিক্ষালাভ করতে হয় সেই শক্তি বলেই তিনি এমন সব মহাঘটনা সংগঠন করেছিলেন।

ঐশীশক্তি ও অলৌকিক শক্তি যে আছে, যার প্রভাবে মানুষ বা পশু-পক্ষী রোগগ্রস্ত হয় আবার ঐ শক্তিবলেই আরোগ্যলাভ করে একথা এখন আমরা প্রমাণের ভিত্তিতেই বিশ্বাস করি। আর বিশ্বাস করি এর প্রতিক্রিয়ামূলক ব্যবস্থা। রোগ এবং ব্যবস্থা পাশা-পাশি না থাকলে এ বিশ্ব অচল হয়ে যেত। হয়তোবা মৃত্যুতে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে দুনিয়া অন্ধকার হতো নয়তোবা অগণিত মানুষের চাপে মানুষই মানুষ ধরে খেত। যতক্ষণ পর্যন্ত আরোগ্যকারী কোন উদ্ভিদ সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রোগ উৎপন্ন হয় না। রোগ এবং প্রতিকার যেন একই মায়ের দুটি সন্তান, যাদের একই রক্ত অথচ ভিন্ন চরিত্র। এজন্যই হজরত (দঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্ এমন কোন রোগ প্রেরণ করেন নি যার জন্য ওষুধের ব্যবস্থা নেই। অতএব রোগের প্রতিকার কর।"

যাদুবিদ্যা বা অদৃশ্যশক্তি যে সত্যই আছে কোরআন তার প্রমাণ দেয়। এ বিদ্যাও শিখতে হয়। এর ওপর পি-এইচ. ডি. বা ডক্টরেট ডিগ্রী না নিয়েও যাদুরকর পি সি সরকার লাখ লাখ এরূপ ডিগ্রীধারী বৈজ্ঞানিককে ও ডাক্তারকে পাথরের মতো নির্বাক করে দাঁড়িয়ে রাখতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকরাও টের পেলেন না কোন সময় তারা যাদুর প্রভবে আকৃষ্ট হতে চলেছেন। শুনেছি এরূপ অনেক ঘটনা। শুনেছি পি সি সরকার বিলেতের এক অনুষ্ঠানে সময়মতো উপস্থিত না হওয়ায় অনেকেই ভীষণ রেগে যান এবং বাঙালী চরিত্রে কটাক্ষপাত করতে থাকেন। যাদু-সম্রাট এ কথা শুনে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তিনি ঠিক সময়ে এসেছেন। তাদের অভিযোগ অন্যায়।' সবাই এ কথা শুনে অত্যন্ত রেগে যান কিন্তু নিজেদের হাতের ঘড়ি দেখে অবাক হয়ে পড়ল। এটাই নাকি ছিল তাঁর যাদুবিদ্যা প্রদর্শনীর প্রথম খেলা।

অনেকেই হয়তো মনে করবেন, লিখতে গিয়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি অথবা মাতালের মতো আবোল-তাবোল বকছি, তা নয়। যাদু ও অদৃশ্য শক্তির প্রভাবকে বোঝাতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলে ফেললাম। এবার দেখুন যাদুর শুরু কোথায়?

হজরত সোলায়মান (আঃ)-এর সময়ে শয়তানেরা লোকদের যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। লোকেরাও আনন্দের সঙ্গে সে বিদ্যা আয়ত্ত করত। কেননা তাদের ধারণা ছিল যে সোলায়মান (আঃ) যাদুবলে, জ্বিন-পরী, দেব-দৈত্য প্রভৃতি আয়ত্তে আনতেন, বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতেন, জীবজন্তুর সঙ্গে কথা বলতেন, হাওয়ার মধ্যে ভ্রমণ করতেন। তাই তাদের মতে যাদুবিদ্যা ধর্মদ্রোহী নয়।

কথিত আছে যে, বাইবেলে **'হারুত ও মারুত'** নামক দুজন ফেরেশতা লোকদের মায়াবিদ্যা শিক্ষা দিতেন এবং লোকদের বলে দিতেন যে এ বিদ্যা শিক্ষা করেই তাঁদের অধঃপতন ঘটেছে ও কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু লোকেরা সে কথা শুনত না। তার ফেরেশ্তাদের নিকট হতে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করত।

টীকা ঃ ১ সহহি বুখারী। তজর্হমা–আবদুর রহমান খাঁ। কোরেশের মর্যাদা পরিচ্ছেদ, হাঃ নং ৩১/৩২৩ পৃষ্ঠা ২৯৩-৯৪।

www.pathagar.com

হারুত ও মারুত ফেরেশ্‌তা হয়ে কি করে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতেন এ কথায় অবশ্য সবারই মনে কিছুটা খটকা লাগবার কথা। এ দুজন অপরাধী ফেরেশ্‌তা। চিরদিন এরা নাকি দুনিয়ার বুকেই থাকবেন এবং প্রলয়ের পূর্বদিন পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করবেন। ঘটনার পেছনে কি রহস্য আছে সেটা বলা কঠিন। তবে অনেকের ধারণা নিম্নরূপঃ

'হারুত ও মারুত ফেরেশ্‌তাদ্বয় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলেন যে, তাঁদের অনুমতি দিলে তাঁরা এ পাপ-পঙ্কিল পৃথিবীতে নেমে আসবেন এবং দেখবেন যে কেন মানুষ পাপকার্যে লিপ্ত হয়। তাঁরা স্বচক্ষে এ ঘটনা দেখে প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করবেন এবং আল্লাহর কাছে তা পেশ করবেন। আল্লাহ্‌ তাঁদের এ প্রার্থনা কবুল করেন। ফেরেশ্‌তাদ্বয় মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসেন। সাধারন মানুষের বেশে তাঁহারা সবার সঙ্গে তাই মেলামেশার সুযোগ পান। একদা **'জহুরা'** নাম্নী এক পরমা সুন্দরীর রূপে ও গানে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যায়। শেষে তাকে কাছে পাবার ও ভোগ করার ইচ্ছায় পাগল হয়ে ওঠেন। সুচতুরা জহুরা তাঁদের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের নিকট হতে **'এসমে আজম'** বা 'আল্লাহ্‌' নামের তপস্যা শিক্ষা করে চতুর্থ আসমানে উঠে যায়। ফেরেশ্‌তাদ্বয় তাঁদের লোভ-লালসা ও কামরিপু চরিতার্থের যে বাসনা পোষন করেছিলেন তার জন্য তাঁহারা আল্লাহর কোপে পতিত হন। ফলে পৃথিবীতেই তাঁদের চিরবাসস্থান স্থির করা হয়। কথিত আছে যে, তাঁদের পাপের ফলে তাঁরা পর্বত গুহায় এখনও ঝুলছেন এবং প্রলয়ের পূর্বদিন পর্যন্ত এভাবে ঝুলতেই থাকবেন। এ ঘটনার সত্যতা কতটুকু তা নিয়ে বিভিন্ন ধর্মমনীষীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে কোরআনে এ সম্বন্ধে যা উল্লেখ আছে তা নিম্নরূপ ঃ

"এবং সোলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানেরা যাহা আবৃত্তি করিত তাহারা উহারই অনুসরণ করিতেছে। এবং সোলায়মান অবিশ্বাসী হন নাই, কিন্তু শয়তানেরাই অবিশ্বাস করিয়াছিল। তাহারা লোকদিগকে যাদুবিদ্যা এবং যাহা বাবেলে 'হারুত মারুত' ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা শিক্ষা দিত। এবং তাহারা উভয়ে কাহাকেও উহা শিক্ষা দিত না। এমনকি তাহারা বলিত যে আমরা পরীক্ষাধীন ব্যতীত নহি। অতএব তোমরা অবিশ্বাস করিও না। অনন্তর যাহাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় তাহারা উভয়ের নিকট তাহা শিক্ষা করিত এং তাহারা আল্লাহর আদেশ ব্যতীত তদ্দারা কাহারো অনিষ্ট সাধন করিতে পারিত না। এবং তাহারা উহাই শিক্ষা করিতেছে যাহাতে তাহাদের ক্ষতি হয়। এবং তাহাদের কোন উপকার সাধিত হয় না। নিশ্চয় তাহারা জ্ঞাত আছে অবশ্য যে, যে কেউ উহা ক্রয় করিয়াছে তাহার জন্য পরকালে কোনই লাভ নাই। এং যদ্বিষয়ে তাহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছে তাহা নিকৃষ্ট যদি তাহারা উহা জানিত।"[১]

যাদুমন্ত্রে যারা আক্রান্ত তারা ওষুধে নিরাময় হয় না। যাদু ধ্বংসকারী কৌশল বা কোরানের বাণী দিয়েই কেবলমাত্র সে রোগ আরোগ্য করা যায়। হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ওপর এরূপ যাদুর প্রভাব হয়েছিল বলেই তিনি এর সাংঘাতিক ফলাফল জানতেন। তাই যুগ-যুগের অমর বৈজ্ঞানিক হয়েও যাদুক্রিয়া বা কু-দৃষ্টিকে অবিশ্বাস করেন নি। এর প্রতিকারের জন্য মন্ত্র পড়াতে বলেছেন। এর উদ্ধৃতি পূর্বেই দিয়েছি। হজরত (দঃ)-এর ওপর যাদুর প্রভাব কেমন হয়েছিল, কি ভাবেই বা তিনি এ প্রভাব থেকে মুক্ত হলেন এ রহস্য সবাই জানে, তাই লেখবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। তবে এটুকুই জেনে রাখা দরকার যে সূরা 'ফালাক' ও সূরা 'নাস' অবতীর্ণের কারণই ছিল হজরত (দঃ)-কে যাদুমুক্ত করা। হজরত আয়েশা (রাঃ) এর প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে। তিনি বলেছেন, "যাদু করা হইয়াছিল রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে। তাহার খেয়াল হইত যে তিনি কিছু করিয়াছেন যদিও তিনি উহা করেন নাই। অবশেষে একদিন তিনি বার বার দোয়া করিলেন তারপর বলিলেন, (আয়েশা) 'তুমি জান কি খোদা আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন কিসে আমার আরোগ্য হইবে?

টীকা ঃ ১. কোরআন ঃ সূরা বাকারাহ, রুকু ১২, আয়াত ১০৪।

www.pathagar.com

দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসিল, তাহাদের একজন আমার মাথার কাছে বসিল এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে। তারপর একজন অপরজনকে বলিল, 'কি ব্যারাম এই ব্যক্তির?' সে বিলল, 'ইহাকে যাদু করা হইয়াছে।' (প্রথম ব্যক্তি) বলিল, 'কে যাদু করিয়াছে?' (দ্বিতীয়) বিলল, 'লবীদ ইবনে আসম।' (প্রথম ব্যক্তি) বলিল, 'কিসের দ্বারা?' দ্বিতীয় বিলল, **'চিরুনি, রশি ও পংখুর্মা বৃক্ষের মুকুলের খোশা দ্বারা।'**

(প্রথম ব্যক্তি) বলিল, 'কোথায় উহা।' (দ্বিতীয়) বলিল, 'যরওয়ান (নামক) কুয়ার ভিতরে।' অতঃপর নবী (দঃ) ঐ কুয়ার নিকট গেলেন এবং ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আয়েশাকে বলিলেন, উহার (নিকটস্থ) খুরমা বৃক্ষ যেন সাপের মাথা।' তখন আমি বলিলাম, আপনি তুলাইয়াছেন কি উহা?' তিনি বলিলেন, 'না খোদা আরাম দিয়াছেন আমাকে। আমি ভয় করিলাম, উহা লোকদের মধ্যে গোলযোগ বিস্তৃত করিবে। তারপর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এ কুয়া।"[১]

এবার দেখি হজরত (দঃ) কাউকে ঝাড়-ফুঁক দিতেন কিনা এবং ফুঁক দিয়ে কোন রোগ আরোগ্য করেছেন কিনা।

সালামা-ইবনে আওয়া (রাঃ), যিনি খায়বারের যুদ্ধে হজরত (দঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন, তিনি এই বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন ঃ

"খায়বারের দিনে আমি আঘাত পাইয়াছিলাম জঙ্ঘায়। তারপর আসিলাম নবী (দঃ)-এর নিকট। তিনি তিনবার ফুঁক দিলেন ঐ স্থানে এবং আজ পর্যন্ত আমার কোন অভিযোগ হয় নাই উহাতে।"[২]

রোগের প্রতিকার কর–সে ফুঁক, মন্ত্র, ঐশীশক্তি, ওষুধ বা অস্ত্রোপচার যে কোনটা দিয়েই চলে। হজরত (দঃ) নিজেও ওষুধ সেবন করেছেন এবং অপরকেও করতে বলেছেন। এ কথা আমরা জানতে পারি আয়েশা (রাঃ)-এর উক্তি হতে। তিনি বলেছেন ঃ

"রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর পীড়ার মধ্যে (অর্থাৎ মৃত্যুর পুর্বে) তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইয়াছিলাম। তিনি ইশারায় বলিয়াছিলেন, 'আমাকে ওষুধ খাওয়াইও না।' আমরা বলিলাম, 'তিনি ওষুধের তিক্ততা হেতু এরূপ বলিতেছেন।' যখন তিনি একটু সুস্থ হইলেন, বলিলেন, 'আমি কি তোমাদের নিষেধ করি নাই আমাকে ঔষধ খাওয়াইতে? আমরা বলিলাম, 'আমরা মনে করিয়াছিলাম রোগীর ওষুধের প্রতি বিরাগ-বশত আপনি উহা করিয়াছেন।' তিনি বলিলেন, **'বাড়ির সকলকে ওষুধ খাইতে হইবে** এবং আমি উহা দেখিব একমাত্র আব্বাস ব্যতীত কেননা তিনি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন না।"

এ ঘটনাটি ছিল তাঁর মৃত্যুর পূর্বের। তিনি সমগ্র মানব জাতিকে মন ও আত্মার ওষুধ দিয়ে যেমন চিরজীবী করতে চেষ্টা করেছেন, শরীরকে সবল, সুস্থ ও রোগমুক্ত করতেও তেমনি ওষুধ বা প্রতিকারের ব্যবস্থা দিয়ে শারীরবিজ্ঞানীরূপে নিজকে প্রমাণ করেছেন। চলুন, আমরা তাঁর আদেশ, উপদেশ, নির্দেশিত পথ ধরে শরীর বিজ্ঞানী হই ও মানবজাতিকে রোগমুক্ত করে তাদের মুখে হাসি ফোটাই।

উপহার বাণী

'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)' বইটি প্রকাশিত হবার পর যেসব মহান লেখক, ওলি-গাওস, কবি-সাহিত্যিক, ছাত্র-শিক্ষক, জ্ঞানী-গুণী, ভাই-বোনেরা দেশ-বিদেশ থেকে আমাকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা, অভিনন্দন, শ্রদ্ধাঞ্জলি ও উপহার বাণী দিয়ে ধন্য করেছেন তাদের কাছে

টীকা ঃ ১ সহীহ বুখারী। তর্জমা–আবদুর রহমান খাঁ। হাঃ নং ৩৭/২০৩। পৃষ্ঠা ৯৬/৯৪।

২. সহীহ বুখারী। তর্জমা–আবদুর রহমান খাঁ; বিভিন্ন যুদ্ধ পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা ১৫৫।

www.pathagar.com

আমি কৃতজ্ঞ। এ সব মুল্যবান বাণীগুলা ফাইলেই চাপা ছিল। পূর্ববর্তী কোন সংস্করণেই তুলে ধরি নি লজ্জায়। কেননা, কোন কৃতিত্ব বা বাহাদুরি দেখানোর উদ্দেশ্যে কলম ধরি নি। ধরেছিলাম একটি উদ্দেশ্যে যে রসুলুল্লাহ (দঃ) -এর অমিয় বাণী পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিব বিজ্ঞানের মাপ-কাঠিতে প্রমাণ করে। এ বাণী সর্বদেশের, সর্বকালের ও সর্বজাতির জন্যই প্রযোজ্য ও বিজ্ঞানসম্মত। অমর ও অক্ষয় হয়েই যা টিকে থাকবে যতদিন এ পৃথিবী চলে। আমার এ প্রচেষ্টা কতটুকু সার্থক হয়েছে এ বিচারের ভার গবেষক জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ভাইদের ওপর।

ধর্মপ্রাণ লেখক ও জ্ঞান সাধকদের হৃদয় যে কত স্বচ্ছ, সুন্দর ও প্রসারিত হতে পারে, উৎসাহ দিয়ে একজন অপিরিচিত লেখককে কিভাবে প্রাণঢালা বাণীতে মুগ্ধ করতে পারে–ভবিষ্যৎ বংশধরদের এটা দেখাতে ও গবেষণার পথে প্রেরণা জোগাতেই কয়েকটি মাত্র বাণী তুলে ধরলাম। রসুল (দঃ) প্রেমের সাক্ষী হিসাবে আর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে অমর হয়ে থাক এ বাণী, এটাই কামনা করি।

(১) পশ্চিমবাংলার (লালবাজার, বাঁকুড়া, ভারত) খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কবিরত্ন দার্শনিক, গবেষক ও ধর্মপ্রাণ মনীষী– শেখ আজিবুল হক, এম. এ., বি. এড্. লিখেছেন–

প্রথম পত্র ঃ (২০. ৫ ৮১) (অংশ বিশেষ)

"আস-সালামু আলাইকুম... বাদ জানাই আপনার দিব্য দীপ্ত চিত্তের শক্তি সমুত্থিত হস্তের সুলিখিত কয়েকটি অপূর্ব গ্রন্থ এপার বাংলায়ও এসে ঢেউ তুলেছে। বিশ্বের দিকে দিকে, দেশে দেশে, আপনার অমৃত নিষ্যন্দী বাণী যে মৃতসঞ্জীবনী হয়ে বিশুষ্ক বুকে আশা জোগাবে, ভাষা দেবে তাতে সন্দেহ কি?

আপনার লেখার সাবলীল স্বতস্ফূর্ত ভঙ্গি এবং অনন্ত প্রাণ-দায়িনী শক্তি যেন পাঠকচিত্তকে আবিষ্ট করে। প্রেরণা জাতীয় একটা শক্তি যেন পাঠক অনুভব করে এবং নতুন প্রাণশক্তি মন্ত্রে উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। বৈদ্যুতিক শক্তির মতো একটা শিহরণ জাগে সারা দেহ মনে। বস্তুত আপনার ভাব-ভাষার সাবলীলতা, ছন্দ-হিল্লোলের অনায়াসপটুতা বাণী বিন্যাসের মুন্সিয়ানা এবং কবিসুলভ আবেগদীপ্ত চিত্তের সহজ বর্ণনা পরিপাট্য ও মাধুরিমার সঙ্গে জ্ঞানৈষণা ও সত্যানুভূতির এমন সমন্বয় সচরাচর দেখা যায় না।

কবির অনুভূতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, সাধকের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে দার্শনিকের মননশীলতা, ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণার সঙ্গে ভাবুকের ভাবধারা মিশে যে অপূর্ব শিল্পশ্রী ও সত্য সুষমা রূপ পেয়েছে আপনার লেখা তা সর্বজন স্বীকৃত। আপনি শুধু লেখক নন গবেষকও। শুধু কবি নন বৈজ্ঞানিকও। ঐতিহাসিক নন দার্শনিকও। তাত্ত্বিক নন সাহিত্যিকও। তাই আপনার লেখায় সকল মনেরই খোরাক মজুত আছে দেখতে পাওয়া যায়।

আপনার বাণী যেমন ছন্দ স্পন্দনময় তেমনি প্রাণধর্মী। যেমন লীলাচঞ্চল তেমনি মর্মস্পর্শী। আপনি শুধু লেখক নন আপনি মুজাহিদ। লেখক জাহেদ এবং সত্যির মুজাহিদও আপনি। যুগের নকীব হয়ে,পথের দিশারী হয়ে, সত্যের আলোক বৃত্তিকাধারী হয়ে আপনি এসেছেন পথ দেখাতে। আঁধারের বুকে আলোক কায়েম করতে। মরুর বুকে ফুল ফোটাতে। হতাশার উদ্যানে বিশল্যকরনী এনে শক্তি ঘুম ভাঙাতে। আপনি তাই নৈরাশ্যের বিশ্বে আশা কুসুম জাগানো প্রভাতরবি, কুঁড়ি কুসুমের ঘুম টুটানো আনন্দ সুন্দরের বাণী দূত বুলবুল।.......

আপনার 'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)' গ্রন্থ জাতির খেদমতে আর এক হীরক উপহার।..... রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে এমন প্রজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে আর কেউ দেখেন নি। আপনি যেন দিব্যচক্ষু দিয়ে, রুহানী শক্তি দিয়ে তাঁকে দেখেছেন। আপনি অসংকোচে লিখে যান। বিশ্ব-জগতে

www.pathagar.com

ইসলামের ভাব বিপ্লব এনে দিন। খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলের সেই সোনালি যুগের সূচনা করে দিন। বিশ্ব-মুসলিমের ঘুম ভাঙানো পাখি আপনি। আপনি হাদি। আপনি যুগ ইমাম। লেখনী জেহাদ চালিয়ে, সত্যের আলো জ্বালিয়ে,বিশ্বজগতের তাবৎ অন্ধকার মুছে দিন। নিদ্রিতজাতি আবার জেগে উঠুক মুয়াজ্জিনের ডাক শুনে। চমকে দিন ইসলামের নূরানী সওগাৎ ও শক্তি দিয়ে। সমগ্র জাতির তরফ থেকে আপনাকে মুবারকবাদ জানাই।'

দ্বিতীয় পত্রের ঃ (২৬. ৬. ৮১) অংশ বিশেষ।

"রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর অমোঘ বাণীকে আপনি এমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ উত্তরসূরীদের জন্য সুদৃঢ় সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এতে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব শুধু নয় তামাম জাহানই উপকৃত হবে। মহানবী (দঃ) বলেছেন–'খাইরুন নাস্ মান্ ফাউন্নাস'–অর্থাৎ মানজাতির মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি সকল মানুষের সামাগ্রিক কল্যাণ কামনা করেন। আপনিও ঠিক সেই চিন্তাই করেছেন–ইসলামের সৌন্দর্যকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাই বলেছেন,

"বিজ্ঞানের যুগবিজ্ঞানের চিন্তাধারাতেই কোরআন ও রসুলের বাণী বিশ্লেষণ করে বিজাতিদের মস্তিষ্কে আলোড়ন আনতে হবে। শুধু ধর্মের বাণী হিসাবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যাবে না।"

সত্যিই আজকের সভ্যতায় বিজ্ঞানের যুগে প্রগতির ধোঁয়ায়, সমৃদ্ধির আলেয়ায় ধর্ম যেখানে Back dated, নীতি-তত্ত্ব যেখানে অবসিত, ভাববাণী যেখানে অবান্তর, যুক্তিবাদিতাই যেখানে একমাত্র আশ্রয়স্থল সেখানে রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রত্যেকটি বাণীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোতে বিশ্বরতন মনীষীদের সাক্ষ্য দিয়ে যেভাবে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে স্থাপিত করেছেন তা সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য।

যে কাজ মৌলবী মওলানারা পারেন নি, আরবী, ফার্সী পড়া পণ্ডিতেরা পারেন নি, মাদ্রাসার মোহাদ্দেস, মোসতাহেদরা পারেন নি, আপনি কলেজে পড়া শিক্ষানবিসী হয়ে তা পারলেন, বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমান ভাই-বোনদের তৃষিত ঠোঁটে এ অমৃত জোগালেন। এ যে বাঙালী জাতির খেদমতে কত বড় 'আবহায়াত' তা হয়তো জাতি এখনও উপলব্ধি করতে পারে নি। যেদিন পারবে সেদিন আপনার কথা আকাশের বুকে নক্ষত্রের হরফের মতোই উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হবে জাতির ইতিহাসে। তাই গুণী যাঁরা, জহুরী যাঁরা, তাঁরা ঠিকই আপনাকে চিনেছেন। তাই ঠিকই বলেছেন—'মোজাদ্দেদে দাওরে জাদিদ',–'মোজাদ্দেদে জামান'—'নব যুগ সংস্কারক', 'তৌহিদ সেনা',–প্রভৃতি কোন বিশেষণই আপনার অনুপযুক্ত নয়। অতিরঞ্জিত নয়। সবই সত্য। আমার মনে হয়.'মোজাদ্দেদে জামান'–বললে ছোট করা হয়। আপনি চির জমানার মোজাদ্দেদ। আপনার বাণী ও লেখনী, সত্য-সনাতন শ্বাশত-চিরন্তন হয়েই থাকবে আবহমান কাল ধরে। যতদিন বিজ্ঞান-প্রীতি, সত্য-প্রীতি, ধর্ম ও নীতি-জ্ঞান বিবেক বাণী মানুষের মনে উদ্ভূত হবে, সত্য-সন্ধানী মানুষ স্রস্টা ও সৃষ্টিকে নিয়ে চিন্তা করবে ততদিন আপনার কথা শুধু মুসলিম সমাজে নয়, বিশ্ব জ্ঞানী-গুণী মহলের কাছেই সমাদৃত হবে। আলোড়ন আনবে....।

কবি গোলাম মোস্তফা 'মিরাজ শরীফ'–গমনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে মুসলিম -জাহানে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আর আপনি নবীজী (দঃ)-এর প্রতিটি বাণীকে যে যুক্তির সোনালি সূতোয় বিনি -ফুল হার গেঁথে অমর উপহার দিয়েছেন। সেজন্য জাতি তো বটেই, বিশ্ব-মানবও আপনার জয়গান গাইবে মুক্ত কণ্ঠে। আপনার বই ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হওয়া চাই। বিশ্বের বুকে বুকে, আনাচে-কানাচে তা ছড়িয়ে দেওয়া চাই। আলোর স্বীকৃতি একদিন হবেই হবে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, মহানবীর মহত্ব, আল-কোরআনের মহিমা

www.pathagar.com

গ্রন্থধারী সহ্য করতে পারে না। জেনে-শুনে তারা তা Avoid করে যেতে চায়। নতুবা বিকৃত করে,আত্মসুখ অনুভব করে ইঙ্গিত নীচতাকে চরিতার্থ করে। তাই আপনার স্বীকৃতিও হয়তো দেরিতে পৌঁছাতে পারে। অবিসম্বাদিত রূপেও আশা নাও করা যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের ডঙ্কা যেখানে বেজেছে, সত্যের জয়গান যেখানে ধ্বনিত হয়েছে, সেই মুসলিম-জাহানে আপনার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়বেই। মুসলিম মানসে আলোড়ন তুলবেই। এমনকি মক্কা-মদিনাতেও আপনার বই আদরের সঙ্গে চুম্বিত হবে।......।"

(২) অশিতি বর্ষ বয়স্ক কবিরত্ন (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) সাহিত্যিক, সমালোচক ও ইসলাম-দরদী জনাব রুস্তম আলি কর্ণপুরী, বগুড়া লিখেছেন ঃ (পত্রের অংশ বিশেষ–তাং ১. ১২. ৭৮)

"বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)" এ গ্রন্থকারের জ্ঞানের প্রসারতা (Range of knowledge), গভীর পাণ্ডিত্য , নিপুণ অনুসন্ধিৎসা ও মূল্যবান চুলচেরা অতীব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণার ধারা প্রবাহ এবং সর্বোপরি বিচার বোধ সহ মহানবীর বিশেষ চরিতাদর্শ আখলাকুন্নবী বা সিরাত ও সুরাতে মুস্তফা (দঃ) ধর্মপ্রচার ও কর্মময় জীবনধারা এমনকি সমর প্রান্তেও তাঁর যে ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং মহান চরিতাদর্শ, বেদ, বাইবেল, কোরআন, পুরাণ, গীতা, ভগবৎ, ত্রিপিটক ও জরেন্দ্রিয় এবং বিশ্বের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের নিরিখে যে ভাবে 'এনালাইস' বা বিচার বিশ্লেষণ কিশোর লেখক উপস্থাপিত করেছেন–তদৃষ্টে নিঃসন্দেহে তিনি ডঃ (ডক্টরেট) আল্লামা ও কাব্যনিধি এবং বিদ্যার্ণব পদবী লাভের উপযুক্ত জ্ঞান-মনীষা সম্পন্ন একজন শিক্ষিত ব্যক্তিসত্ত্বা। সমাজ ও সরকারের উচিত উপযুক্ত মূল্যায়নের দ্বারা তাঁহাকে উৎসাহিত করা। বিজ্ঞান, দর্শন, কোরআন, হাদিস এবং বিশ্বধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের যে সব মূল্যবান রেফারেন্স বা উদ্ধৃতি আহরণ করে গ্রন্থটিকে তিনি নির্ভুল ও শ্রেষ্ঠতম হিসাবে প্রতিচিত্রিত করেছেন তা সত্যই জাতির গর্বের বিষয়...।"

(৩) জনাব আলাউদ্দিন আহম্মদ, বি. কম. (আই. টি. পি) আয়কর উপদেষ্টা কুঠিপাড়া, কুষ্টিয়া লিখেছেন–

(১৯. ৮. ৭৭; পত্রের অংশ বিশেষ)

"আপনার লেখা বিভিন্ন গ্রন্থাবলী যেমন–(১) বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) প্রথম খণ্ড, (২) বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) ২য় খণ্ড, (৩) বিজ্ঞান না কোরআন প্রভৃতি মহামূল্যবান গ্রন্থাবলী আপনার অপূর্ব সৃষ্টি। এমন সুন্দর ভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা ও প্রমাণ সম্বলিত গ্রন্থ আজ পর্যন্ত কোন লেখক বের করেছেন কিনা আমার জানা নেই। আপনার বইগুলি আমি পড়েছি। আমার কাছে খুবই সুন্দর লেগেছে। এই বিংশ শতাব্দীতে আপনার অপূর্ব সৃষ্টি সমাজের জন্য অতীব উপকারী সন্দেহ নেই। তাই আপনাকে জানাই সশ্রদ্ধ ভক্তি ও সালাম–

(৪) জ্ঞানতাপস, পাঠক, চিন্তাবিদ ও রসুল (দঃ) প্রেমিক–

জনাব বাবর আলি (J. A. E.) গোবিন্দগঞ্জ রংপুর লিখেছেন ঃ"আমি আপনার লিখিত বইগুলির একজন নগণ্য পাঠক। আমি একজন চাকুরিজীবী, ছোটবেলা থেকেই পাঠ্য পুস্তকের বাইরে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি পাঠ করা আমার একটা অন্যতম সখ।

এই তো গত পরশু দিনও আপনার লেখা বিখ্যাত "বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)"-বইটি কিনে আনলাম বগুড়া থেকে। এই বইটি এখনও পড়ছি। গত তিন বছর যাবৎ অনেক বই কিনেছি ও পড়েছি। কিন্তু গত তিন বছরের মধ্যে আমি বই পড়ে যা আনন্দ ও জ্ঞান পেয়েছি, আমার কাছে যেন মনে হচ্ছে, এই একটা বই পড়ে সেই আনন্দ পাচ্ছি। রসুলুল্লা (দঃ)-এর জীবনী সম্বন্ধে–কত বই পড়লাম। কয়েক বছর আগে গোলাম মোস্তফার–'বিশ্বনবী'. মওলানা আকরাম খাঁর 'মোস্তফা চরিত', কাজী আবদুল ওদুদের 'হজরত মুহাম্মদ ও ইসলাম', মোঃ

www.pathagar.com

ওয়াজেদ আলির মরুভাস্কর, ইয়াকুব আলি চৌধুরীর "মানব-মুকুট, শেখ আবদুর রাহিমের 'হজরত মুহাম্মদের (দঃ)-জীবন চরিত', মোঃ বরকতুল্লার-'নয়াজাতি স্রষ্টা হজরত মুহাম্মদ (দঃ)' ও অন্যান্য বাংলা ইংরাজি বই। কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বৈজ্ঞানিক বাণীকেনিয়ে আপনার মতো হৃদয়গ্রাহী, চিত্তাকর্ষক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা আর কোন লেখক বাংলা ভাষায় করেছেন কিনা আমার জানা নেই। সত্যিই আপনি জাতির এই ঘন ঘোর নৈতিক অধঃপতনের দুর্দিনে জাতিকে একটি সুন্দর উপহার দিয়েছেন গ্রন্থের মাধ্যমে হলেও। আমার মতো একজন নগণ্য পাঠক বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) পড়ে যে রকম খুশি হয়েছি, আমার মনে হয় আমার চেয়ে যাঁরা চিন্তাশীল পাঠক আছেন, তাঁরা এই গ্রন্থটি পড়ে অধিকতর খুশি হবেন। আমি আপনার লেখা 'বিজ্ঞান না কোরআন?', 'জগৎগুরু মাহাম্মদ (দঃ)' এবং 'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)'-এই তিনটি বই কিনেছি। তবে আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগছে-বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) বইটি।

(৫) জনাব আবেদ আলি, বি. এ. অনার্স, এম. এ. (ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক, ধর্মতত্ত্ববিদ ও জ্ঞানতাপস) লিখেছেন—

"পেশায় আপনি ইঞ্জিনিয়ার তথা বিজ্ঞানী আর মননে আপনি সাহিত্যিক তথা ধার্মিক। এই কারণে আপনার লিখিত ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান ও ধর্মের মণিকাঞ্চন যুক্ত হয়েছে। আমি ততোটা পারি নি। তবে আল্লাহ্ ও রসুলের অমিয় বাণী সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একটু আলোড়ন আনুক এই উদ্দেশ্যে পাঁচখানা বই লিখেছি যা আপনাকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করলাম—।"

(৬) 'বুলবুল সংঘ' (লালবাজার, জেলা বাঁকুড়া, পশ্চিমবাংলা, ভারত)-এর পক্ষ হতে সংবর্ধনা বাণী—

"হে সুধীসাধন কবি, হে জ্ঞানপ্রাজ্ঞ দরবেশ লেখক, হে বৈজ্ঞানিক গবেষক ও তত্ত্বপথপ্রদর্শক, তোমার বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)-এর অমিয় বাণী দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। তোমার বিপ্লবী চিন্তা ও ঐশীসত্তা আমাদের মনে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মধুভাষী, নিরহঙ্কার, হে আনন্দ সুন্দর, যুগের হাদি তুমি, সমাজের মনীষী তুমি। আলোর সূর্য তুমি। মানব জাতির বন্ধু তুমি। তোমাকে আমাদের সকল মানুষের সালাম জানাই।"

গুণমুগ্ধ—
'বুলবুল সংঘ'
লালবাজার, বাঁকুড়া
পশ্চিমবাংলা, ভারত
১২/৬/৮৩

শেখ ইলিয়াস, সম্পাদক ১২/৬/৮৩
বুলবুল সংঘ, লালবাজার
ডক্টর রামদুলাল বসু ১২/৬/৮৩
ডক্টর আবদুস সামাদ ১২/৬/৮৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com